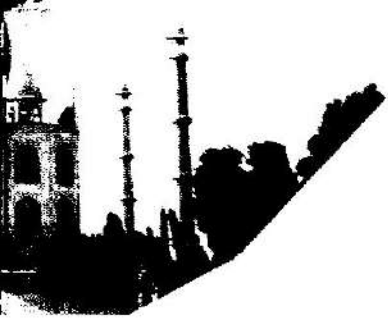

কিশোর বিশ্বস্থাপত্য

স্থপতি নিজামউদ্দিন আহমেদ

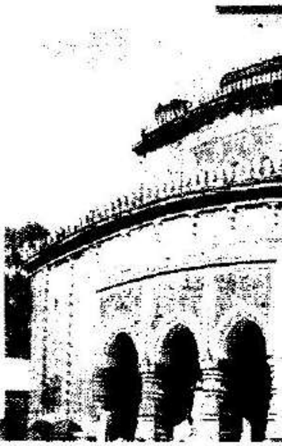

কিশোর বিশ্বস্থাপত্য

স্থপতি নিজামউদ্দিন আহমেদ

BANSDOC Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০৬/ জুন ২০০০

বাএ ৪০৪১

(১৯৯৯-২০০০ ভাসাসপ ঃ ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ : ৬)

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

প্রকাশক
আজহার ইসলাম ভূঁইয়া
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

গ্রাফিক্স
রাশেদ ইকবাল

মুদ্রক
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
স্থপতি নিজামউদ্দিন আহমেদ

মূল্য
দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র

Kishore Bishwasthapatya (a children's book on world architecture) by Architect Nizamu Ahmed. Published by Azhar Islam Bhuiyan, Director, Language, Literature, Culture and Jo Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First published June 2000. Price: 230.00 only

ISBN 984-07-4050-4

উৎসর্গ

যাঁদের কাছে আমি ছিলাম চিরকিশোর
আমার আব্বা ও আম্মাকে

আল-হাজ্জ্ব হেমায়েতউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-৯৪)
বেগম জোহারা আহমেদ (১৯৩২-৯৭)

ভূমিকা

টা নিজের জানার ইচ্ছা থেকেই "কিশোর বিশ্বস্থাপত্য" কাজটা হাতে নিই। স্থাপত্যের ছাত্র
এর অনেক কিছুর সাথে ক্লাশে পরিচিত হয়েছি; বেশকিছু অংশ রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে
রেছি। তবে দেড় যুগ স্থাপত্যে শিক্ষকতা, গবেষণা ও কন্সাল্টিংয়ের ব্যস্ততায় চলে যাওয়া
দিনগুলোর স্থাপত্য সম্বন্ধে জ্ঞান কমে আসছিল। কর্মক্ষেত্রেও বিগত দিনের স্থাপত্যের
তত্ত্ব, রীতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি সম্মন্ধে জ্ঞানের অভাব অনুভব করছিলাম।

ও অনুধাবন করলাম যে, স্থপতি নয় এমন মানুষের মধ্যেও স্থাপত্য নিয়ে আগ্রহ অনেক
কই জানতে চায় স্থাপত্য কি, কেন, কোত্থেকে ...। আবার অনেকে অজান্তেই স্থাপত্যের
ব্যাখ্যা দিয়ে এর চর্চা ও বিকাশের ক্ষতি করে চলেছেন।

স্থাপত্যের ব্যাপ্তি বিশাল। পাঠসূচিতে রয়েছে ভবন ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সামগ্রিক
ন, নকশা, পরিকল্পনা, নির্মাণ সামগ্রী ও কৌশল সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহ।
একদিকে রয়েছে পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল ও যন্ত্রকৌশলের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, অন্যদিকে
ন, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সৃজনশীল বিষয়। বিজ্ঞানের ধারার গণিত, পদার্থবিদ্যা ও নৃবিজ্ঞান
ইংরেজি, দর্শন, মনোবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান স্থাপত্যের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম জানতে হলে পড়তে হবে, জানাতে হলে তা সহজ করে লিখতে হবে।
ই বইটার নামের আগে 'কিশোর' শব্দটার সার্থকতা।

অক্টোবর ১৯৯৪ সালে এই লেখায় হাত দিই। দেড় বছর সময় নিয়ে মূল পাণ্ডুলিপিটি তৈরি
১৯৯৭ সালে জানুয়ারিতে আবার এক বছরের জন্য বিলাতে যাই স্থাপত্যে
-ডক্টরেট গবেষণা করার জন্য। ফিরে আসার পরও দুটি বছর পার হয়ে গেছে। এ সময়টুকু
ছবি সংগ্রহে ব্যয় হয়। প্রায় চারশত ছবি ও অঙ্কনের মাধ্যমে স্থাপত্যের মতো জটিল বিষয়কে
কর জন্য সহজ করতে চেষ্টা করেছি।

শুরু থেকে শেষ হতে এত বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু বইটার বিষয়বস্তু ইতিহাসভিত্তিক তাই
াসঙ্গিকতা অক্ষত আছে বলে আমার বিশ্বাস।

বইটা যথাসম্ভব কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। এতে করে পাঠক সহজেই স্থাপত্যের
তিকে ইতিহাসের অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে মিলিয়ে নিতে পারবেন। তবে শুরুতে সার্বিকভাবে

[illegible]কেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও এলাকার স্থাপত্য সম্পর্কে এই বইয়ে সামান্য কিছু তথ্য তুলে ধরেছি [illegible] হয়ে আমার এ বইয়ে স্থানীয় স্থাপত্যকর্মের উপর অধিক জোর দিয়েছি।

[illegible] যেকোনো চলার পথে, অন্য কোনো পথিক যেমন বলে দেয় দিক, সহযাত্রী হয়ে খানিকটা পথ [illegible], আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তেমন অনেকেরই উদারতাপুষ্ট। যাত্রাপথে কেউ আসে আগে, কারো সাথে দেখা হয় পরে। শেষ মাইলফলকটি পার হবার পর যাঁদেরকে বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন, কালানুক্রমে, প্রফেসর এম. এ. তাহের (প্রাক্তন ডি.এ.ই.আর.এস, বুয়েট), জনাব হুদা (ডি.এ.ই.আর.এস নগর, বুয়েট), অধ্যাপক ডঃ এম. শহিদুল আমিন (স্থাপত্য বিভাগ, বুয়েট), অধ্যাপক ডঃ এম. শাহজাহান (প্রাক্তন উপাচার্য, বুয়েট), আমার ফুপাত ভাই জনাব আসাদুজ্জামান নূর (নাট্য ব্যক্তিত্ব), স্থপতি মোস্তফা কামাল, শেখ আহসান উল্লাহ্ মজুমদার (সহকারী অধ্যাপক, স্থাপত্য বিভাগ, বুয়েট), স্থাপত্য বিভাগে আমার ছাত্র [illegible] হক, হাসিবুশ শহীদ, রুমানা কবির ও মেরাজ-উর-রহমান, জনাব ফরহাদ খান (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), জনাব স্যামুয়েল আনায়া-গুজম্যান (হিসপানিক স্টাডিজ বিভাগ, শেফীল্ড বিশ্ববিদ্যালয়) এবং বিশেষভাবে আমার ছাত্র রাশেদ ইকবাল। আরো মনে পড়ছে যাঁদেরকে, তাঁরা হলেন, আমার স্ত্রী দীপ্তি, [illegible] কাছে ডঃ জেবুন নাসরিন আহমেদ (সহযোগী অধ্যাপক, স্থাপত্য বিভাগ, বুয়েট), আমার ছেলে [illegible] আহমেদ এবং মেয়ে ঈম্যান নাসরিন আহমেদ।

মুদ্রণপ্রমাদ নেই তেমন দাবি করছি না। যদি ভুল থেকে যায় তবে তা অনিচ্ছাকৃত, এ ব্যাপারে পাঠকের অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

যদি এই বই পড়ে স্থাপত্য সম্বন্ধে জানার আগ্রহ বাড়ে, এবং কোন একজন পাঠকও অনুভব করেন সে স্থপতি দিয়েই তাঁর ভবনের নকশা করাবেন, যদি একটি কিশোরও বলে সে স্থপতি হবে তবে আমার চেষ্টা সফল বলে আমি মনে করব।

ঢাকা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০০

নিজামউদ্দিন আহমেদ

বিষয়সূচি

স্থাপত্যের শুরু ১
মনুষের চাহিদা ২
ধর্মীয় বিশ্বাসের গুরুত্ব ৩
প্রাচীন গুহাচিত্র ৪
সভ্যতা ৫
সভ্যতা ও নির্মাণ ৭
স্থাপত্যকর্ম ও স্থপতি ৮
স্টাইল, রীতি বা শৈলী ৯
স্টাইলের প্রভাব ১০
শিল্প, বিজ্ঞান ও স্থাপত্য ১১
প্রয়োজন থেকে স্থাপত্য ১২
ভবনের পরিকল্পনা ১৩
স্থাপত্যকর্মের উপাদান ১৪
নির্মাণ সামগ্রী ১৫
কাঠ ১৫
পাথর ১৬
ইট ১৭
লোহা ১৭
ইস্পাত ১৯
কংক্রিট ১৯
কাচ ২০
প্লাসটিক্স ২১
পরামর্শক ২২
ভবনের অংশবিশেষ ২২
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২৪
নদীর কূলে সভ্যতা ২৬
মেসোপোটেমীয় সভ্যতা ২৮
মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতা ২৯
মেসোপোটেমিয়ায় অ্যাসিরীয় সভ্যতা ৩০
নেবুচাদনেজারের ব্যাবিলন ৩১
পারস্যের স্থাপত্য ৩২
সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা ৩৪
মিশরীয় সভ্যতা ৩৫
ফারাওদের স্মৃতিস্তম্ভ [illegible]
মিশরের মন্দির [illegible]
মেসো-আমেরিকার স্থাপত্য [illegible]
গ্রিসদেশীয় সভ্যতা [illegible]
মিনোয়া এবং মাইসিনি [illegible]
ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম [illegible]
ভারতে পাহাড় কেটে মন্দির [illegible]
জৈনদের গুহা [illegible]
স্তূপ [illegible]
হিন্দু ও জৈন ধর্ম [illegible]
হিন্দু স্থাপত্য [illegible]
রোমান সাম্রাজ্য [illegible]
খ্রিষ্টান ধর্ম [illegible]
চীনদেশীয় স্থাপত্য [illegible]
ইসলামের প্রভাবে স্থাপত্য [illegible]
জাপানের স্থাপত্য [illegible]
[illegible]
মধ্যযুগের ইয়োরোপ [illegible]
রোমানেস্ক [illegible]
গথিক স্টাইল [illegible]
রেনেসাঁ [illegible]
বারোক [illegible]
রোকোকো [illegible]
প্যালাডিয়ানিজম [illegible]
ইকোলে দ্য বজ-আর্টস [illegible]
শিল্প বিপ্লব [illegible]
পুরানো সেই দিন [illegible]
দি আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ মুভমেন্ট [illegible]
শিকাগো স্কুল [illegible]
আর্ট নুভো [illegible]
অর্গানিক স্থাপত্য [illegible]
ফাংসনালিজম [illegible]
র‍্যাসনালিজম এবং মডার্ন ম্যুভমেন্ট ৯৪

ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল ৯৮
কিউবিজম ও ডি স্টিল ১০০
বাহাউস ১০২
ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট ১০৫
আর্ট ডেকো ১০৭
একস্প্রেসনিজম ১০৮
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১০৯
মিজ ভ্যান ডার রোহ ১১০
লে কর্বুসিয়ের ১১১
চলমান ধারা ১১৫
লুই আই. কান ১১৭
র‍্যাশনাল স্থাপত্য ১১৮
পোস্ট-মডার্ন স্থাপত্য ১১৯
হাইটেক স্থাপত্যরীতি ১২১
বিপ্লবের অপেক্ষায় ১২২
হিন্দুদের মন্দির ১২৩
পাহাড়-কাটা স্থাপত্যের চূড়ান্ত রূপ ১২৬
হিন্দুদের পাহাড়-কাটা মন্দির ১২৭
জৈন পাহাড়-কাটা মন্দির ১২৮
দ্রাবিড় স্টাইল ১২৮
পহ্লবদের মন্দির ও রথ স্থাপত্য ১২৯
চোলদের স্থাপত্যের নিদর্শন ১৩০
পাণ্ড্য সাম্রাজ্য ১৩১
বিজয়নগরের স্থাপত্য ১৩২
মাদুরা রীতি ১৩২
উত্তর ভারতীয় উড়িষ্যা স্টাইল ১৩৩
উত্তর ভারতীয় খাজুরাহো স্টাইল ১৩৬
উত্তর ভারতীয় রাজপুতানা স্টাইল ১৩৭
জৈনদের মন্দির ১৩৮
চালুক্য স্থাপত্য ১৩৮
চালুক্য হয়সালা রীতি ১৪১
উপমহাদেশের বাইরে ১৪২
ইসলামি স্থাপত্য ১৪৩
ইসলামি প্রাসাদ স্থাপত্য ১৫৪
ইসলামি স্থাপত্যে সমাধি ১৫৫
সমরকন্দের স্থাপত্য ১৫৫
মোগল স্থাপত্য ১৫৬
মোগল বাগান ১৬১
ভারতীয় প্রাসাদ ১৬১
পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ ১৬২
বাংলাদেশে প্রাচীন স্থাপত্য ১৬৩
বাংলাদেশে বৌদ্ধদের স্থাপত্য ১৬৫
মহাস্থানগড় ১৬৫
ভাসু বিহার ১৬৬
পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ১৬৬
কুমিল্লার শালবন বিহার ১৬৭
কুটিলা মুড়া ১৬৮
বাংলাদেশে হিন্দু স্থাপত্য ১৬৯
উড়িষ্যা রীতি অনুকরণ ১৬৯
বিহার স্থাপত্য ১৭০
পাল এবং সেনদের রাজত্বকাল ১৭১
বাংলার নিজস্ব সত্তার স্থাপত্য ১৭১
বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য ১৭৪
মুসলিম শাসন ১৭৫
মামলুক বা ক্রীতদাসদের রাজত্ব ১৭৫
সুলতানি আমল ১৭৬
মোগল শাসন ১৭৬
বৃটিশ শাসন ১৭৬
বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ১৭৭
মামলুক আমলের স্থাপত্য ১৭৮
সুলতানি আমলে স্থাপত্য ১৭৮
সুলতানি এবং মোগল স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ১৮০
বাংলার মোগল স্থাপত্য ১৮১
মোগলদের কেল্লা ১৮৩
বাংলাদেশের স্থাপত্যে বৃটিশ প্রভাব ১৮৩
কুঠি নির্মাণ ১৮৬
বৃটিশদের ভবন ১৮৬
নতুন স্থাপত্যের শুরু ১৯০

চিত্রক্রম

[illegible] মানুষ, আত্মরক্ষার্থে গুহায়
[illegible] মানুষ
[illegible] বৃক্ষ
[illegible] (ক) দুর্গ (খ) সমাধি
[illegible] (ঘ) ধর্মীয় ভবন (ঙ) প্রাসাদ
[illegible]
[illegible] কেন্দ্র হিসাবে মসজিদ
[illegible] মন্দির, গির্জা
[illegible] গুহায় দেয়ালচিত্র
[illegible] গুহায় দেয়ালচিত্র
[illegible] গুহায় দেয়ালচিত্র
[illegible] সভ্যতা
[illegible] পিরামিড
[illegible] ঘর
[illegible] কর্তৃক ডিজাইনকৃত সেতু
[illegible] ফুলার: জিওডেসিক ডোম
[illegible] পার্থেনন
[illegible] ভবন: স্যান ভিটাল
[illegible] ভবন: সেইন্ট মিনিয়াটো, ফ্লোরেন্স
[illegible] ভবন: কোলন ক্যাথিড্রাল
[illegible] গথিক ভবন: এমিয়েন্স ক্যাথিড্রাল
[illegible] গথিক বা টিউডর ভবন
[illegible] ইসলামী স্থাপত্য :
[illegible], কায়রো
[illegible] ইসলামী স্থাপত্য :
[illegible] মসজিদ
[illegible] রূপ :
চিত্র, ভাস্কর্য, সেতার বাদক, একটি বাড়ি
[illegible] মালিক ও স্থপতির আলোচনা
[illegible] ভবনে ফ্যাক্টরি : যানজটের উৎস

২৭ নির্মাণ শিল্প: প্রবাহমান [illegible]
২৮ স্থাপত্যের উপাদান
২৯ বাঁশের তৈরি বাড়ি
৩০ গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি কুটির
সুটিয়াকাঠি, পিরোজপুর
৩১ ইয়োরোপে কাঠের বাড়ি
৩২ বাংলাদেশে কাঠের বাড়ি :
সুটিয়াকাঠি, পিরোজপুর
৩৩ শিলং (আসাম, ভারত) [illegible]
৩৪ মশলা ছাড়া পাথর [illegible]
৩৫ একই দালানে ইট ও [illegible]
৩৬ ইটের দালান
৩৭ লৌহযুগ: অস্ত্র ও [illegible]
৩৮ লৌহ সেতু: কোলব্রুকডেইল [illegible]
৩৯ লোহার থাম ও কড়ি
৪০ ডারবীর কারখানা [illegible]
৪১ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, [illegible]
৪২ দৃঢ়ীকৃত কংক্রিট: [illegible]
৪৩ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় [illegible]
পাঠাগার
৪৪ ভবন নির্মাণে ইস্পাতের [illegible]
৪৫ ভবনের অংশবিশেষ
৪৬ আধুনিক বাথরুমের [illegible]
৪৭ দেয়াল এবং থাম ছাদের [illegible]
৪৮ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে [illegible]
৪৯ খুঁটি ও সর্দল
৫০ সমতল ছাদ থেকে ক্রম [illegible]
৫১ খিলান: গোলাকার ও [illegible]
৫২ কাঠ, লোহা ও দৃঢ়ীকৃত কংক্রিটের [illegible]
৫৩ সিয়ার্স টাওয়ার

৫৪ সুপার ডোম
৫৫ জাতীয় ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুর, ঢাকা
৫৬ বিশ্বের প্রধান নদী ও জনবসতি
৫৭ মিশরের উর শহরে জিগ্‌গুরাত
৫৮ সুমেরের শহর
৫৯ চালদিয়ানদের জিগ্‌গুরাত
৬০ খারশাবাদএর শহর তোরণ
৬১ অ্যাসিরীয়দের মন্দির
৬২ সারগনের আমলে অ্যাসিরীয়দের ভবন
৬৩ ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান
৬৪ ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ
৬৫ পারসিপলিসের প্রাসাদ
৬৬ পারসিপলিসের প্রাসাদে একশত থামের হলঘর
৬৭ পারসিপলিসে রাজকীয় সভাকক্ষ
৬৮ ময়দান-ই-আব্বাস, ইস্‌ফাহান
৬৯ শাহ্ মাদ্রাসায় চকচকে টালি, ইস্‌ফাহান
৭০ রাজকীয় মস্‌জিদের আইওয়ান, ইস্‌ফাহান
৭১ হরপ্পা
৭২ মোহেনজোদারো - শহর পরিকল্পনা
৭৩ মোহেনজোদারোর সিল
৭৪ মোহেনজোদারোর ধ্বংসাবশেষ
৭৫ নাইল নদীর সাথে সম্পর্কিত মিশরে বসবাস
৭৬ মাস্তাবা থেকে পিরামিড
৭৭ গিজেহ্ পিরামিড
৭৮ এডফুতে হোরুসের মন্দির
৭৯ হাটসেপসুট এর মন্দির
৮০ স্ফিংক্স
৮১ লাক্সরে কর্নাকের মন্দির
৮২ মিশরীয় থাম
৮৩ হায়রোগ্লিফক্স
৮৪ মায়া সভ্যতার শহর
৮৫ মধ্য-আমেরিকার স্টেপ পিরামিড
৮৬ টিওটিওয়াক্যান (Teotinuacan)
৮৭ চিচেন ইট্‌যা (Chichen Itza)
৮৮ চিচেন ইট্‌যা: হাওয়ারিসের মন্দির
৮৯ মিক্সটেকদের প্রাসাদ, মিটলা
৯০ গ্রিসদেশীয় ভবনে জ্যামিতির প্রভাব
৯১ গ্রিসদেশীয় ভবনে মার্বেলের ব্যবহার
৯২ গ্রিসদেশীয় থাম
৯৩ গ্রিসদেশীয় থাম
৯৪ এ্যাম্পিথিয়েটার: গ্রীসদেশে উন্মুক্তস্থানে মিলনায়তন
৯৫ এক্রোপলিসএর মন্দির
৯৬ পুরাতন এথেন্স শহর
৯৭ পার্থেনন, এথেন্স
৯৮ মিনোয়া এবং মাইসিনির ভবন
৯৯ সিংহদরজা বা লায়ন গেট, মাইসিনি
১০০ অজন্তার পাহাড়ে গুহা
১০১ কারলী মন্দির
১০২ মামল্লাপুরমে মন্দির
১০৩ সাঁচীর স্তূপ
১০৪ কৈলাশ মন্দির, ইলোরা
১০৫ রোমান সাম্রাজ্য
১০৮ রোমান থাম
১০৬ রোমান ভল্ট
১০৭ গম্বুজের ক্রমবিকাশ
১০৯ রোমান বিশালাকার থিয়েটার
১১০ রোমান ব্যাসিলিকা
১১১ রোমান অ্যাকুউডাক্ট
১১২ বাথস্ অব কারাকাল্লা
১১৩ বাথস্ অব কারাকাল্লা
১১৪ রোমের কলিসিয়াম
১১৫ প্যান্থিয়ন, রোম
১১৬ প্যান্থিয়ন, রোম
১১৭ প্যান্থিয়ন, রোম
১১৮ প্রথমদিকের খ্রিষ্টীয় গির্জা

[illegible] রাভেনার স্যান ভিটাল এ বাইজ্যানটাইনী মোজাইক
[illegible] ব্যাসিলিক ও বৃত্তাকার ধরনের গির্জা
[illegible] বৃত্তাকার গির্জা
[illegible] ক্রুশাকৃতির গির্জা
[illegible] পেনডেনটিভ দিয়ে গম্বুজ নির্মাণ
[illegible] হায়া সোফিয়া (Hagia Sophia)
[illegible] চীন দালান
[illegible] চীন দালানের ক্ষুদ্র অংশ
[illegible] প্যাগোডা
[illegible] চীনদেশের গ্রেট ওয়াল
[illegible] ইসলামে একাধিক কৃষ্টির মিলন: মতি মসজিদ
[illegible] ইসলামি স্থাপত্যে ফুলের কাজ
[illegible] ইসলামি হস্তলিপি
[illegible] মসজিদের বিভিন্ন অংশ
[illegible] মিম্বর
[illegible] ইসলামি স্থাপত্যে খিলান
[illegible] অশ্বখুরাকৃতি খিলান
[illegible] কুফা অঞ্চলের আরবি হস্তলেখা
[illegible] মসজিদে অলঙ্করণ
[illegible] ইসলামি স্থাপত্যে জ্যামিতির ব্যবহার
[illegible] ইসলামি স্থাপত্যে কাঠের অনুকরণে নকশা
[illegible] অলঙ্করণ: সেলজুক আমলের সমাধি
[illegible] সেলজুক ভবনে তাবুর ভাবান্তর
[illegible] বিভিন্ন দেশে ইসলামি ইমারত
[illegible] জাপানের দালান :
কিনকাকুজা মন্দির, কিওটো, ১৪শ শতাব্দী
[illegible] জাপানের দালানের অভ্যন্তরে
[illegible] জাপানের দালানে কাঠের ব্যবহার :
শোগানদের প্রাসাদ
[illegible] [illegible] টাঙের কাজ :
অলিম্পিক স্পোর্টস হল
[illegible] ইনকা জাতির সৃষ্ট স্থাপত্য
[illegible] ইনকাদের আমলে তৈরী দেয়াল
[illegible] রোমানেস্ক গীর্জা
১৫০ ব্যারেল ভল্ট
১৫১ গ্রয়েন ভল্ট
১৫২ উড়ন্ত ঠেস বা ফ্লাইং বাট্রেস
১৫৩ নটর্ ডেম কাথিড্রাল, প্যারিস
১৫৪ ডারহাম ক্যাসেল, ইংল্যান্ড
১৫৫ ডারহাম ক্যাসেল, অভ্যন্তর
১৫৬ লিনিং টাওয়ার অব্ পিসা-এর সংলগ্ন
ব্যাপটিস্ট্রি
১৫৭ সেইন্ট ডেনি-র গির্জা
১৫৮ গথিক খিলানসমূহ
১৫৯ গথিক ভল্টসমূহ
১৬০ ইংল্যান্ডে সল্সবারী কাথিড্রাল
১৬১ পুনরুজ্জীবিত গথিক :
কেবল কলেজ, অক্সফোর্ড
১৬২ ইটালিতে মিলান কাথিড্রাল
১৬৩ ইটালিতে ফ্লোরেন্স কাথিড্রাল
১৬৪ রেনেসাঁ স্থাপত্যের উদাহরণ :
ব্রামান্তে ডিজাইনকৃত টেম্পিয়েটো
১৬৫ মানুষের শারীরিক গঠনের বিশ্লেষণ
লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি
১৬৬ ফাউন্ডলিং হাসপাতাল
১৬৭ লিওন বাটিস্টা আলবার্টির [illegible]
সেইন্ট মারিয়া
১৬৮ গ্র্যান্ড প্যালেস, ব্রাসেলস
১৬৯ বারোখ স্টাইল : [illegible]
সানতিয়াগো দে কম্পোস্টেলা
১৭০ সেইন্ট পিটারস কাথিড্রাল, রোম
১৭১ ফরাসি বারোখ :
লে ইনভ্যালিডেস-এর গির্জা, [illegible]
১৭২ সেইন্ট পিটারস কাথিড্রাল-এর অভ্যন্তর
১৭৩ স্থপতি বারনীনির সান্তা [illegible]
১৭৪ ফান্টেনব্লুর স্যাটো
১৭৫ চিজিক হাউস: রোকোকো স্টাইল
১৭৬ ভার্সাই প্রাসাদ

১৭৭ পালাডিওর ভিলা রটোন্ডা
১৭৮ পালাডিওর ভিলা কাপরা
১৭৯ ইনিগো জোনস-এর ডিজানকৃত
ব্যানকোয়েটিং হাউস, হোয়াইটহল, ইংল্যান্ড
১৮০ হ্যাম্পটন কোর্ট; স্থপতি খ্রিস্টফার রেন
১৮১ সেইন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, লন্ডন
১৮২ শিল্প-বিপ্লব
১৮৩ ১৮শ শতাব্দীর বিলেতে বস্ত্র শিল্পের কারখানা :
চিত্রাঙ্কে এ. মিল
১৮৪ ক্রিস্টাল প্যালেস
১৮৫ শিল্প বিপ্লব
১৮৬ প্যারিসের আইফেল টাওয়ার
১৮৭ বিলেতের পার্লামেন্ট হাউজ
১৮৮ ব্রাইটন প্যাভিলিয়ন
১৮৯ ব্রিস্টলের নিকট ব্লেইজ হ্যামলেট
১৯০ উইলিয়াম মরিস-এর রেড হাউস
১৯১ শিকাগো স্কুলের ধারায় ডিজাইনকৃত ভবন
১৯২ ওয়েনরাইট বিল্ডিং
১৯৩ আর্ট নুভ্য : ফ্লোরেন্স
১৯৪ অস্ট্রিয়ায় আর্ট নুভ্য :
মাজোলিকাহস, ভিয়েনা; অটো ওয়াগনার
১৯৫ শিকাগো স্টক একসচেঞ্জ (১৮৯৩-৯৪) ;
লুই সালিভান
১৯৬ ফরাসি আর্ট নুভ্য: জেমস ল্যাভিরটি
ডিজাইনকৃত প্যারিসের বাড়ীর দরজা
১৯৭ [illegible] গাউডির কাসা বাট্‌লো
১৯৮ [illegible] সাগরাদা ফ্যামিলিয়া
১৯৯ অ্যান্টনি গাউডির কাসা মিলা
২০০ স্থপতি হুগো হ্যারিং-এর কাজ
২০১ হেলসিংকির পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট :
স্থপতি আলভার আলটো
২০২ লুই সালিভান : গ্যারান্টি ভবন,
বাফেলো, নিউ ইয়র্ক
২০৩ ভিক্টর হোরতা ডিজাইনকৃত ভবন,ব্রাসেলস
২০৪ গ্লাসগোতে চার্লস রেনী ম্যাকিনটশ-এর কাজ
২০৫ মিজ ভ্যান ডার রোহর জার্মান প্যাভিলিয়ন
২০৬ পিটার বেহরেন্স: এ.ই.জি. টার্বাইন হাউস
২০৭ ফ্যাগাস সুলাস্ট ফ্যাক্টরি; ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস
২০৮ এডল্ফ লুজ-এর স্টাইনার হাউজ
২০৯ কর্বুসিয়্যের-এর ভিলা স্যাভয়, পয়সি, ফ্রান্স
২১০ মিজ ভ্যান ডার রোহর টুগেনধ্যাট হাউজ
২১১ লেক শোর ড্রাইভ এপার্টমেন্টস; স্থপতি মিজ
২১২ নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ ভবন :
মূলত কর্বুসিয়্যের-এর ডিজাইন
২১৩ লিভার বিল্ডিং : স্থপতি গর্ডন বানশ্যাফট
২১৪ নিউ ইয়র্কে মিজ ও ফিলিপ জনসন এর
সীগ্রাম ভবন
২১৫ জর্জেস ব্রাখ ও কিউবিজম
২১৬ পিকাসো ও কিউবিজম
২১৭ "ডি স্টিল" রীতি
২১৮ পিয়েট মনড্রিয়ান: কম্পোজিশন (১৯২৯)
২১৯ স্থপতি জে.জে.পি. উদ-এর কাজ
২২০ জার্মানীর ডিজাইন স্কুল বাউহাউস (মডেল)
২২১ শিল্পী জোহানেস ইটেন-এর সৃষ্ট চিত্র
২২২ পল ক্লী: সেনেসিও (১৯২২)
২২৩ ওয়াসিলি কান্ডিনিস্কী:কোস্যাকস(১৯১০-১১)
২২৪ চিত্রশিল্পী থিও ভ্যান ডাজবার্গ :
এ্যারিথম্যাটিক কম্পোজিশন (১৯৩০)
২২৫ স্থপতি মার্সেল ব্রুয়ার
২২৬ ওয়ার্কবান্ড প্রদর্শনী (১৯১৪), কলোন :
স্থপতি গ্রোপিয়াস ও মেইয়ার এ্যাডল্ফ
২২৭ স্থপতি হ্যানেস মেইয়ার
২২৮ মোশে সাফদি ডিজাইনকৃত হ্যাবিটাট
২২৯ মোহোলি নাগি: CHX (১৯৩৯)
২৩০ শিকাগোর রবি হাউস; ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট
২৩১ পেনসিলভেনিয়ায় ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট-এর
ফলিং ওয়াটার
২৩২ ইউনিটি চার্চ

২৩৩ জনসন ওয়াকস্ ফ্যাক্টরি :
ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট
২৩৪ নিউ ইয়র্কে রাইট এর গুগেনহাইম মিউজিয়াম
২৩৫ গুগেনহাইম মিউজিয়াম, অভ্যন্তর
২৩৬ আর্ট ডেকো :
ক্যাস গিলবার্টের হুভার বিল্ডিং
২৩৭ আর্ট ডেকো ধারায় ইন্টেরিয়র ডিজাইন
২৩৮ নিউ ইয়র্কের ক্রাইসলার ভবন :
উইলিয়াম ভ্যান এলেন
২৩৯ এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং: ল্যাম্ব ও হারমন
২৪০ সিডনি অপেরা হাউস
২৪১ বহুতল ভবনে সমস্যা: লন্ডনে অল্টন স্টেইট
২৪২ ফার্নসওয়ার্থ হাউস, ফকস রিভার, ইলিনয় :
মিজ ভ্যান ডার রোহ্
২৪৩ স্তম্ভ বা পাইলটিস
২৪৪ সিট্রোহান হাউজ: লে কর্বুসিয়েের
২৪৫ কর্বুসিয়ের-এর স্টাইন হাউস
২৪৬ ইউনিট দ্য'হ্যাবিটেশন: লে কর্বুসিয়ের
২৪৭ রঁশাম্পে নটর ডেম দ্য হট: লে কর্বুসিয়ের
২৪৮ রঁশাম্পে নটর ডেম দ্য হট: লে কর্বুসিয়ের
২৪৯ সূর্যের আলোকে বাধা দেয়া : বাংলাদেশের
বৈজ্ঞানিক ভবনে ব্রাইস সোলেইল
২৫০ সংসদ ভবন, চণ্ডীগড় (১৯৫৫-৬০) :
লে কর্বুসিয়ের
২৫১ মিলানের পিরেলী ভবন: জিও পন্টি
২৫২ ইয়েরো স্যারিনেনের নিউ ইয়র্কস্থ এয়ারপোর্টের
টি.ডবলইউ.এ টার্মিনাল
২৫৩ অস্কার নিমেয়ের ডিজাইনকৃত ব্রাসিলিয়া
২৫৪ লুই আই. কা'নের সল্ক ইন্সিটিউট
২৫৫ পল রুডলফের স্কুল অব আর্ট এন্ড
আর্কিটেকচার, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়
২৫৬ রিচার্ডস্ মেডিক্যাল রিসার্চ বিল্ডিং :
লুই আই. কা'ন
২৫৭ কা'নের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি : ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবন
২৫৮ আলদো রসি-এর ডিজাইনকৃত এপার্টমেন্ট
ব্লক
২৫৯ পোর্ট গ্রিমন্ড : পোস্ট মডার্ন
২৬০ রবার্ট ভেনচুরি : পেনসিলভানিয়ার চেস্টনাট
হিলে মায়ের জন্য বাড়ি, ভেনচুরি হাউস
২৬১ নিউ ইয়র্কে এ.টি.অ্যান্ড টি ভবন :
স্থপতি ফিলিপ জনসন
২৬২ আই. এম. পেই ডিজাইনকৃত ওয়াশিংটন
ন্যাশনাল গ্যালারি
২৬৩ প্যারিসে পম্‌পিদু ন্যাশনাল সেন্টার
রিচার্ড রজার্স এবং রেনজো পিয়ানো
২৬৪ হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংক: নরমান ফস্টার
২৬৫ লন্ডনে লয়েড্‌স বিল্ডিং : রিচার্ড রজার্স
২৬৬ লয়েড্‌স বিল্ডিং, অভ্যন্তর
২৬৭ হিন্দু মন্দিরের অংশ বিশেষ
২৬৮ মামাল্লাপুরমে পাণ্ডবদের মন্দির
২৬৯ খাজুরাহোর মন্দির
২৭০ কাঞ্চিপুরমের বৈকুণ্ঠনাথ পেরুমাল মন্দির
২৭১ মন্দিরে-আবৃত ইলোরার পাহাড়
২৭২ এলিফ্যান্টা
২৭৩ সপ্তরথ বা সেভেন প্যাগোডা, মামাল্লাপুরম
২৭৪ মামাল্লাপুরমের শোর মন্দির
২৭৫ তানজোর-এ মন্দির
২৭৬ মাদুরার মন্দিরে গোপুরম
২৭৭ বিজয়নগরের ভিথ্‌থালা মন্দির
২৭৮ শ্রীরঙ্গম মন্দির
২৭৯ পুরীতে জগন্নাথ মন্দির
২৮০ উড়িষ্যা মন্দিরের অংশবিশেষ
২৮১ ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির
২৮২ কোনারক-এ সূর্য মন্দির
২৮৩ খাজুরাহে কান্দারিয়া মহাদেও শিব মন্দির
২৮৪ গোয়ালিয়রের তেলি কা মন্দির
২৮৫ চালুক্য সম্প্রদায়ের মন্দির
২৮৬ আইহোল মন্দির

২৮৭ কাপালাথ মন্দির
২৮৮ বিরূপাক্ষ মন্দির
২৮৯ মহীশূরে চালুক্য হয়সালা পদ্ধতির মন্দির
২৯০ কেশব মন্দির
২৯১ সোমেশ্বর মন্দির
২৯২ আঙ্কোর ওয়াতে মন্দির
২৯৩ সেজদা
২৯৪ রসুল (সঃ)-এর মসজিদ
২৯৫ তিন ধরনের মসজিদ
২৯৬ চার ইওয়ানবিশিষ্ট ইসফাহানে মসজিদ-ই-শাহ্
২৯৭ ইস্তাম্বুলের সোলাইমানের মসজিদ
২৯৮ ঢাকার সাত গম্বুজ
২৯৯ কুব্বাত আস্‌-সাখরাহ্
৩০০ মক্কার পবিত্র কা'বা শরিফ
৩০১ আল-আকসা মসজিদ
৩০২ দামেস্কের প্রধান মসজিদ
৩০৩ সামাররার মসজিদের মিনার
৩০৪ তিউনিসের কাইরাওয়ান মসজিদের মিম্বার
৩০৫ কাইরাওয়ান মসজিদ
৩০৬ দিল্লির কুতুব মিনার
৩০৭ উঠান কেন্দ্রিক কায়রোর আল্‌-আজহার মসজিদ
৩০৮ কায়রো শহরে ইবনে টুলুনের প্রধান মসজিদ
৩০৯ মুসলিম স্থাপত্যে বিভিন্ন ধরনের খিলান
৩১০ কর্ডোভার প্রধান মসজিদ: গম্বুজের তলদেশ
৩১১ কর্ডোভার প্রধান মসজিদ; অভ্যন্তর
৩১২ গ্রানাডার আল-হাম্বরা প্রাসাদ
৩১৩ আল-হাম্বরা প্রাসাদের জানালা
৩১৪ সিংহের উঠান: আল-হাম্বরা প্রাসাদ
৩১৫ তুরস্কে সেপ্তে মিনের মাদ্রাসার জমজ মিনার
৩১৬ তেহরানে খোদাবান্দা শাহ্-এর সমাধি
৩১৭ তুরস্কে সেপ্তে মিনের মাদ্রাসা
৩১৮ ইস্তাম্বুলে হায়া সোফিয়া
৩১৯ এড্রিয়ানোপলে সুলতান সেলিমিয়ে মসজিদ
৩২০ ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমদ মসজিদ : দি ব্লু মস্ক নামে খ্যাত
৩২১ প্রাসাদ কাস্‌র আল-হেয়ার, দামেস্ক
৩২২ দিল্লি কেল্লার দিওয়ান-এ-আম
৩২৩ ফতেহ্‌পুর সিকরীর বিজয় ফটক
৩২৪ তিন নেতার মাজার, ঢাকা
৩২৫ সমরকন্দের গুর-এমির
৩২৬ দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি
৩২৭ সাসারামে শের শাহ্ শূরের সমাধি
৩২৮ সাসারামে শের শাহ্ শূরের সমাধি, প্ল্যান
৩২৯ শেখ সেলিম চিশ্‌তীর কবর, ফতেহ্‌পুর সিক্‌রী
৩৩০ পাঞ্চ মহল, ফতেহ্‌পুর সিক্‌রী
৩৩১ সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি
৩৩২ তাজমহল, আগ্রা
৩৩৩ আগ্রার তাজমহলের পশ্চিম প্রান্তে মসজিদ
৩৩৪ দিল্লীর জামে মসজিদ
৩৩৫ লাহোরের বাদশাহী মসজিদ
৩৩৬ দিল্লী ফোর্ট
৩৩৭ লাহোর ফোর্টের শিশ্ মহল
৩৩৮ দিল্লীতে সফদর জং-এর সমাধিস্থল
৩৩৯ লাহোরে শালিমার গার্ডেন
৩৪০ জয়পুরের নিকট আম্বর প্রাসাদ
৩৪১ বাংলাদেশে ইয়োরোপীয় স্টাইলে ভবন নির্মাণ
৩৪২ প্রাচীন বাংলার মানচিত্র
৩৪৩ মহাস্থানগড়
৩৪৪ পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার
৩৪৫ ময়নামতি-লালমাই এলাকায় শালবন বিহার
৩৪৬ ময়নামতি-লালমাই এলাকায় কুটিলা মুড়া
৩৪৭ বাগেরহাটে কোদলা মঠ
৩৪৮ বাংলার কুঁড়েঘর
৩৪৯ বাংলার কুঁড়েঘরের অনুকরণ : আম্বর প্রসাদ, রাজাস্থান

৩৫০ ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির
৩৫১ রাজশাহীর পুঁঠিয়ার গোবিন্দ মন্দির
৩৫২ দিনাজপুরের কান্তনগর মন্দির
৩৫৩ পাবনার জোড়-বাংলা মন্দির
৩৫৪ ঢাকার সোনারগাঁয়ে পানাম নগর
৩৫৫ পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ
৩৫৬ পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি
৩৫৭ সোনারগাঁয়ের গোয়ালদি মসজিদ
৩৫৮ বিনত বিবির মসজিদ, ঢাকা
৩৫৯ বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ
৩৬০ রাজশাহীর গৌড়ে ছোট সোনা মসজিদ
৩৬১ নওগাঁর কুসুম্ভা মসজিদর মেহরাব
৩৬২ টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ
৩৬৩ মোগল আমলের বিশ্রামঘর ঢাকার বড় কাটরা,
বাণিজ্যিক চাপে আজ বিধ্বস্ত
৩৬৪ লালবাগ কেল্লা
৩৬৫ ঢাকার লালবাগে
খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ
৩৬৬ হোলি রোজারি গির্জা, ঢাকা
৩৬৭ [illegible]দের স্মারক ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গন
৩৬৮ ঢাকায় আর্মেনিয়াবাসীদের গির্জা
৩৬৯ মিটফোর্ড হাসপাতাল, বর্তমানে স্যার সলিমুল্লাহ
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
৩৭০ ঢাকার আহ্সান মন্‌জিল
৩৭১ কার্জন হল, ঢাকা
৩৭২ নর্থ ব্রুক হল, ঢাকা
৩৭৩ ফজলুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৭৪ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
৩৭৫ পুরানো হাই কোর্ট ভবন, ঢাকা
৩৭৬ স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৭৭ ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবন ;
স্থপতি লুই আই. কান
৩৭৮ ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট ;
স্থপতি মাজহারুল ইসলাম
৩৭৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি.
স্থপতি ডক্সিআডিস
৩৮০ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা
৩৮১ এ্যাপেকস ফুট ওয়্যার ফ্যাক্টরি,
শফিপুর, জয়দেবপুর
৩৮২ চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুল-এর [illegible]
সিলেট

স্থাপত্যের শুরু

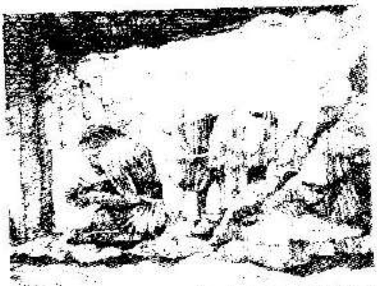

১ আদি মানুষ, আত্মরক্ষার্থে গুহায়

ম কালে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং হিংস্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য গাছের তলায়, গাছের বং পাহাড়ের গুহায় সাময়িকভাবে আশ্রয় নিত দ্যের জন্য মানুষ ঘুরে বেড়াত। কৃষি খামার করে পাদন সম্বন্ধে জানতে মানুষের কত অসংখ্য বছর তা সবই অনুমানের ব্যাপার। তবে চাষাবাদ যখন রু হয়েছে, আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে, াকেই মানুষের নির্দিষ্ট একটি স্থানে বসবাস করার ব হয়েছে। সেই চাহিদা থেকেই আবির্ভাব হয়েছে বাসস্থান নামক ভবনটির এবং বলতে গেলে সেই স্থাপত্যচর্চার ভিত্তি রচিত হয়েছে।

তে আদি মানুষ

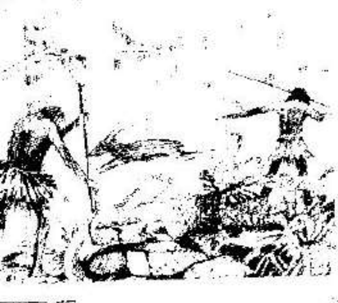

কালের যুদ্ধ

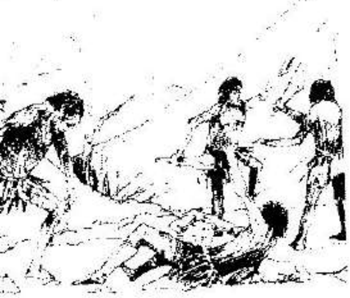

স্থায়ীভাবে বসবাসরত একটি এলাকার জনগোষ্ঠীর সাথে অপর একটি এলাকার মানুষের জীবন ধারণ, মতামত, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় বিশ্বাস, ইত্যাদি বিরোধ থেকে শুরু হয় পারস্পরিক রেষারেষি। তারপর বাধে যুদ্ধ, অপরের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে দুর্গের যুদ্ধের হাতিয়ার তৈরি করার জন্য নির্মিত হয় কারখানা। বসতি এলাকায় প্রাথমিকভাবে পেশীশক্তি ব্যবহার এবং তারপরে ধনদৌলত মজুদ করার কারণে ব্যক্তিবিশেষের হাতে ক্ষমতা চলে আসে। সৃষ্টি হয় রাজ্য। গোষ্ঠীর সর্দার থেকে হয় এলাকার রাজা এবং তাদের প্রয়োজনে তৈরি হয় রাজপ্রাসাদ। এইসব গণ্যমান্য ব্যক্তির মৃত্যুর পর ঐ এলাকার ধর্মীয় রীতিতে তাদের জন্য বৃহৎ ও সুদৃশ্য কবর তৈরি করা হতো। মিশর দেশের (Egypt) প্রাচীন পিরামিডগুলো (pyramid) এমনই সমাধিস্থল।

মানুষের চাহিদা

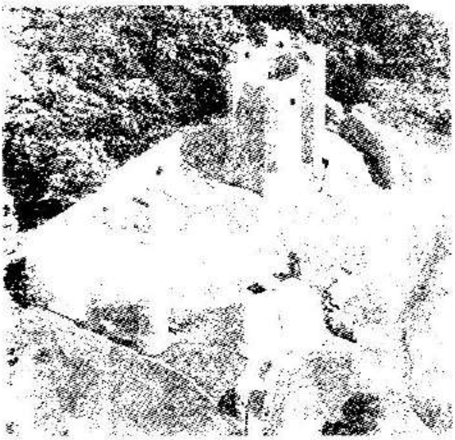

চাষাবাদ শুরু ও বসবাস স্থাপনের সাথে সাথে ক্রমশ মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিচিত্র ধরনের চাহিদা পূরণ করার জন্য বিভিন্ন ধরন এবং আকারের ঘরবাড়ি ও দালান-কোঠা নির্মাণ হতে থাকে। যেমন দুর্গ, কেল্লা, প্রাসাদ, সমাধিস্তম্ভ, মন্দির, গির্জা, মসজিদ, হাসপাতাল, স্কুল, কারখানা, মিলনায়তন, স্টেডিয়াম ইত্যাদি

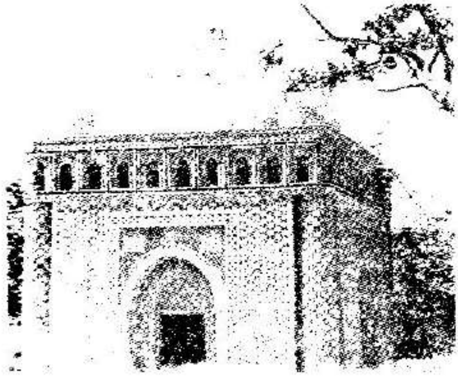

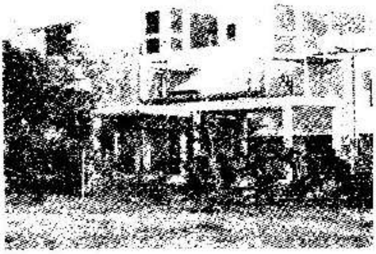

(৪) প্রাসাদ

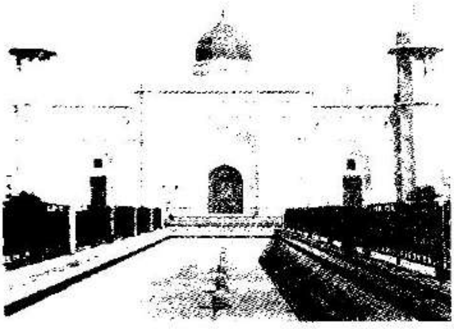

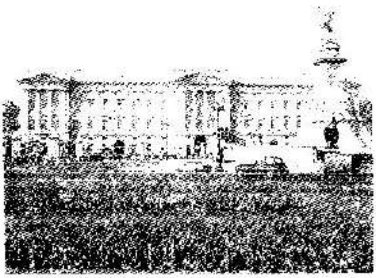

ধর্মীয় বিশ্বাসের গুরুত্ব

[illegible] ইতিহাসে সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ [illegible] এবং মানব জীবনকে [illegible] প্রভাবিত করে এসেছে [illegible] ধর্মীয় সকল গ্রামীণ বাজার [illegible] কেন্দ্রবিন্দুতে তৈরি করা [illegible] ইতিহাসে দেখা যায় এই সকল [illegible] জনজীবনের প্রাণকেন্দ্র [illegible] অ্যাক্রোপলিস (Acropolis) [illegible] সর্বোচ্চ স্থান, সেখানে ছিল [illegible] মন্দির ও নগর রক্ষাকারী দুর্গ [illegible] এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এর [illegible] ব্যতিক্রম হয়নি। অতীতে এবং [illegible] হিন্দু এবং মুসলমানপ্রধান [illegible] গ্রামেগঞ্জে, শহরে বন্দরে মন্দির [illegible] সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবন হিসেবে নির্মিত হয়।

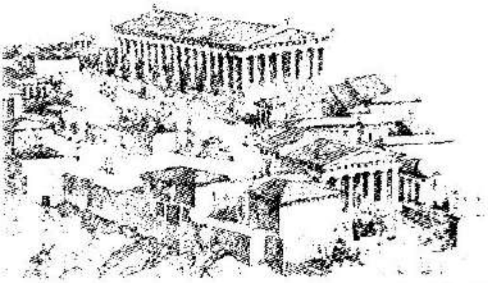

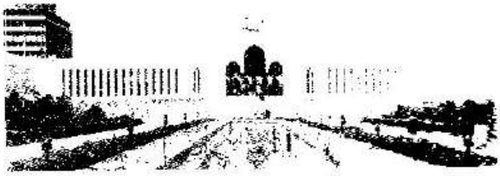

[illegible] কেন্দ্র [illegible]

[illegible] বয়স অনেক। এতকাল ধরে এখানে এত প্রকার মানুষ রয়েছে যে পৃথিবীতে [illegible] সেটাই স্বাভাবিক। ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা [illegible] ধরনের দালান, যথা বৌদ্ধদের বহুধাপ-বিশিষ্ট প্যাগোডা (pagoda), হিন্দুদের মন্দির, [illegible] মুসলমানদের মসজিদ এবং শিখদের গুরুদোয়ারা।

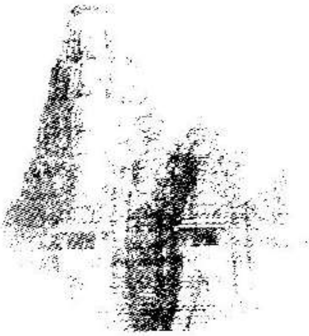

প্রাচীন গুহাচিত্র

[illegible] গুহার দেয়ালচিত্র

[illegible] দেয়ালচিত্র

খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগের স্থাপত্যের ইতিহাস, সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে আজ অবধি লেখা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ এর আগের কোনো দালানের নমুনা পরবর্তীকালে আর তেমন পাওয়া যায়নি। আদিকালের সেসব ঘরবাড়ি এমন সব জিনিস দিয়ে তৈরি হতো যে সেগুলো সময়ের সাথে সাথে হয়েছে বিলীন। তবে বহু প্রাচীন কালের মানুষ সম্বন্ধে ইদানীং প্রাপ্ত কিছু দেয়ালচিত্র হতে সামান্য ধারণা করা যায়।

১৯৯৪ সালের শেষ দিকে দক্ষিণ ফ্রান্সে লাসকক্স (Lascaux) এবং উত্তর স্পেনে আলতামিরার (Altamira) নিকট ভ্যালন-পন্ট-ডি-আর্ক-এর (Vallon-Pont-D'Arc) গুহায় বিশ হাজার বছর আগে অঙ্কিত তিন শত গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইয়োরোপ থেকে হাজার হাজার বছর আগে বিলুপ্ত নেকড়ে, চিতাবাঘ, গন্ডার, ইত্যাদির ছবি থেকে নতুন করে আবার ধারণা করা হচ্ছে যে একদা ইয়োরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব স্পেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে গুহার গায়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০০-১০০০০ সালের আদিবাসীদের অঙ্কিত চিত্র অনেক আগেই পাওয়া গেছে। কয়েকটি গুহাচিত্রের [illegible] সঙ্গে আবার শিশুরা জড়িত। উত্তর স্পেনে স্যান্টান্ডের (Santander) শহরের নিকট ১৮৭৯ সালে [illegible] দ সওতোলা (Marcelino de Sautuola) তাঁর শিশু কন্যাকে নিয়ে তাঁদের বাড়ির নিকট [illegible] গুহা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আবর্জনা ভর্তি গুহার ছাদ নিচু হওয়ায় শিশুটি প্রথমে [illegible] উঠতে ছাদের তলায় অস্পষ্ট চিত্র দেখতে পায়। আবিষ্কৃত হয় কমপক্ষে পনের হাজার বছরের [illegible] আলতামিরা গুহার আদি চিত্র।

ফ্রান্সের মন্টিনাক (Montignac) শহরের কাছে লাসকক্স (Lascaux) গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৪০ সালে। বল নিয়ে খেলছিল দুটি ছেলে। বলটি একটি গর্তে পড়ে গেলে তাদের কুকুর বলের পিছু নেয়। গর্ত হতে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকলে ছেলে দুটি অন্ধকার গর্তে নেমে পড়ে। দিয়াশলাই জ্বালিয়ে ছেলে দুটি হতবাক হয়ে যায়। গুহার দেয়ালে অঙ্কিত রয়েছে নানা রংয়ের ছবি - প্রাগৈতিহাসিক চিত্র নিদর্শন যা আজ বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত চিত্রকর্ম বিবেচিত।

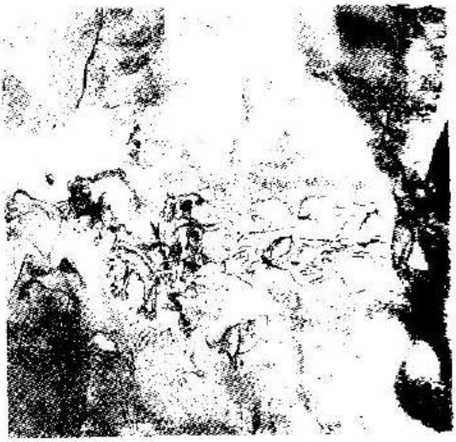

[illegible]

সভ্যতা

আদিম মানবের বর্বরোচিত আচরণ পরিত্যাগ করে মানুষ যখন থেকে একে অপরের সাথে বসবাস করা, [illegible] প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে শিখল, [illegible] মনে স্থান দিল তখন থেকেই সভ্যতার শুরু। লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ ও সভ্যতার ইতিহাস [illegible]

ইতিহাসবিদদের মতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ছয়টি সবচেয়ে পুরাতন সভ্যতা হচ্ছে। [illegible]

১. **মেসোপোটেমিয়া** (Mesopotamia) ;

২. **মিশর ;**

৩. **সিন্ধু বা ইন্দাস** (Indus) **সভ্যতা ; সিন্ধু উপত্যকার মোহেনজোদারো** (Mohenjodaro) **ও হরাপ্পা** (Harappa) ;

৪. **চীন** (China) ;

৫. **মেসো-আমেরিকা** (Meso-America) **বা মধ্য-আমেরিকার আধুনিক এল স্যালভাডোর** (El Salvador), **গুয়াতেমালা** (Guatemala), **আংশিক মেক্সিকো** (Mexico), **হন্দুরাস** (Honduras), **নিকারাগুয়া** (Nicaragua), **ইত্যাদি ; এবং**

৬. **অ্যান্ডিজ** (Andes) **বা দক্ষিণ আমেরিকা।**

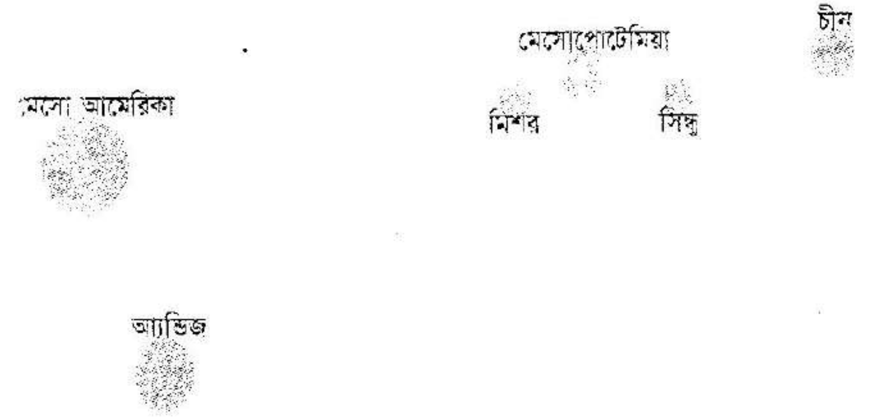

১১ বিশ্ব মানচিত্রে সভ্যতা

সভ্যতা ও নির্মাণ

... বিভিন্ন সভ্যতা ভিন্ন ধরনের ভবন ... দিয়েছে অথবা কলাকৌশল ও ... নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে ... সিন্ধু উপত্যকার মোহেনজোদারোর শহর ..., মিশরীয়দের পিরামিড (pyramid) ... মার্বেল ব্যবহার, রোমানদের ... উদ্ভাবন নির্মাণ-সামগ্রী ও ... কাঠের ব্যবহার, ... নানাবিধ কৃত্রিম ... ও স্থাপত্যের ঐক্য স্থাপন ইত্যাদি ... কোনো সভ্যতার আর্থিক, ... ও প্রযুক্তিগত অবস্থা তুলে ... সভ্যতার মাপকাঠি

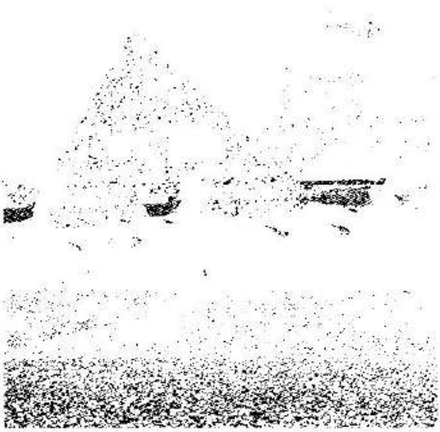

১২ মিশরীয় পিরামিড

[illegible] হাসপাতাল, কলকারখানা, বাজার-[illegible] কলেজ, ইত্যাদি তৈরি করা নির্মাণ [illegible] অন্তর্ভুক্ত হলেও সব দালান ভবনকে [illegible] হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় না। [illegible] মানুষের চাহিদা পূরণ করবে; আশা-[illegible], আর্থিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় [illegible] ইত্যাদি বিষয় প্রতিফলিত করবে; [illegible] দূষিত না করে পরিবেশ থেকে সর্বাধিক [illegible] গ্রহণ করবে; নির্মাণ সামগ্রী ও প্রযুক্তির [illegible] ব্যবহার করবে এবং সর্বোপরি একটা বিশুদ্ধ [illegible] পদ্ধতি বা **স্টাইলের** (style) ধারণা দেবে [illegible], গ্রিক (Greek) স্টাইল, রোমান (Roman) স্টাইল, ইসলামি স্টাইল ইত্যাদি।

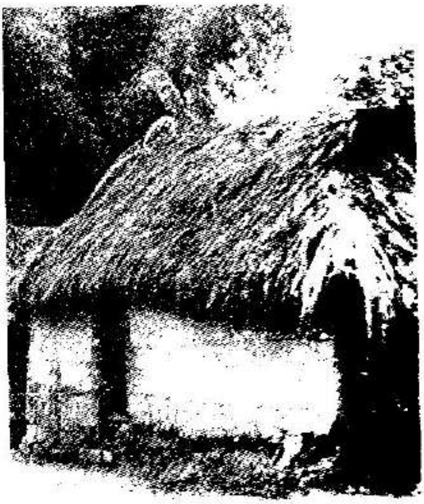

স্থাপত্যের সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে সামান্য কুটির হতে শুরু করে [illegible] সবই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এমনকি প্রযুক্তি এবং প্রকৌশলগত দিক থেকে উৎকর্ষ [illegible] স্থাপত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। মার্কিন প্রকৌশলী [illegible] (Robert Maillart) (১৮৭২-১৯৪০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪[illegible]) [illegible]

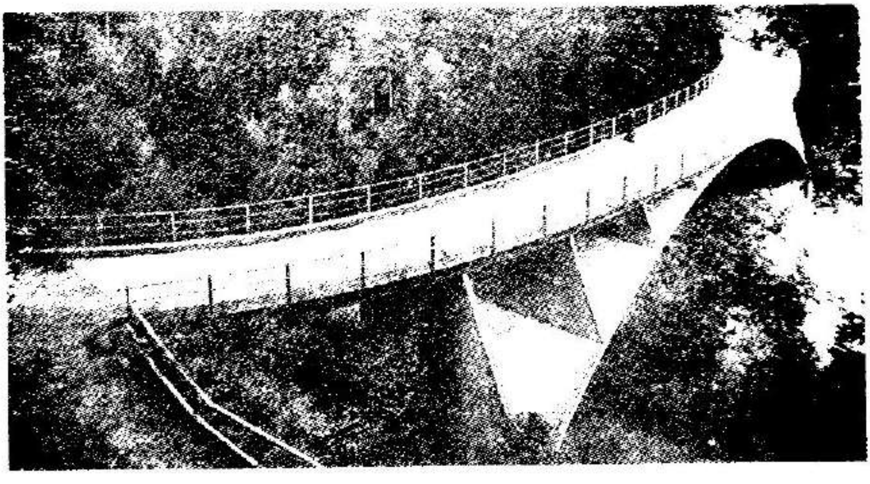

স্থান ঢাকার জন্য জিওডেসিক ডোম (geodesic dome) উদ্ভাবন করে যে সব ভবন নির্মাণ করেছেন তা অবশ্যই স্থাপত্য হিসেবে গণ্য। এগুলোর মধ্যে ১৯৬৭ সালের মন্ট্রিয়াল এক্সপোর (Montreal Expo) মার্কিন প্যাভিলিয়ন (United States Pavilion) উল্লেখযোগ্য। যে ব্যক্তি স্থাপত্য কাজে লিপ্ত থাকেন তাকে স্থপতি বলা হয়।

১৫ বাকমিনস্টার ফুলার : জিওডেসিক ডোম

স্টাইল, রীতি বা শৈলী

বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার জন্য বারবার দালান নির্মাণ করা হলে, একই মানের ও দক্ষতার কারিগর এবং কলাকুশলী কাজ করলে, একই নির্মাণ কৌশল ব্যবহার করা হলে, এমনকি একই রকমের সামগ্রী ব্যবহৃত হলে, নির্মিত ভবনগুলোর মাঝে বিশেষ একটা মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া আবহাওয়াগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ যে কোনো এলাকার বা সময়ের স্থাপত্যের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যত কাছাকাছি হবে, স্থাপত্যের নিদর্শনগুলোর মাঝে সাদৃশ্য ততটাই প্রকট হবে। স্থাপত্যের মাঝে এই মিল বা সাদৃশ্যকেই বলা হয় ঐ সভ্যতার, ঐ এলাকার বা ঐ সময়ের "স্টাইল"।

মানবসভ্যতার সূচনা থেকে আজ অবধি আমরা পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন স্টাইল দেখতে পাই। অধিকাংশ স্টাইল কোনো না কোনো ভৌগোলিক এলাকার মাঝে সীমিত ছিল।

১৬ গ্রিস দেশের পার্থেনন

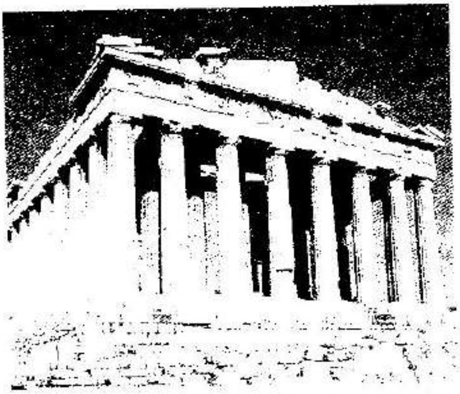

১৭ বাইজান্টিয়ামের ভবন : স্যান ভিটাল

[illegible] মেসোপটেমিয়ায় সুমেরিয় (Sumeria) ও [illegible] (বর্তমান ইরাক), মিশরীয়, সিন্ধু [illegible], ভারতীয়, গ্রিসদেশীয়, রোমান, চীনদেশীয়, [illegible], দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাযটেক (Aztec), ইত্যাদি স্টাইল।

কোনো কোনো স্টাইলের পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে ; যেমন [illegible], বাইজ্যানটাইন (Byzantine) ইত্যাদি [illegible] শত শত বছর পরে ঐ সকল স্টাইলের প্রভাব [illegible] ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবেই ইটালীর [illegible] ফ্লোরেন্স (Florence) শহরে সূচিত হয় রেনেসাঁ (Renaissance) স্টাইল।

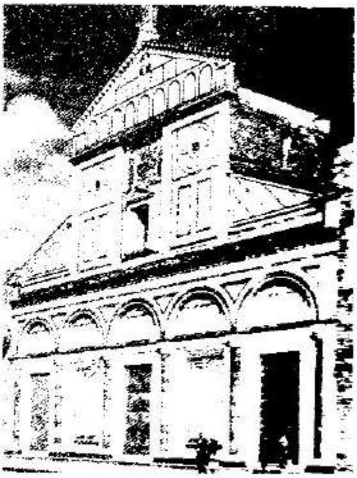
[illegible]

স্টাইলের প্রভাব

এমনও স্টাইল আছে যেগুলো মূল এলাকার ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর [illegible] পড়ে। তবে সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবর্তনগুলো উল্লেখযোগ্য। মূল এলাকার সাথে [illegible] নির্মাণ সামগ্রী ও কৌশল, আবহাওয়া, ধর্মীয়-সামাজিক রীতিনীতি, কৃষ্টি ইত্যাদির মধ্যে কিছু কিছু [illegible] থাকলে সেই সব এলাকায় মূল স্টাইলের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণে স্টাইলের আদান-প্রদান [illegible] তার মধ্যেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করার মতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে গথিক [illegible] সমগ্র ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়লেও জার্মানি, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের গথিক স্থাপত্যের মধ্যে সুস্পষ্ট [illegible]

[illegible] গথিক চার্চ : কোলন ক্যাথিড্রাল

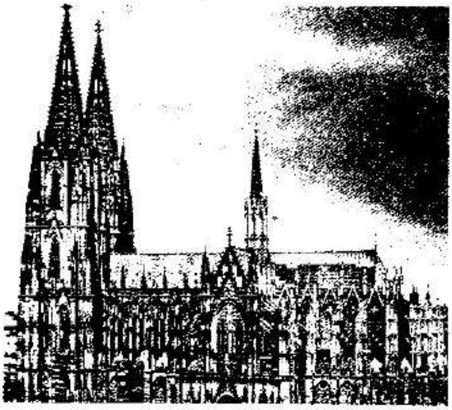

[illegible] গথিক চার্চ [illegible]

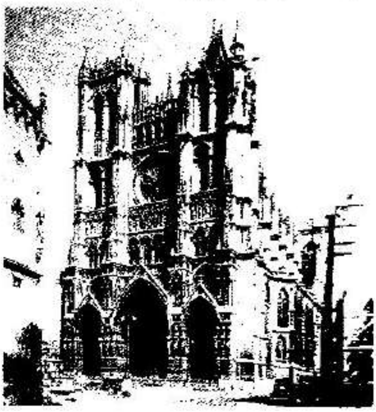

প্রসঙ্গত ইসলামি স্থাপত্যের কথাও উল্লেখ করা যায়। মুসলিম জাহানের, তথা সভ্য বিশ্বের [illegible] জায়গা জুড়ে, সর্বত্র ইসলামি স্থাপত্যের [illegible] বিরাজ করলেও ইসলামি যুগের প্রারম্ভে [illegible] স্থাপত্যের সাথে ইসলামি প্রভাবে [illegible] বাংলাদেশের স্থাপত্যের নিদর্শনগুলোর [illegible] পার্থক্য রয়েছে।

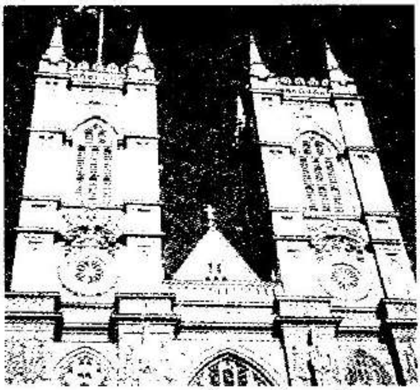

২১ বিলেতের গির্জা : ... চার্চ

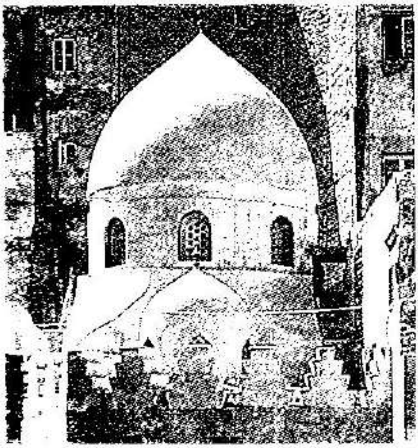

২২ ... ইসলামি স্থাপত্য : ... কায়রো

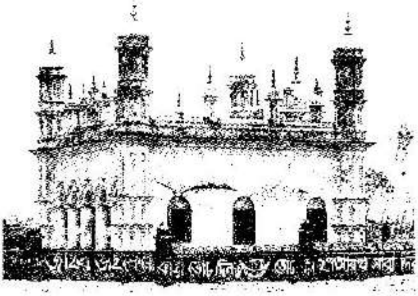

২৩ বাংলাদেশে ইসলামি স্থাপত্য : চকবাজারের মসজিদ

শিল্প, বিজ্ঞান ও স্থাপত্য

২৪ শিল্পের নানা রূপ : চিত্র, ভাস্কর্য, সেতার বাদক, একটি বাড়ি

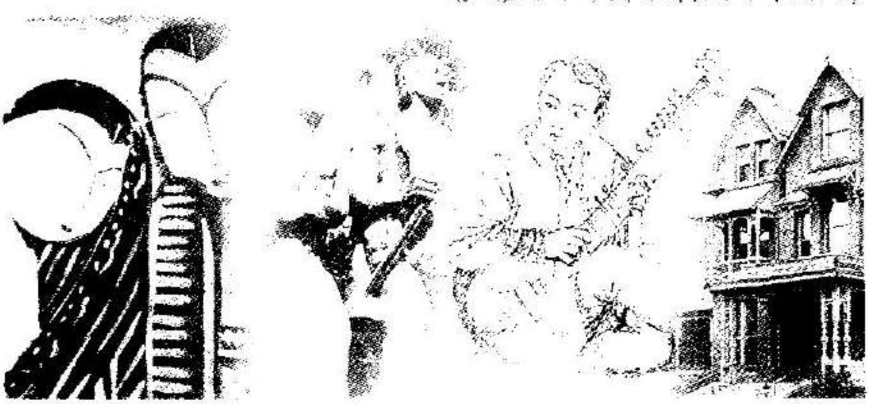

এই মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে, আনন্দ দিয়ে বিস্মিত করে, মানুষের আবেগ এবং অনুভূতি [illegible] এই বিচারে স্থাপত্যবিদ্যা শিল্পকর্ম আবার প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যতীত কোনো নির্মাণ কাজ [illegible] [illegible] কিংবা ভবনকে ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব নয়। স্থাপত্যকে তাই যুক্তিসঙ্গত [illegible] [illegible] শিল্প ও বিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করা হয়

[illegible], ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পের সাথে স্থাপত্যের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে স্থাপত্য এমন একটি [illegible] [illegible] দর্শক স্থপতির সৃষ্ট নিদর্শনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে, শৈল্পিক এই বস্তুকে [illegible] [illegible] এবং সে নিজেই সৃষ্ট স্থাপত্য কর্মের অন্তরঙ্গ ও অপরিহার্য অংশ হতে পারে এমনটি হবার [illegible] [illegible] শিল্পকর্মের নেই।

প্রয়োজন থেকে স্থাপত্য

[illegible] শিল্পী, কলাকুশলী আত্মতৃপ্তির জন্যই শিল্পচর্চা করতে পারে; যেমন গায়ক নিজের [illegible] [illegible], চিত্রকর নিজেকে আনন্দ দেবার জন্যই ক্যানভাসে তুলির পরশ বুলিয়ে যেতে পারে [illegible]

২১ [illegible]

[illegible] প্রয়োজন বা বিশেষ চাহিদা ছাড়া স্থপতি স্থাপত্যকর্ম আরম্ভ করতে পারেন না

প্রয়োজন কিংবা কারণ ছাড়া কোনো সময় কোনো ভবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না [illegible] প্রয়োজনে এবং কাদের ব্যবহারের জন্য ভবন তৈরি হবে সেটাই পরিকল্পনা [illegible] প্রারম্ভে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য [illegible] বাসস্থান হিসেবে, কোনো অফিস [illegible] ব্যবহারের জন্য, ধর্মীয় কারণে, [illegible] সুবিধার্থে ইত্যাদি প্রয়োজনে ভবন [illegible] করা হয়

অনেক সময় দেখা যায় যে একটি প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন, এমনকি চাহিদা মোতাবেক ব্যবহারের পরও, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বা একাধিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এমনটি হলে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয় যেমন ঃ বাংলাদেশে আবাসিক এবং

২২ [illegible]

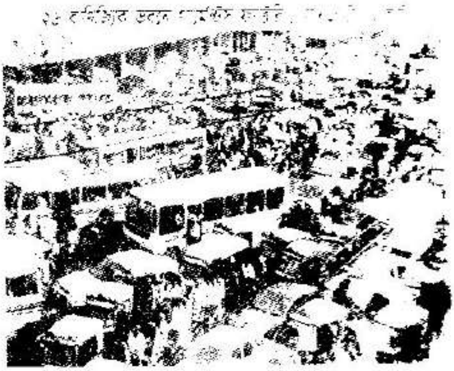

বাণিজ্যিক ভবনে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি (garments factory) স্থাপন নাগরিক জীবনে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি করছে।

ভবনের পরিকল্পনা

একটি ভবন মালিকের জন্য ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাথে সাথে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে খেয়াল করা উচিত তা হল জমি, স্থপতি ও অন্যান্য উপদেষ্টার সম্মানী, নির্মাণ কাজ, আসবাবপত্র এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ব্যয়ের জন্য অর্থ।

প্রথমেই প্রয়োজন হবে ব্যবহারকারীর চাহিদানুযায়ী ভবনটি নির্মাণ করার জন্য একটি পর্যাপ্ত ও উপযোগী জমি। ভবনের প্রয়োজনীয় স্থানের তুলনায় জমি কম হলে, কিংবা জমিতে খোলা জায়গা রাখার উদ্দেশ্যে, ভবন বহুতল হিসেবে নির্মিত হয়ে থাকে। যেহেতু শহরে জায়গার তুলনায় অনেক বেশি লোক

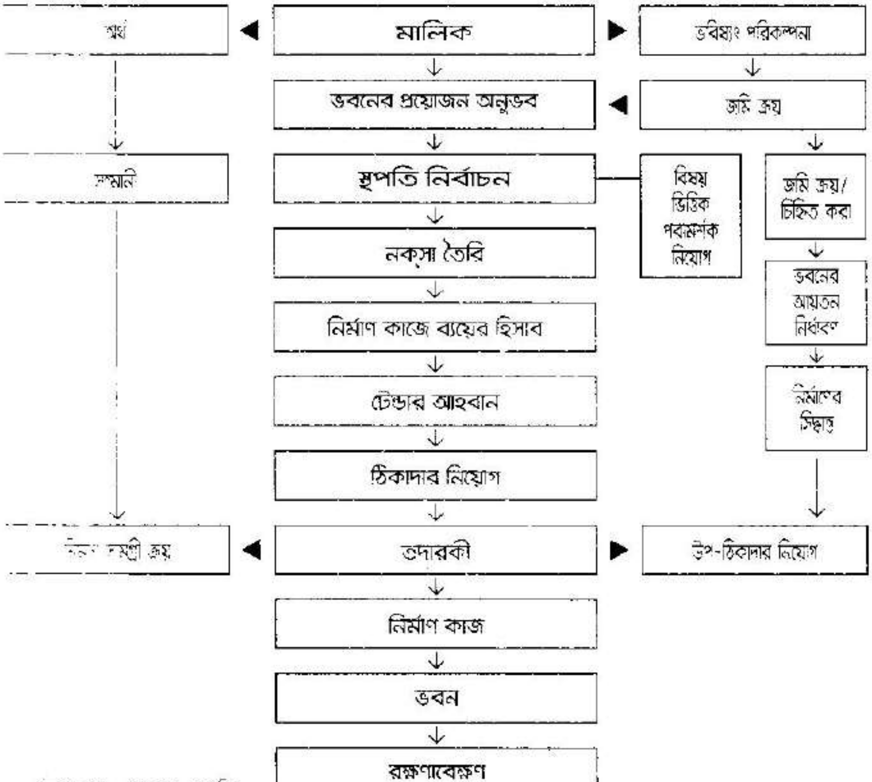

[illegible] প্রবাহ রেখাচিত্র

[illegible] কারণে সেহেতু শহরে উঁচু বহুতল ভবন তৈরি হয়। গ্রামে খোলামেলা জায়গার অভাব [illegible] সাধারণত একতলা, বড় জোর দোতলা হয়

[illegible] করণ স্থির, সম্ভাব্য অর্থের যোগান এবং জমি নির্বাচন করার পর প্রস্তাবিত ভবনের [illegible] মালিক [illegible] স্থপতিকে ভবনের নকশা তৈরি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে অনেক সময় [illegible] [illegible] স্থপতি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে পারেন। স্থপতি অবশ্যই এই কাজগুলো করার [illegible] মালিকের নিকট থেকে সম্মানী পাবেন। স্থপতির নক্সা অনুযায়ী ঠিকাদার (কন্ট্রাক্টর) ভবন [illegible] [illegible] প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজের জন্য সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করা যেতে পারে [illegible] ভবনের [illegible] নির্মাণ কাজের দায়িত্ব নিতে বা মালামাল ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারে না [illegible] [illegible] প্রভাবিত হয়ে পরতে পারেন এবং এতে করে ভবনের ক্ষতি হতে পারে

স্থাপত্যকর্মের উপাদান

যে সকল বিষয়ে চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে স্থপতি ভবনটির ডিজাইন ও নকশা তৈরি করবেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হলো -

১. প্রস্তাবিত ভবনের মালিকের উদ্দেশ্য ও ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় চাহিদা নিরূপণ

২. নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয়ের পরিমাণ

৩. জমির সীমানা এবং অবস্থা

৪. পার্শ্ববর্তী জমি, ভবন ও রাস্তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যবহার

৫. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

৬. পরিবেশের সাথে সঙ্গতি

৭. এলাকার ধর্মীয়, সামাজিক এবং কৃষ্টিগত প্রেক্ষাপটে ভবনের উপযোগিতা

৮. পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক আলো, বাতাস ও রৌদ্রের ব্যবস্থা

৯. অধিক রৌদ্র, তাপ, বৃষ্টি, শীতকালীন বাতাস ইত্যাদি নিবারণ

১০. উপযুক্ত নির্মাণ সামগ্রী

১১. প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি

১২. প্রীতিকর শব্দ শোনার ব্যবস্থা এবং বিরক্তিকর শব্দ নিয়ন্ত্রণ

১৩. অগ্নিকাণ্ডে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

১৪. প্রাপ্য পানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের সরবরাহ ও সদ্ব্যবহার

১৫. আবর্জনা, বৃষ্টি ও ময়লা পানি নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির ব্যবস্থা

যেহেতু উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রত্যেক স্থানে, এলাকায় এবং দেশে ভিন্নতর সেহেতু প্রতিটি ভবন যে বিভিন্ন আকারের ও ধরনের হবে সেটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, অভিন্ন পরিস্থিতিতে সাধারণত একটা ভবন হবে আর একটির প্রতিকৃতি; যেমন দেখা যায় বিগত দিনের কিছু গৃহায়ণ প্রকল্পে বা বাংলাদেশে সরকারি কোনো স্টাফ কোয়ার্টারে। উপরের বিষয়গুলোর তুলনামূলক তাৎপর্য প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। ধর্মীয় ভবনে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি প্রাধান্য পেতে পারে; আবার কারখানার ডিজাইনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ গুরুত্ব পাবে।

নির্মাণ সামগ্রী

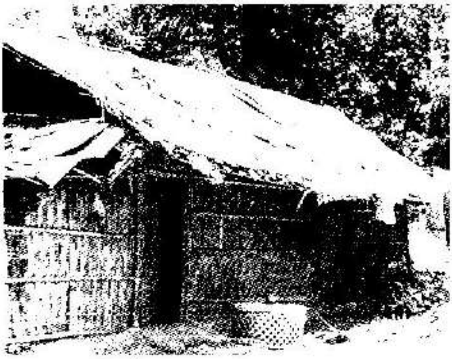

বাঁশের তৈরি বাড়ি

স্থাপত্যের শুরু হতে আজ পর্যন্ত নির্মাণ কাজে মানুষ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ব্যবহার করেছে; যথা ঃ মাটি, কাঠ, বাঁশ, গাছের পাতা, পাথর, ইট, সুরকি, লোহা, ইস্পাত বা স্টীল (steel), কংক্রিট (concrete)। বর্তমানে শহরে ভবন নির্মাণের সামগ্রী হচ্ছে কাঠ, পাথর, ইট, বালু, লোহা, ইস্পাত, কংক্রিট (concrete), রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট (Reinforced Cement Concrete বা R.C.C.), কাচ, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক্স (plastics) ইত্যাদি এসবের পাশাপাশি গ্রামেগঞ্জে আজও মাটি, বাঁশ, গাছের পাতা ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে।

সাধারণত স্থানীয়ভাবে লভ্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয় মাটির দেশে মাটি, পাহাড়ের আশেপাশে পাথর, জঙ্গলে গাছ, লতা-পাতা এই দিয়ে মানুষ শুরুতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে প্রকৃতির আঘাত হতে ভবনকে রক্ষা করার জন্য মানুষ টেকসই নির্মাণ সামগ্রীর সন্ধান করে। পেয়েও যায় তবে ধর্মীয়, সামরিক এবং রাজকীয় ভবনের নির্মাতরা দুর্লভ ব্যয়সাধ্য সামগ্রী আমদানি করতে কার্পণ্য করেনি বিশ্বের বহু স্থানে অনেক মসজিদ, মন্দির, গির্জা, রাজপ্রাসাদ, কেল্লায় এই চিন্তাধারার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

কাঠ

ভবন নির্মাণে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত উপাদানের অন্যতম হলো কাঠ। প্রাগৈতিহাসিক কালে কঞ্চির বেড়া দিয়ে কাঠামো নির্মিত হতো এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে পরবর্তীকালে গাছের গুঁড়ি ভূমির সমান্তরালে একটার পর একটি সাজিয়ে ঘরের কোণগুলো কাঠের গোঁজ দিয়ে আটকিয়ে বাধা হতো। ছাদের জন্য ব্যবহার করা হতো এবড়োথেবড়ো করে চেরাই করা কাঠের তক্তা শত শত বছর ধরে নির্মিত এমন সব আদি

[illegible] থেকে বিকশিত হয়েছে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের অপূর্ব চিত্তাকর্ষক কাঠের কুটির, [illegible] [illegible] কাঠের গির্জা, আসামের মনোহর বাস ভবন ইত্যাদি। বাংলাদেশ এবং আসামেও যে উচ্চমানের [illegible] [illegible]-ঘর তৈরি হতো তার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়।

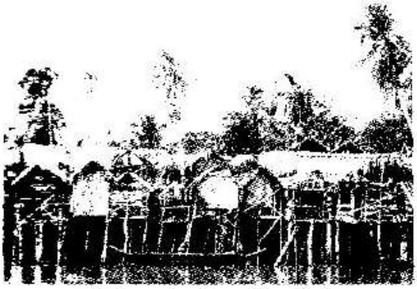

[illegible] দিয়ে তৈরি কুটির : সুটিয়াকাঠি, পিরোজপুর

[illegible]

[illegible] কাঠের বাড়ি : সুটিয়াকাঠি, পিরোজপুর

[illegible]

পাথর

[illegible]

[illegible]ের পর নির্মাণ কাজের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় পাথর। তবে শক্ত পাথর দিয়ে কাজ করা কঠিন [illegible] পাথরের প্রথম ইমারতগুলো আকারে অতি সাধারণ এবং অমার্জিত ছিল। নির্মাণের জন্য [illegible]ৎকৃষ্ট পাথর হল চুনাপাথর। চুনাপাথরের (…estone) গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে আবহাওয়ার [illegible] সহ্য করার ক্ষমতা, সর্বত্র সমান গঠন এবং সহজে কাটার সুবিধা। বেলে পাথর (…ndstone) কঠিন এবং কাটা কষ্টসাধ্য। [illegible] পাথর আবহাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যায়,

... চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং এতে রয়েছে দৃঢ়তার অভাব।

... বড় পাথর একটার উপর আরেকটা বসিয়ে তৈরি করা হতো দেয়াল। জোড়া লাগাবার জন্য কোনো ... সিমেন্ট (cement) বালু কিংবা চুন-বালুর মিশ্রণ ব্যবহার করা হতো না। স্থান বিশেষে দেয়ালের ... গুলো পাথরগুঁড়ো দিয়ে ভরে দেয়া হতো। যেহেতু কাঠের পরে পাথরের আবিষ্কার সেহেতু ...দের প্রথম দিকে পাথরের আকার ও বিন্যাসের পদ্ধতি কাঠের অনুকরণে হতো।

ইট

... নিজের তৈরি সর্বপ্রথম নির্মাণ সামগ্রী হচ্ছে ইট। ইট ব্যবহৃত হয় কাঠ এবং পাথরের পরিবর্তে ... কষ্ট হওয়ার পরই ইটের কদর বৃদ্ধি ... শুরুর দিকে একই বাড়িতে কাঠ এবং ইট ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে এঁটেলমাটির দেশে ... ইটের তৈরি বাড়ি দেখা যায়।

...রা (Roman) কাদামাটি দিয়ে ইট ... আরম্ভ করে। প্রাচীনকালে সূর্যের তাপে ইট শুকানো হতো। বর্তমানে ইটের ভাঁটাতে বা ... কাদামাটি দিয়ে তৈরি ইট শুকানো ...

...সিরিয়া (Assyria) (বর্তমান ইরাক) এবং ... (Persia) (বর্তমান ইরান) ইট দিয়ে ... এবং আড়ম্বরপূর্ণ দালান সেই ... কালের স্বাক্ষর বহন করে ... ডিজাইনকৃত ঢাকার কালিন্দি ...মেন্টস ইটের কাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

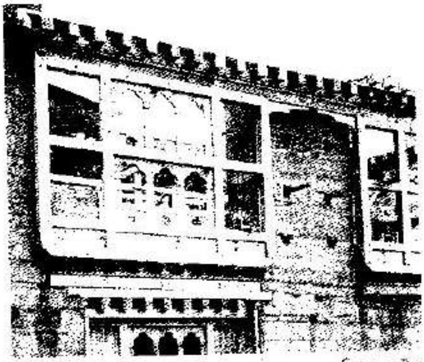

১৫. একই দালানে ইট ও কাঠের ব্যবহার, থিম্পু, ভুটান

১৬. ইটের দালান, কালিন্দি এপার্টমেন্টস, ঢাকা

লোহা

... দিয়ে প্রাচীনকালে অস্ত্র এবং যন্ত্র তৈরি করা হতো; নির্মাণ কাজে লোহা ব্যবহার করা হতো না। এশিয়া ... খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালে প্রথম লোহা আবিষ্কার হয় এবং ভূমধ্যসাগরীয়

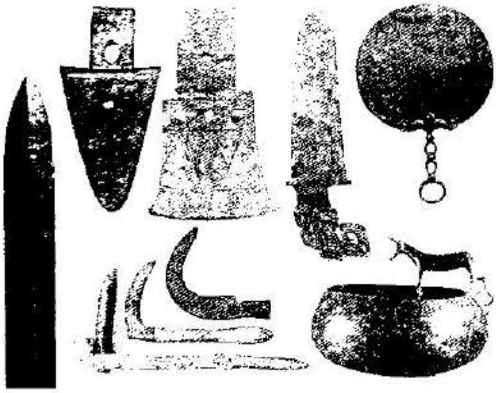

১০. লৌহযুগের [illegible] ও [illegible]

দেশসমূহে এর ব্যবহার [illegible]

রোমান রাজত্বকালে ইংল্যান্ডে [illegible]

তৈরি হতো।

লোহা (iron) [illegible] (limestone) এবং [illegible] ব্লাস্ট ফার্নেসে (blast [illegible]) [illegible] তাপে দহন করলে [illegible] (cast iron) বা পিগ আয়রন সৃষ্টি হয়। এতে ২-৬% [illegible] থাকে এবং সাধারণত সরাসরি ব্যবহার করা হয় না; বরং ইস্পাত বা রট আয়রণে (wrought iron) অথবা পেটানো লোহায় রূপান্তরিত করা হয়।

পেটানো লোহা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার্য [illegible] এবং এতে কার্বন থাকে না বললেই চলে। তবে কিছু পরিমাণ আয়রণ সিলিকেট (iron silicate) যোগ করা হয়।

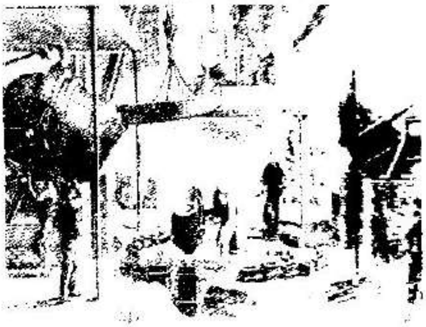

১১. ব্লাস্ট ফার্নেসে [illegible]

১২. লোহার থাম ও কড়ি

১৩. বিলেতের [illegible] লোহার থাম, ১৯শ শতক

যে লোহায় ০.০২-১.৫% কার্বন [illegible] ইস্পাত বা স্টিল (steel) [illegible] অন্যান্য ধাতুর উপস্থিতি এবং [illegible] কৌশলের উপর স্টিলের [illegible] স্টেইনলেস স্টিলে (stainless [illegible]) ৯০% লোহা, ১২-২০% ক্রোমিয়াম এবং ০.১-০.৭% কার্বন ছাড়াও [illegible] থাকতে পারে। ইংল্যান্ডের কোলব্রুকডেলে (Coalbrookdale) ১৭৭৫ সালে [illegible] আয়রণ ব্রিজ (Iron Bridge) নির্মাণ [illegible] লোহা প্রথমবারের মতো একটি [illegible] লাগানো হয়।

ইস্পাত

[illegible] ইস্পাত বা স্টিল [illegible]-এর আগমন লোহার প্রায় এক শত বছর পরে। লোহার সাথে [illegible] এবং সামান্য পরিমাণে অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণে ইস্পাত তৈরি হয়। দেখতে সাদাটে-[illegible] অত্যন্ত শক্তিশালী সামগ্রী এই ইস্পাত, যার আঁকড়ে ধরে রাখার শক্তি বা টেনাসিটি [illegible] এবং প্রসারণসাধ্যতা বা টেনসাইল [illegible] শক্তির কারণে নির্মাণের জন্য এটি বিশেষভাবে [illegible] সালে হল্যান্ডে একটি সেতু নির্মাণের মাধ্যমেই এর ব্যবহার শুরু। ঐ শতকের শেষের [illegible] নির্মাণের কাজে ইস্পাত ব্যবহৃত হতে থাকে।

৪১ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, নিউ ইয়র্ক

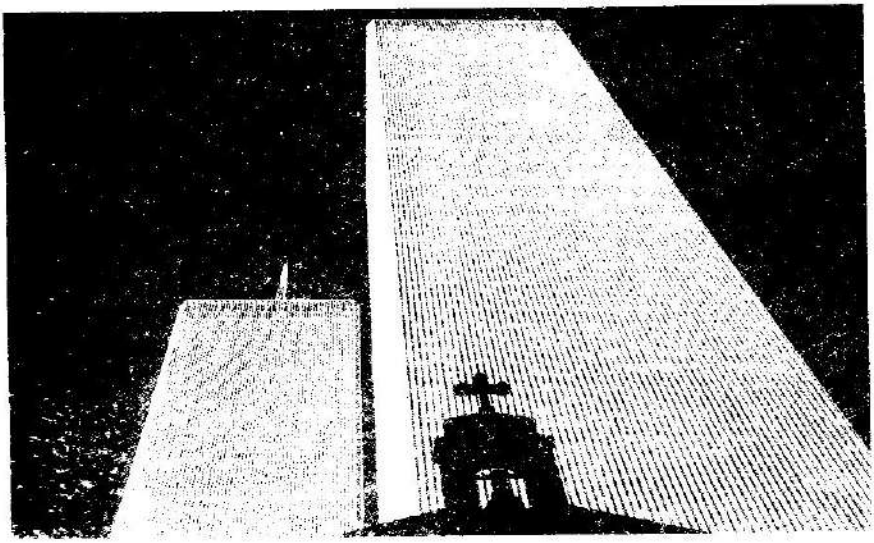

[illegible] সালে স্কিডমোর, ওয়িংস এন্ড মেরিল (Skidmore, Owings and Merrill)-এর স্থপতি গর্ডন [illegible] Bunshaft) লিভার বিল্ডিং (Lever Building) ডিজাইন করতে গিয়ে পাথরের শেষ চিহ্ন [illegible] ইস্পাত ও কাচ ব্যবহার করেন।

[illegible] ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের (World Trade Centre) (১৯৬২-৭৭) ১১০ তলা ভবন দুটি [illegible] মিনোরু ইয়ামাসাকি (Minoru Yamasaki) ডিজাইনকৃত এই যমজ অট্টালিকা বা "টুইন [illegible]-এ সাত ধরনের ইস্পাত ব্যবহৃত হয়েছে।

[illegible] ক্রিট (concrete)

[illegible] বয়স আনুমানিক দুই হাজার বছর হবে। তবে রিইনফোর্সড

[illegible] কংক্রিট উপকরণের [illegible]

সিমেন্ট কংক্রিট (Reinforced Concrete) বা R.C.C. মাত্র একশত [illegible] আবিষ্কার। সিমেন্ট, বালু এবং [illegible] টুকরো পানির সাহায্যে নির্দিষ্ট [illegible] মিশ্রিত করলে কংক্রিট তৈরি হয় [illegible] চাপ বহন করতে পারলেও [illegible] সীমাবদ্ধতা রয়েছে [illegible] কংক্রিট পূরণ করতে পারে [illegible] জন্য যখন ভিতরে লোহার রড [illegible] তখন সৃষ্টি হয় রিইনফোর্সড সিমেন্ট [illegible]

ফরাসি প্রকৌশলী [illegible] তখনকার নতুন [illegible] মিল [illegible]

[illegible]

[illegible] মিশরীয়রা কাচ সম্বন্ধে অবগত ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে কাচ আবিষ্কৃত [illegible] কাচ তৈরির প্রযুক্তিকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। শুরুতে কাচের ভিতর দিয়ে [illegible] যায় না। আধুনিক যুগে কাচ ছাড়া কোনো দালান চিন্তাই করা যায় না। [illegible] প্রস্থে বিরাটাকার করার অনেক পদ্ধতি মানুষের আয়ত্তাধীন। উন্নত দেশে বিশেষ [illegible] ইমারতের [illegible] আচ্ছাদিত করে সম্পূর্ণ ভবনকে কাচ দিয়ে ঢেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল আকাশচুম্বী গ্লাস স্কাইস্ক্রেপার (glass skyscraper) এমনকি গ্লাস ব্লক (glass-block) দিয়ে নির্মিত আয়তনের

[illegible]

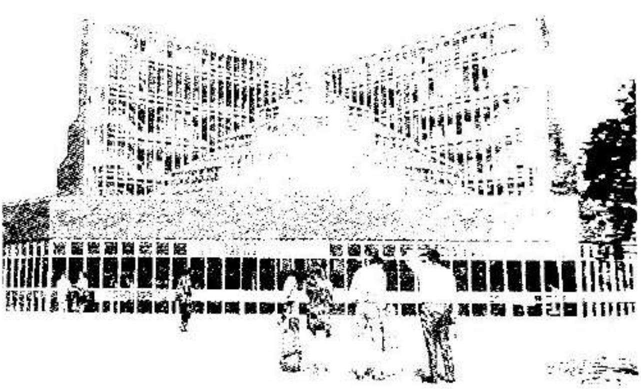

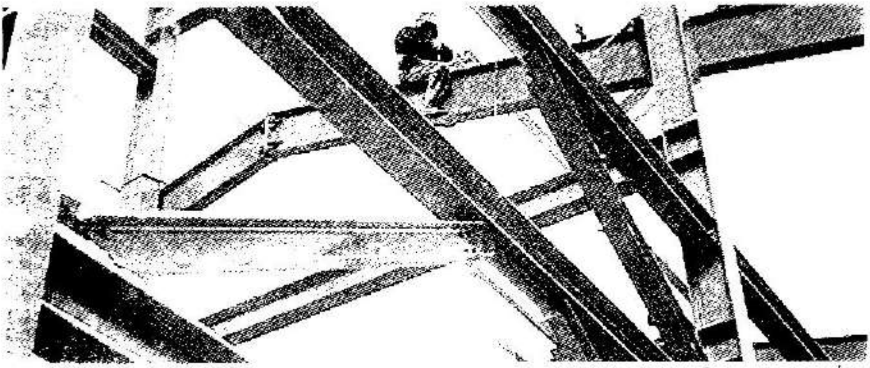

৪৪. ভবন নির্মাণে ইস্পাতের কাঠামো

[illegible] তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। আবার অত্যন্ত সরু কাচের সুতা বা গ্লাস ফাইবার (glass fibre) বুনে শক্ত-[illegible] প্লাস্টিক্স (plastics) মজবুতকরণ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ এবং তাপ রোধসহ বিভিন্ন কাজে তা ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্লাস্টিক্স (plastics)

প্লাস্টিক্স সর্বাধুনিক নির্মাণ সামগ্রী। সাধারণ প্লাস্টিক থেকে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিককে পৃথক করার জন্য একে প্লাস্টিক্স নামকরণ করা হয়েছে।

প্লাস্টিক্স দেয়াল এবং ছাদসহ ভবনের নানাবিধ কাজে ব্যবহার হচ্ছে। তবে প্লাস্টিক্স দিয়ে ভবনের [illegible] (interior decoration) ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী এবং আসবাবপত্র তৈরি অধিকতর জনপ্রিয়। পানি, [illegible] ইত্যাদি সরবরাহের জন্য নল বা ডাক্ট (duct) তৈরিতেও এর ব্যবহার ব্যাপক। প্লাস্টিক্স প্রধানত দুই [illegible] হয়ে থাকে :

থার্মোপ্লাস্টিক (thermoplastic) সামগ্রী, যাকে তাপ প্রয়োগে বারবার নমনীয় করে প্রতিবার নতুন রূপ [illegible]। এটি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত :

(ক) সেলুলোজ (cellulose), যথাঃ রেয়ন (rayon), সেলোফেন (cellophane) ইত্যাদি

(খ) পলিমার (polymer), যথাঃ পলিথিন (polythene), পলিভিনাইল ক্লোরাইড (polyvinyl chloride) সংক্ষেপে PVC) ইত্যাদি

থার্মোসেটিং প্লাস্টিক (thermosetting plastic) যা তাপ প্রক্রিয়ার কারণে ও প্রথমবার গঠনের সময় [illegible] ভাবে পরিবর্তিত হয়ে স্থায়ীভাবে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ : ব্যাকেলাইট (bakelite)

পরামর্শক বা কনসালট্যান্ট (cons[illegible]

ভবনের মালিকের জন্য একজন স্থপতি হলো পরামর্শক বা কনসালট্যান্ট। ভবনের ডিজাইন ও [illegible] সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শ দেয়া স্থপতির দায়িত্ব। তবে নির্মাণ কাজ এতো ব্যাপক যে স্থপতির [illegible] খুঁটিনাটি সব বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা অসম্ভব। তাই সঠিকভাবে ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন [illegible] অভিজ্ঞ অন্যান্য পরামর্শকারী বা কনসালট্যান্ট, যথাঃ ভিত্তি ও কাঠামোর জন্য প্রয়োজন পুরকৌশলী [illegible] Engineer); বিদ্যুৎ যোগাযোগের জন্য তড়িৎকৌশলী (Electrical Engineer); শীতাতপনিয়ন্ত্রণ [illegible] কন্ডিশন (air-condition), লিফট, ইত্যাদির জন্য যন্ত্রকৌশলী (Mechanical Engineer) ইত্যাদি।

এছাড়া রয়েছে এস্টিমেটর (Estimator) যাঁর দায়িত্ব হচ্ছে নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত সামগ্রীর [illegible] কাজের পরিমাণ বা বিল অব কোয়ানটিটি (Bill of Quantity) বা বিল অব ম্যাটেরিয়ালস (B[illegible] এবং সম্ভাব্য ব্যয় বা কষ্ট এস্টিমেট (Cost Estimate) নির্ণয় করা।

হাসপাতাল, কারখানা, আকাশচুম্বী দালান বা স্কাইস্ক্রেপার (skyscraper), ইত্যাদি [illegible] সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ (পেশাগত স্থপতিও হতে পারেন), ডিজাইনকৃত প্রস্তাবিত [illegible] স্থপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ভবন ডিজাইন করার সময় স্থপতিকে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে তার ডিজাইন [illegible] এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য পেশার পরামর্শকদের কাজ করতে সুবিধা হয়। তাই স্থপতিকে [illegible] ও নকশা তৈরিতে কেন্দ্রীয় এবং মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। স্থপতির সেজন্য [illegible] বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ের উপর সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। স্থাপত্যবিদ্যার বিভিন্ন স্তরে এই [illegible] দেয়া হয়।

ভবনের অংশবিশেষ

একটি ভবনের বিশিষ্ট অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে মেঝে, দেয়াল, ছাদ, দরজা এবং জানালা। বস্তুতপক্ষে স্থান এবং সময়ানুযায়ী এসব অংশের আকার ও বিন্যাসের পরিবর্তন করতে হয় এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টাইলের সূচনা ও সফল সমাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশের গ্রামে অনেক বাড়িতে মাটির মেঝে দেখা যায়। আবার পাথরপ্রধান দেশে গ্রামীণ বাড়ির মেঝে স্বাভাবিকভাবেই

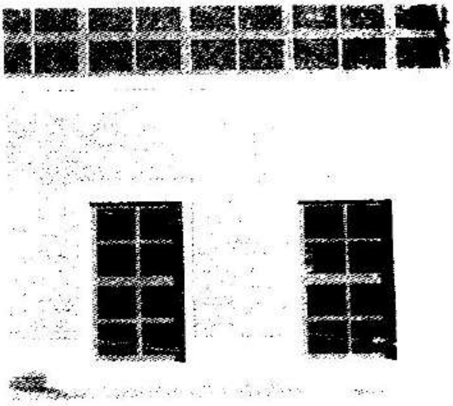

[illegible] দিয়ে ঢাকা। জাপানের কাঠের তৈরি মেঝে খুবই আকর্ষণীয়। তবে আজ বিশ্বজুড়ে আধুনিক বাড়ির [illegible] কংক্রিট দিয়ে তৈরি। কংক্রিটের মেঝের উপর সিমেন্টের মসৃণ প্রলেপ, যা নীট সিমেন্ট ফিনিশ (neat cement finish) হিসেবে পরিচিত; সাদা-রঙিন প্রস্তরাদি দ্বারা সৃষ্ট কারুকার্যবিশেষ মোজাইক বা মোজেইক (mosaic), মার্বেল ও গ্রানিট (granite) পাথর; আর্টিফিসিয়াল স্টোন (artificial stone), অর্থাৎ কৃত্রিম পাথর এবং এমনকি কাঠ, ইত্যাদি দিয়ে মেঝের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ইংরেজিতে একেই বলে ফ্লোর ফিনিশ (floor finish)। পানির জন্য বাথরুমের মেঝেতে সিরামিক টাইলের (ceramic tile) ব্যবহার প্রচলিত। একই কারণে অভিজাত ভবনের বাথরুমে কৃত্রিম স্টোন বা মার্বেল পাথর শোভা পায়।

[illegible] মেঝে

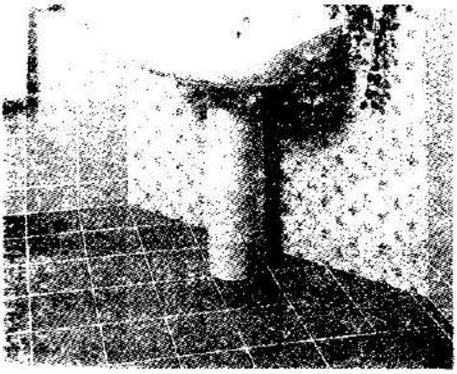

[illegible] এবং [illegible] সিলিং

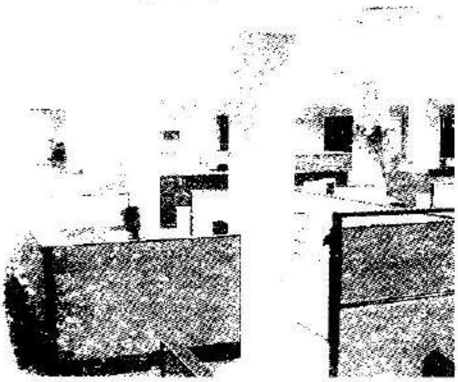

দেয়ালের কাজ নানাবিধ, যেমন রৌদ্র-বৃষ্টি এবং তাপ হতে মানুষকে রক্ষা করা, ঘরের অধিবাসীদের লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা, ঘরের আকার এবং অবয়ব নির্ধারণ করা, ছাদের ভার বহন করা ইত্যাদি।

[illegible] দেয়াল [illegible]

৪১. [illegible]

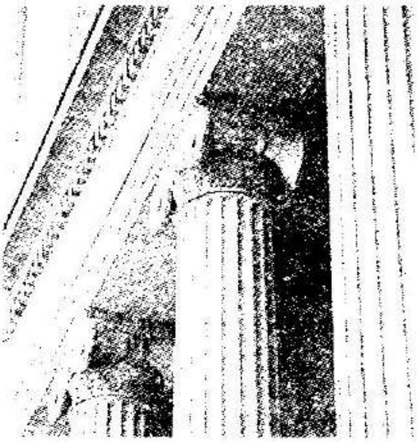

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতির মাধ্যমে ছাদের ভার বহন করার জন্য দেয়ালের পরিবর্তে থাম ও বীম (column and beam) ব্যবহার করা হয়। এরূপ ব্যবস্থাকে অনেকে পোস্ট এন্ড লিন্টেল (post and lintel) বা খুঁটি ও সর্দল পদ্ধতি বলে। তবে দেয়ালের অনুরূপ কার্যের জন্য দুই থামের মধ্যবর্তী স্থানে ইট, কাঠ, টিন, কাচ, ইত্যাদির প্রাচীর বা স্ক্রীন (screen) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

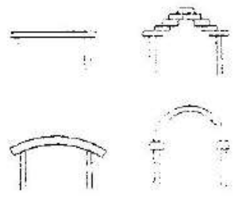

ভবন নির্মাণের একেবারে প্রথমদিকে ছাদ সমতল হতো। জানালা ও দরজার উপরে দেয়ালের ভার বহন করার জন্য কড়ি (lintel) ব্যবহৃত হতো। এই পদ্ধতিতে পুরাতন গ্রিসদেশীয় সভ্যতা সর্বোচ্চ পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী যুগে কড়ির বদলে খিলান বা আর্চ (arch) আসে। সামান্য একটু বাঁক থেকে শুরু করে খিলান বা আর্চ আস্তে আস্তে অর্ধবৃত্তের আকার ধারণ করে। তবে রোমানেস্ক (Romanesque) কালের অর্ধবৃত্তাকার খিলান গথিক (Gothic) আমলে এসে সুচালো হয়ে যায়।

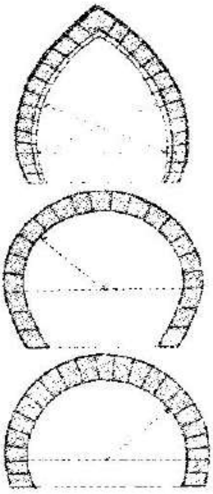

যদিও বা ভিত্তির উপর নির্ভর করবে কত তলা, তবে সমতল ছাদের উপরই শুধু অন্য একটি তলা নির্মাণ করা যায়, ঢালু ছাদের উপর যা সম্ভব নয়। কত তলা ভবন, শহরে বা গ্রামে, তার উপর নির্ভর করবে ছাদের নির্মাণ সামগ্রী ও কৌশল। বহুতল ভবনের ছাদ কংক্রিট দিয়ে তৈরি হয়। বাংলাদেশেও কাঠের ছাদ বিশিষ্ট দোতলা বাড়ি আছে। একতলা বাড়ির ছাদ টিন, শন, গোলপাতা ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করা হয়। ভবনের অভ্যন্তরে ছাদের শোভা বৃদ্ধি এবং শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নয়নাভিরাম সামগ্রী দিয়ে ড্রপ / ফলস সিলিং বা নিচু ছাদ তৈরি করা হয়।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ

৫২. কাঠ, লোহা ও দুটিতর কংক্রিট বিস্তার

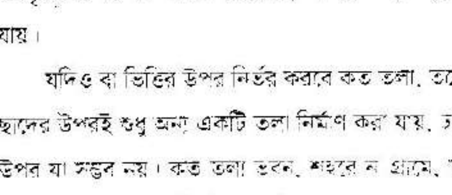

বর্তমানে দালানের বাইরের দিকে বিরাট জানালা দেখা যায়, তেমনটি কিন্তু সম্ভব ছিল না। নতুন নির্মাণ সামগ্রী দালানের অভ্যন্তরে প্রশস্ত খোলা স্থান রাখা সহজ হয়ে পড়ে।

কাঠ দিয়ে নির্মাণে বড়জোর রাখা যেতো। লোহার ব্যবহারের মাধ্যমে

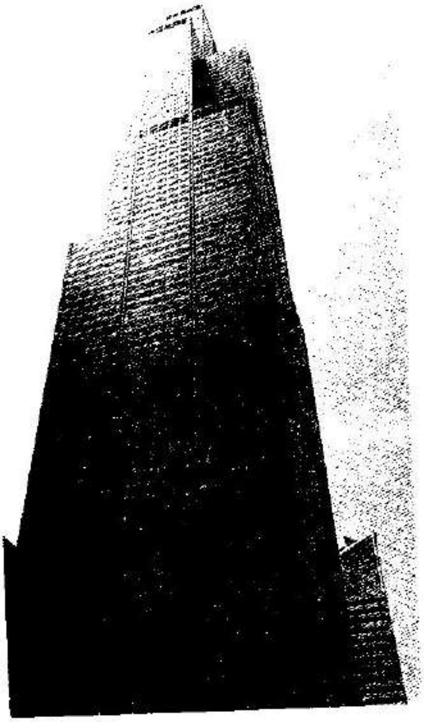

[illegible]

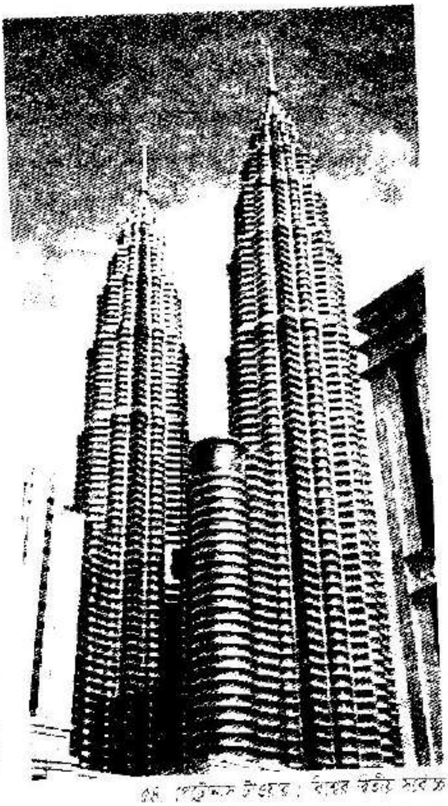

৩৪. পেট্রোনাস টাওয়ার : বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ

[illegible] বৃদ্ধি করা গেল। আবার লোহাযুক্ত কংক্রিটের (R.C.C.) সাহায্যে দুই থামের দূরত্ব তথা খোলা [illegible] আরো বাড়ানো সম্ভব হলো। মজার ব্যাপার হলো ইতিহাসে যখনই মানুষের চাহিদা মোতাবেক, [illegible] অভ্যন্তরে এবং বাইরের দিকে বিস্তৃত স্থানের প্রয়োজন হয়েছে, ঠিক তখনই নতুন সামগ্রী এবং প্রযুক্তির [illegible] করা সম্ভব হয়েছে।

[illegible] সর্বপ্রথম সফল লোহার সেতু বিলেতের সেভার্ন (Severn) নদীর উপর কোলব্রুকডেইল শহরে [illegible] অবস্থিত। সেতুর খ্যাতির কারণে স্থানের নামকরণ করা হয়েছে আয়রন ব্রীজ (Iron [illegible] লোহার সেতু। কাঠ মিস্ত্রির প্রযুক্তিকৌশল দিয়ে ১৭৭৯ সালে নির্মিত এই সেতুর প্রস্থ মাত্র ১০০ [illegible] বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলানো বা সাসপেন্সন (suspension) সেতু ১৯৮০ সালে নির্মিত বিলেতের [illegible] (Humber Bridge) যার মধ্যবর্তী দুই থামের মাঝে দূরত্ব হল ৪৬২৮ ফুট।

[illegible] থেকে হাজার হাজার বছর আগের গুহা বা এক তলা ঘর থেকে যার শুরু সেই বসবাসস্থান আজ [illegible] ১৪৫৪ ফুট উঁচু; যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো (Chicago) শহরে অবস্থিত ১৯৭৩ সালে সমাপ্ত সিয়ার্স [illegible] (Sears Tower) নামে তা শোভা পাচ্ছে। ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত কুয়ালালামপুরের পেট্রোনাস টাওয়ার [illegible] ১৪৮২.৬ ফুট উচ্চতায় বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তবে চীনের চংকিং (Chongqing) শহরে

৩৩. লুইসিয়ানার সুপারডোম

[illegible]বিং টাওয়ার (১৯৯৭ সালে [illegible] মাত্র এক তলা টপকিয়ে অবে [illegible] এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন।

ভবনের ভিতরে মিশরীয় [illegible] থেকে অন্যটির দূরত্ব সাত [illegible] সাহস করত। সেখানে [illegible] খোলা জায়গা যুক্তরাষ্ট্রের একটি [illegible] লুইসিয়ানার সুপারডোম (Superdome)। ছাদের ব্যাস ৬৮০ ফুট। তবে দীর্ঘতম খোলা অভ্যন্তরীণ স্থান হচ্ছে [illegible] টেক্সাস স্টেডিয়ামের লম্বা দিক, যার মাপ হলো ৭৮৭ ফুট। নাহাস খলিল [illegible] ১৯৯৩ সালে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম ইনডোর (Indoor) স্টেডিয়ামের মেঝের প্রস্থ ১০০ [illegible] ছাদের প্রস্থ ১১০ ফুট; বাকি স্থান চতুর্দিকে ঢালু।

নদীর কূলে [illegible]

বর্তমান মানুষের যে রূপ, নৃতাত্ত্বিকগণ মনে করেন এই আকৃতির মানব [illegible] পৃথিবীতে বিচরণ করছে। ইতিহাসের শুরুতে মানুষ বড় বড় নদীর কূলে বসতি [illegible] টাইগ্রিস (Tigris) ও ইউফ্রেটিস (Euphrates) নদীর ব-দ্বীপে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, [illegible] কূলে মিশরীয় সভ্যতা, রাভি নদীর পাশে হরাপ্পা এবং সিন্ধু নদীর কিনারে [illegible] (সম্মিলিতভাবে সিন্ধু উপত্যকা বা ইন্ডাস ভ্যালি [illegible] সভ্যতা), [illegible] ইয়াংজি নদী (Yangtze) ঘিরে চীনা সভ্যতা ইত্যাদি। [illegible] বর্তমান ভারত-উপমহাদেশের বড় বড় শহর সহ অসংখ্য জনবসতি গড়ে উঠেছে [illegible] ঢাকা মহানগর বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

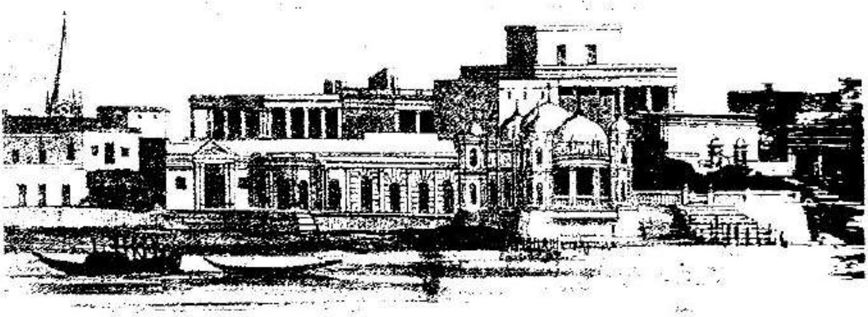

৩৪. বুড়িগঙ্গা নদীর [illegible]

তবে সভ্যতার সূচনার আগেও মানুষ সেই নদীর তীরেই বসতি স্থাপন করেছিল।

ডেড্ সী'র (Dead Sea) পাঁচ মাইল উত্তরে জর্দানে প্রায় এক শত বছর খনন করার পর, ১৯৫২-৫৮ সালে বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ কেইথলীন কেনিয়ন (Kaithleen Kenyon) একটি প্রাচীন দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান। কার্বন-১৪ (Carbon-14) সময় নির্ণায়ক পদ্ধতি দ্বারা জানা যায় যে দেয়ালটি খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ সালে তৈরি করা হয়েছিল।

ত্রিশ বিঘা এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই মরুদ্যানের নাম জেরিকো (Jericho) --- প্রত্নতাত্ত্বিকদের জানা মতে পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর। দুই থেকে তিন হাজার লোকের বসবাস ছিল এই জেরিকো শহরে। এই শহরের বাসস্থান তৈরি করা হয়েছিল মাটির ইট দিয়ে। আয়তক্ষেত্রাকার ঘরগুলি একে অপরের কাছাকাছি বসানো হতো। জানালাবিহীন প্রতি ঘরে একটি করে দরজা ছিল। জেরিকোতে সরকারি ভবনও ছিল।

জেরিকোর পর, ১৯৬১ সালে আর এক বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ জেমস্ ম্যলার্ট (James Malaart) তুরস্কের কোনিয় শহরের পূর্ব-দক্ষিণে কার্সাম্বা (Carsamba) নদীর নিকট আবিষ্কার করেন আর একটি প্রাচীন শহর। নাম তার চাটাল হুইয়ুক (Çatal Hüyük)। খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৫০ সাল থেকে ৫৪০০ পর্যন্ত এই শহর মানুষের কোলাহলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ধর্মীয় এবং শৈল্পিক কর্মকাণ্ডে ছিল মুখর। তামা এবং অন্যান্য ধাতুর শিল্পকর্মের নমুনা এখানে পাওয়া গেছে। জনসংখ্যা ছিল ছয় থেকে দশ হাজার। কিছু ভবন যে সরকারি কাজে ব্যবহৃত হতো তাও নিশ্চিত করে বলা যায়।

চাটাল হুইয়ুকে মহিলাদের খুব সম্মান করা হতো। এখানকার অধিবাসীরা প্রায়ই ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া (pneumonia) এবং গেঁটেবাত রোগে আক্রান্ত হতো। চাটাল হুইয়ুকে অবস্থিত নানা আকারের ঘর-বাড়ি এবং সমাধি অভ্যন্তরে উপহার, ইত্যাদি দেখে অনুমান করা যায় যে ঐ সমাজে বিভিন্ন পেশার স্তরের মানুষ ছিল।

চাটাল হুইয়ুকের বাড়িগুলি একটার গায়ে আরেকটা সাজানো থাকত; ছাদ দিয়েই ঘরে প্রবেশ করতে হতো এবং সেটাই ছিল একমাত্র পথ। আয়তক্ষেত্রাকার ইট এবং মরটার(mortar) বা মশলা ব্যবহার হতো। প্রায় বাড়িতে ছিল দুটি কক্ষ, যার মধ্যে প্রধান কক্ষটির আয়তন ছিল প্রায় ১৩ ফুট X ২০ ফুট। ছোট ঘরটি শস্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ড্যানুব (Danube) নদীর তীরে যুগোস্লাভিয়ায় এক উপত্যকায় ১৮৫ গজ X ৫৫ গজ এলাকা জুড়ে অতি প্রাচীন ছোট্ট একটি জনপদের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত লেপেন্সকি ভির (Lepenski Vir) নামক এই জনপদের অবশ্য কোনো হদিস নেই। কারণ জনপদটি এখন নদীর পানিতে, লেকের তলায় তলিয়ে গেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ সালে লেপেন্সকি ভির-এর জনসংখ্যা ছিল খুব বেশি হলে দুই থেকে তিন শত। অনুমান করা হয় এখানকার বাড়িগুলি দেখতে তাঁবুর মতো; একটা হতে অন্যটা খানিকটা দূরে বসানো হতো। জেরিকো এবং চাটাল হুইয়ুকে বেশ কয়েকটি সরকারি ভবন দেখা গেলেও লেপেন্সকি ভির-এ শুধু

চারটি মন্দির জাতীয় ভবন দেখা যায়।

লেপেন্সকি ভির-এ সমাজ ব্যবস্থা ছিল এবং মানুষজন অতীতকালের রীতি-নীতি কঠোরভাবে পালন করত।

জেরিকো, চাটাল হুইয়ুক এবং লেপেন্সকি ভির প্রাচীন শহরগুলির সন্ধান পাওয়ার পর ইতিহাস আরো জটিল হয়ে পড়েছে। কারণ এই শহরগুলির পর এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সালের মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয় (Sumeria) সভ্যতার আগে পর্যন্ত এক বিরাট শূন্যতা বিরাজমান।

মেসোপোটেমীয় সভ্যতা

মধ্য এশিয়ার মেসোপোটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) টাইগ্রিস (Tigris) ও ইউফ্রেটিস (Euphrates) নদীর ব-দ্বীপে বহু প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায়। সেখানকার স্থাপত্য আক্কাদিয়ান (Akkadian) স্থাপত্য নামে পরিচিত।

মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে জিগ্‌গুরাত (ziggurat) নামক মন্দির ছিল। এগুলি দেখতে পিরামিডের মতোই তবে ধাপে ধাপে উপরের দিকে ক্রমশ ছোট হতে থাকে। মিশরদেশীয় সভ্যতার স্টেপ-পিরামিডের (step pyramid) সাথে মিল রয়েছে। সিঁড়ির দুই পাশে বেড়া থাকায় মন্দিরের প্রবেশ-পথ নির্দিষ্ট ছিল। জিগ্‌গুরাতের অধিক পরিচিত দৃষ্টান্তগুলো উর্ (Ur) এবং ব্যাবিলনে (Babylon) অবস্থিত। চোগা জান্‌বিলের (Choga Zanbil) জিগ্‌গুরাত (খ্রিষ্টপূর্ব ১২৫০) সবচেয়ে বড়। মন্দির এবং পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি মর্যাদা দেখাবার লক্ষ্যে ভবনগুলো উঁচু মঞ্চের উপর স্থাপন করা হতো।

৫৭. মিশরের উর শহরে জিগ্‌গুরাত

মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয় (Sumeria) সভ্যতা

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সাল হতে মেসোপোটেমিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে সুমেরীয় (Sumeria) সভ্যতা গড়ে ওঠে। মাটির সাথে গাছগাছালি মিশিয়ে এবং পোড়ামাটির ইট দিয়ে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করত। মন্দিরের গায়ে রঙিন পোড়ামাটির ইট দিয়ে অলঙ্করণ করা হতো; যেমনটি দেখা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের ওয়ার্কা (Warka) জিগ্‌গুরাতে। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সাল নাগাদ অলঙ্করণ শুধুমাত্র ভবনকে সাজাবার উদ্দেশ্যে নয়, বরঞ্চ কাঠামোকে নির্দিষ্ট করার জন্যও ব্যবহার করা হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ সাল নাগাদ দক্ষিণাঞ্চলে, তথা ব্যাবিলনে, ছাঁচে ঢালা ইট এবং কাঁচা আস্তরে রং করা প্রাচীরচিত্র বা ফ্রেস্কো (fresco) সর্বত্র ব্যবহার করা হতো।

৫৮. সুমেরের শহর

৫৯. চালদিয়ানদের জিগ্‌গুরাত

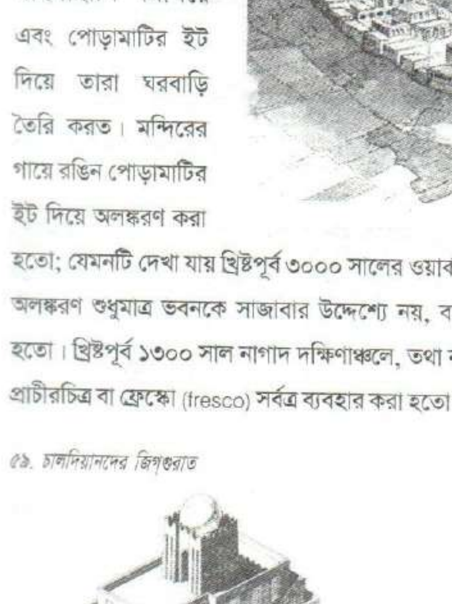

কোনো ভবনেরই ছাদ পরবর্তীকালে আর পাওয়া যায়নি; তবে দেয়ালে অঙ্কিত খোদাই করা চিত্র দেখে অনুমান করা হয় যে ছাদ সমতল ছিল। কাঠের থাম সমতল ছাদের ভার বহন করত। পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে কাঠ আমদানি করা হতো। থামের নিচের এবং উপরের অংশ খোদিত পাথর দ্বারা সজ্জিত হয়ে ভবনের শ্রী বৃদ্ধি করত। চিত্র পরখ করে আরো বোঝা যায় যে এলাকাবাসীদের গম্বুজ, ধনুকাকৃতির ছাদ বা ভল্ট (vault) এবং খিলান সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। অর্ধবৃত্তাকার খিলান ব্যবহারের অনেক নমুনাই সুস্পষ্ট। সুমেরীয়রা গজাল এবং আয়তক্ষেত্রাকার চিহ্ন দিয়ে লিখত। এই লেখার ইংরেজি নাম কিউনিফর্ম (cuneiform)।

মেসোপোটেমিয়ায় অ্যাসিরীয় (Assyrian) সভ্যতা

০. খোরশাবাদ এর শহর তোরণ

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালের দিকে সুমেরীয়দের স্থাপত্য বিষয়ক ধ্যান-ধারণা হতে উত্তর মেসোপোটেমিয়ায় অ্যাসিরীয় (Assyrian) সভ্যতা শিক্ষা লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০-৭০০ সালে অ্যাসিরীয় সভ্যতা গুরুত্ব পায়। অন্যতম প্রধান শহর ছিল নিনেভাহ্ (Nineveh) ও নিমরুদ (Nimrud), কিন্তু আজ তার ধ্বংসাবশেষ থেকে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। তবে কারিগরি দক্ষতায় তারা সুমেরীয়দের টপকাতে পারেনি। পাথরের এলাকায় জিপ্‌সাম (gypsum) এবং চুনাপাথর দিয়ে নির্মাণ করা হতো বিশালাকার রাজকীয় প্রাসাদ। উজ্জ্বল রং এবং জীবজন্তুর ভাস্কর্য ছিল অ্যাসিরীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। রাজ-প্রশাসনের দাপটে ধর্মীয় দালানের গুরুত্ব ঐ সময় বেশ কিছুটা হ্রাস পায়।

অ্যাসিরীয়দের পরিকল্পিত পূর্ণাঙ্গ রাজকীয় শহর ছিল খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর খোরশাবাদ (Khorshabad)। উঁচু বেদীর উপর সারগনের (Sargon) রাজপ্রাসাদ, এবং ভাস্কর্য সম্বলিত প্রধান ফটকের বৈশিষ্ট্য ছিল মাটির ইট, পুরু দেয়াল, ছাদের কিনারায় নিচু প্রাচীর, একই প্রতীকের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি। ইট সর্বত্র ব্যবহার হলেও প্রযুক্তিগত নির্মাণকাজে পাথর ব্যবহার হতো। মন্দিরের মর্যাদা প্রাসাদের তুলনায় ছিল সামান্য।

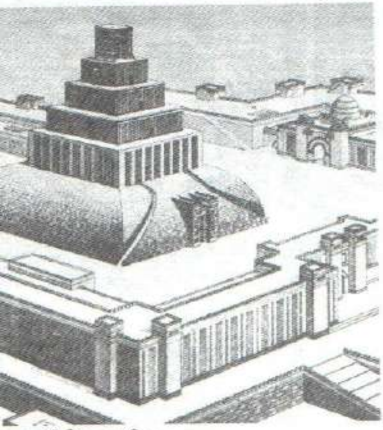

১. অ্যাসিরীয়দের মন্দির

৬২. সারগনের আমলে অ্যাসিরীয়দের ভবন

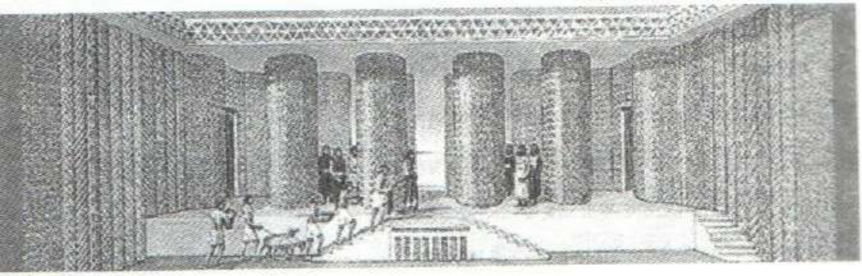

নেবুচাদনেজারের ব্যাবিলন (Babylon)

ইউফ্রেটিস (Euphrates) নদীর তীরে রাজা নেবুচাদনেজারের (Nebuchadnezar) অধীনে ব্যাবিলনে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন নির্মাণ কাজের পুনরুজ্জীবন ঘটে তখন দুই শত বছর আগের খোরশাবাদ শহরই ছিল মূল প্রেরণা। ব্যাবিলনে প্রাচীন মন্দিরগুলো মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করা হয়। প্রশস্ত রাস্তাসমূহ সমকোণে পরস্পরকে ছেদ করত। প্রধান সড়কগুলো শহরের প্রাচীরে অবস্থিত ফটকে শেষ হতো। কিছু সড়ক নেমে যেত নদীর কিনারা পর্যন্ত।

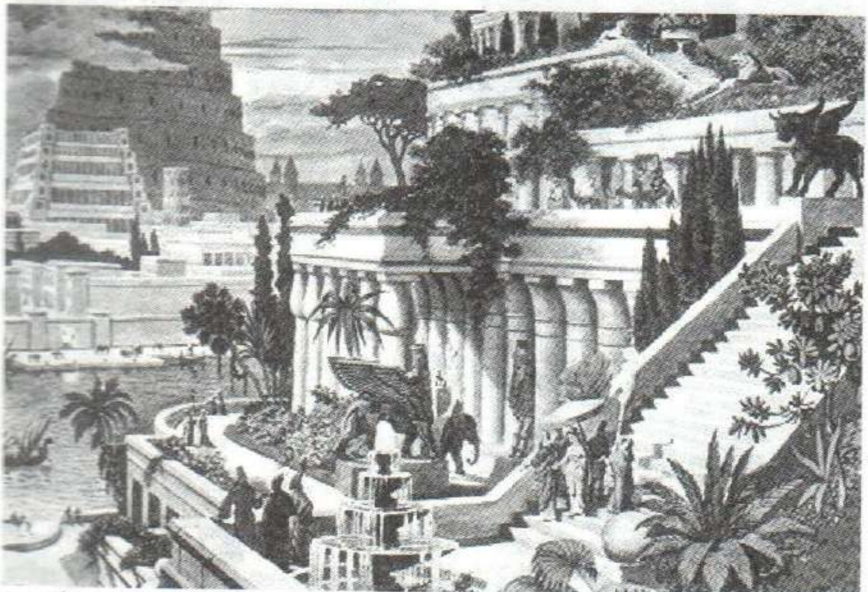

৬৩. ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

নেবুচাদনেজারের ব্যাবিলনে সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদের চারিদিকে ছিল মনোহর বাগান। উঁচু প্রাচীর এবং বিভিন্ন স্তরের ছাদেও অসংখ্য গাছপালা ছিল। এরই ইংরেজি নাম, স্বীকৃত সপ্তম আশ্চর্যের একটি, দি হ্যাঙ্গিং গার্ডেনস্ অব্ ব্যাবিলন (The Hanging Gardens of Babylon) বাংলায় যাকে আমরা বলি ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান।

৬৪. ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ

ব্যাবিলনে পাথর ব্যবহার হতো না। দেয়ালের বহিরাংশ উজ্জ্বল রং-এ প্রলেপিত চকচকে ইট দিয়ে মোড়ানো হতো। দেয়ালে খোদাই করা থাকত বিভিন্ন নক্শা, জীবজন্তু এবং পল্লবগুচ্ছ। উঁচু-নিচু খোদাই করা এই দেয়ালের গায়ে সূর্য-কিরণ অবিশ্বাস্য সুন্দর আলোছায়ার খেলা সৃষ্টি করত।

পরবর্তীকালে ইতিহাসের আর এক চমকপ্রদ যুগের সাক্ষী এই ইউফ্রেটিস নদী। পারস্যের যাযাবররা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ব্যাবিলন জয় করার পর হতে স্থাপত্যে তাদের পারদর্শিতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। পারস্য স্থাপত্যে পূর্ববর্তী অ্যাসিরীয়দের প্রভাব প্রতিফলিত হয়; বিশেষত থামের উপরিভাগে জীবজন্তুর ভাস্কর্যের ব্যবহারে তা স্পষ্ট।

পারস্য রাজবংশ খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সালে সম্রাট সাইরাস (Cyrus) দ্বারা স্থাপিত হয়। সিরাজ নামক স্থানের

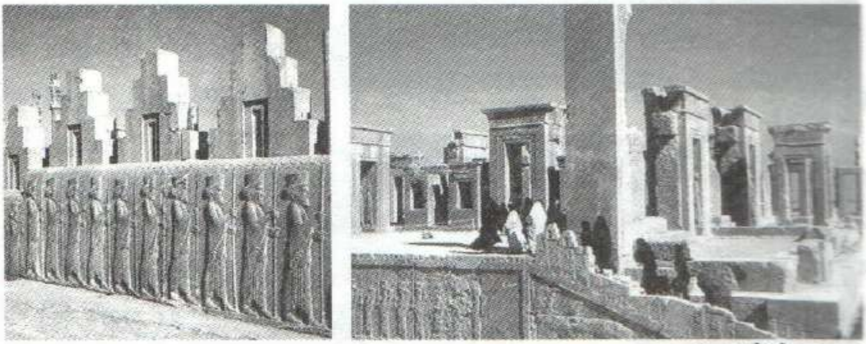

৬৫. পার্সিপলিসের প্রাসাদ

নিকটে পার্সিপলিসে (Persepolis) পারসিকরা রাজধানী স্থাপন করে। সাইরাসের পূর্বসূরি প্রথম দারায়ুস (DariusI) খ্রিষ্টপূর্ব ৫১৮ সালে পার্সিপলিসে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ শুরু করলেও পরবর্তীকালে জেরজেস (Xerxes) ও আর্টাজেরজেসের (Artaxerxes) আমলে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০ সালে, এই বিশাল কাজ সম্পন্ন হয়।

রাজপ্রাসাদের এলাকা লম্বায় ছিল ১২০০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ৯০০ ফুট। এখানেও ছিল দেয়ালে খোদাই করা চিত্র, রং-এর ছড়াছড়ি এবং জাঁকজমকপূর্ণ প্রবেশপথ। পাথরের কারুকার্য খচিত পাথর ও কাঠের থাম, পাতলা আস্তরের চিত্রাঙ্কন, থামের উপরিভাগে মিশর এবং গ্রিক সভ্যতার প্রভাব, অলঙ্কৃত সিঁড়ি, দেয়ালে খোদাইকৃত ভাস্কর্যের যথেচ্ছ প্রয়োগ, উন্নত বাগান ইত্যাদি পারস্য স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এক কথায়, স্থাপত্যের সাজসজ্জা ছিল বিস্ময়কর।

৬৬. পার্সিপলিসের প্রাসাদে একশত থামের হলঘর

রাজপ্রাসাদেই আছে বিশ্বনন্দিত শত থামের হলঘর বা আপাদানা (Apadana); ইংরেজিতে হল অব্ এ হান্ড্রেড কলাম্‌স্ (Hall of a hundred columns) । এখানে পাথরের খাঁজ-কাটা থাম, ভারত থেকে আমদানিকৃত সেগুন কাঠের কড়ি এবং সিডার (Cyder) কাঠের তৈরি ছাদের মাঝে রয়েছে রাজসিংহাসন। আরো আছে ছত্রিশ থামবিশিষ্ট দারায়ুসের

৬৭ পার্সিপলিসে রাজকীয় সভাকক্ষ

৬৮ ময়দান-ই-আব্বাস, ইস্ফাহান

রাজকীয় দর্শনার্থী প্রাসাদ বা রয়েল অডিয়েন্স হল (Royal Audience Hall)। প্রতিটি থাম উচ্চতায় ৪০ ফুট; পাথরের ষাঁড় ও সিংহের স্তম্ভশীর্ষ বা ক্যাপিটালের (capital) উপর ছিল কাঠের ছাদ।

পূর্ববর্তী মেসোপোটেমিয়া সভ্যতায় ছোট ছোট ঘর স্থান পেতো; কিন্তু পারস্যের পরিকল্পনায় সব কিছুর মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব লক্ষণীয়।

হযরত ওমর (রঃ) ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যে (বর্তমান ইরান) অভিযান পরিচালনা করেন। তবে তারো প্রায় এক হাজার বছর পর ইরানে ইসলামি স্থাপত্যের সূচনা। আধুনিক এই ধারা সম্রাট শাহ আব্বাসের কাছে ঋণী। মধ্য ১৬শ শতাব্দীতে তেহরানের দক্ষিণে

৬৯ শাহ্ মাদ্রাসায় চকচকে টালি, ইস্ফাহান

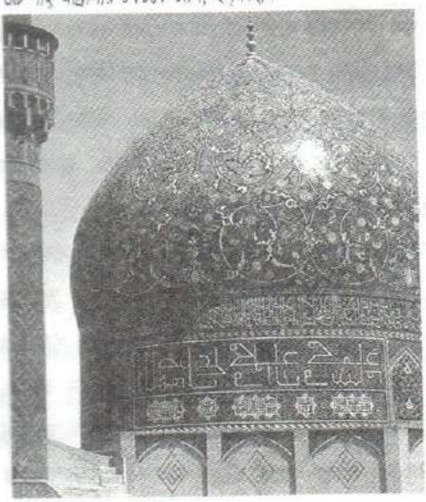

৭০ রাজকীয় মসজিদের আইওয়ান, ইস্ফাহান

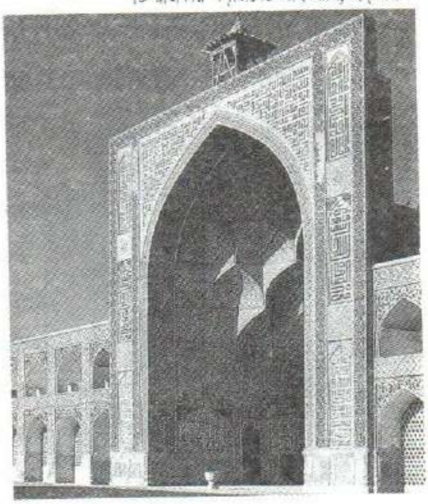

ইস্‌ফাহানে (Isfahan) তিনি স্থাপন করেন সাফাভিদ (Savavid) রাজবংশের সমুজ্জ্বল রাজধানী।

মস্কোর রেড স্কোয়্যারের (Red Square) দ্বিগুণ এক বিশাল ময়দানকে শাহ আব্বাস শহরের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিকল্পনা করেন। পোলো (Polo) খেলার জন্য এই ময়দান-ই-শাহ্‌র (Maidan-i-Shah) এক প্রান্তে শাহী মসজিদ (১৬১২-১৩), অপর প্রান্তে বাজার ; একদিকে চিহিল সুতুন (Chihil Sutun) রাজপ্রাসাদ (১৫৯৮), চতুর্দিকে খিলান সমৃদ্ধ মনোহর দেয়াল। নীল রং-এর সিরামিক (ceramic) টালি, উজ্জ্বল গম্বুজ এবং লম্বা ও সরু মিনার ইসফাহানকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর রাজধানী হিসেবে পরিচিত করেছিল। প্রাচুর্যের বাহার, অলঙ্করণ, গম্বুজ এবং দেয়ালে মনমাতানো টালির কাজ ইত্যাদি সেকালের বিলাসিতা ও আনন্দমুখর সময়কে ধরে রেখেছে।

সিন্ধু বা ইন্দাস (Indus) *উপত্যকা সভ্যতা*

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালে রাভি নদীর তীরে (বর্তমানে পাকিস্তানের সাহিওয়াল জেলায়) অবস্থিত ছিল হরপ্পা (Harappa) শহর। হরপ্পার নিকটে সিন্ধু (Indus) নদীর তীরে বর্তমান লারকানা জেলায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০-১৫০০ সালে বিশাল এলাকা জুড়ে এক উপত্যকার রাজধানী ছিল মোহেনজোদারো (Mohenjodaro)। উক্ত এলাকায় খনন করে পোড়া মাটির বড় বড় ইটের বাড়ি, পানি সরবরাহ ও ময়লা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা, সুপরিকল্পিত সোজা রাস্তা এবং বিভিন্ন ধরনের ভবনের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরবর্তী সময়ে ভারত-উপমহাদেশে যে স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, বিশেষ করে দেয়ালের অভিজাত কারুকার্য, তার লেশমাত্রও ছিল না ঐ সিন্ধু সভ্যতায়। তবে দুটি শহর যে বহুকাল ধরে গড়ে উঠেছে সে ব্যাপারে খননকৃত মাটি দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায়।

৭১ হরপ্পা

৭২ মোহেনজোদারো : শহর পরিকল্পনা

শৈল্পিক গুণাবলির অভাব থাকলেও সিন্ধু উপত্যকার নির্মাণ সামগ্রী এবং

BANSDOC Library * Dhaka *

কৌশল বিংশ শতাব্দীতেও বিস্ময়কর মনে হয়। ঘরবাড়ির দেয়ালগুলো নিচের দিকে চওড়া এবং উপরে সরু ছিল। কাঠের তৈরি সমান্তরাল ছাদের উপরিভাগে আবার মাটি পিটিয়ে দেয়া হতো। দেয়ালের ফাঁকা স্থানে কাঠের লম্ব বা লিন্টেলের (lintel) সাহায্যে সাধারণত জানালা তৈরি করা হতো। আবার সিঁড়ির ধাপের মতো খিলান বা করবেল্ড আর্চ (corbelled arch) ব্যবহার করা হতো।

৭৩ মোহেনজোদারোর সিল

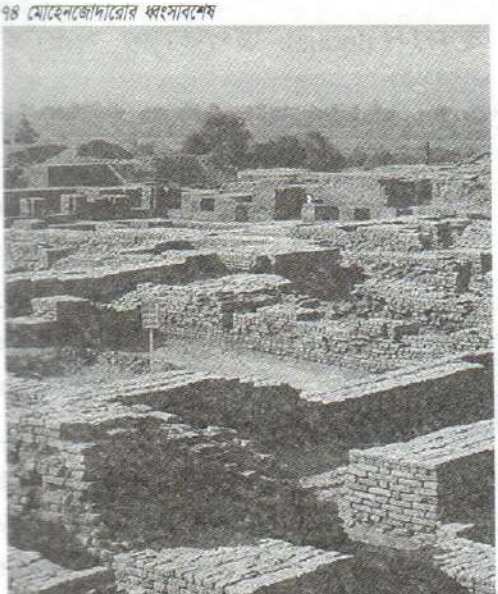

৭৪ মোহেনজোদারোর ধ্বংসাবশেষ

সাদামাটা ঘরবাড়ি দেখে মনে হয় যে এলাকার লোকজন দৈনন্দিন কাজ-কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকত। চারুকলা চর্চা বা সৌন্দর্য বর্ধনের দিকে নজর দেয়ার সময় হয়ত তাদের ছিল না। দেয়ালের গায়ে রং বা কাঠের কারুকাজ হয়ত বা ছিল, তবে এত হাজার বছর পর তার কোনো নমুনা এখন আর নেই।

সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। হঠাৎ করেই যেন একটি সভ্যতা শেষ হয়ে গেল। তাই হয়ত বা একটি শহরের নামকরণ করা হয়েছে মোহেনজোদারো; অর্থাৎ মৃতের শহর। হরপ্পা এবং মোহেনজোদারোর অনেক বিষয়ই অজানা ও রহস্যময় রয়ে গেছে।

মিশরীয় সভ্যতা

আধুনিক কালের স্থাপত্য রীতি যে সকল আদি সভ্যতার কাছে ঋণী তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে মিশরীয় সভ্যতা। তবে গুরুত্ব, ব্যাপকতা এবং প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের সংস্কৃতি, শিল্প, স্থাপত্য এবং সভ্যতা সমগ্র বিশ্বে ক্ল্যাসিকাল (classical) হিসেবে পরিচিত।

৭৫ নাইল নদীর তীরে বসবাস

মিশরে ৫৭৬ মাইল (৯৬০ কিঃমিঃ) লম্বা নীল (ইংরেজিতে Nile, নাইল) নদের দুই পার্শ্বে দশ হাজার বছর ধরে মানুষ বসবাস করে আসছে। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের আগমন পর্যন্ত মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল গণ্য করা হয়। প্রথম হাজার বছরেই মিশর-সভ্যতার সর্বাধিক উন্নতি হয়।

প্রাচীন মিশরে রাজাদের বলা হতো ফেরো বা ফারাও (Pharaoh)। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন তাঁরা। তখনকার মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পরে ফারাওরা অন্য জীবন হিসেবে বেঁচে থাকত এবং পরে দেবত্ব নিয়ে আবার ফিরে আসত। সেজন্য মৃত ফেরোদের দেহ সংরক্ষণ করার জন্য মিশরদেশীয়রা নির্মাণ করত পাথরের বিশালাকার স্মৃতিস্তম্ভ; পিরামিড (pyramid) যাদের মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত।

ফারাওদের স্মৃতিস্তম্ভ

দেহ সংরক্ষণের জন্য মিশরীয় ব্যবস্থা প্রথমদিকে দেখতে মুসলমানদের কবরের মতো ছিল। এর নাম ছিল মাস্তাবা (mastaba)। পরবর্তীকালে, সিঁড়ির মতো দেখতে একটা বড় মাস্তাবার উপর আর একটি ছোট মাস্তাবা বসিয়ে স্টেপ পিরামিড (step pyramid) তৈরি করা হয়। এখান থেকেই চতুষ্কোণ ভিত্তির পিরামিড তার পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে। রাজা-বাদশাহ্দের জন্য পিরামিড নির্মাণ করা হলেও তাঁদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার ভাগ্যে জুটত মাস্তাবা।

৭৬ মাস্তাবা থেকে পিরামিড

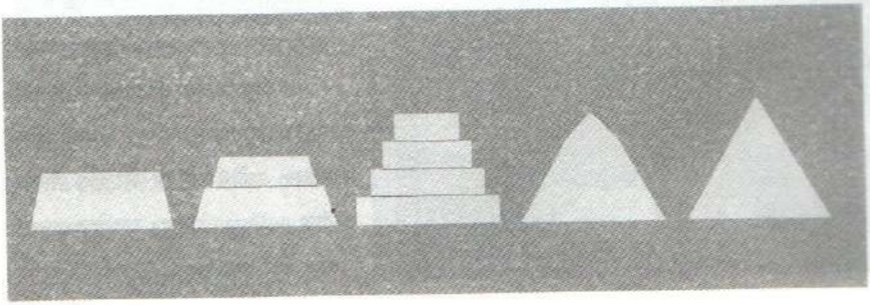

৭৭ গিজেহ্ পিরামিড

গিজেহ্ (Gizeh) নামক স্থানে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৬০০-২৫০০ সালে তৈরি চিঅপস্ (Cheops) এর গ্রেট পিরামিড (Great Pyramid) পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ পিরামিড। সপ্তম আশ্চর্যের একটি গিজেহ্‌র এই পিরামিড ৪৮১ ফুট উঁচু এবং ভিত্তির প্রতিটি বাহু ৭৬৪ ফুট লম্বা। বিশ থেকে ত্রিশ বছর ধরে এক লক্ষ শ্রমিক, দুই থেকে আড়াই টন (ton) ওজনের প্রায় ২৩,০০,০০০ পাথরের টুকরা বা ব্লক (block) নিখুঁতভাবে স্তরের পর স্তর সাজিয়ে এই চোখধাঁধানো পিরামিড তৈরি করে। পিরামিডের বাইরে ছিল পালিশ করা আবরণ। প্রবেশপথ ছিল গুপ্ত; ভিতরের একটি ঘরে রাখা হতো রাজার মরদেহ এবং তার ধনদৌলত।

মিশরের মন্দির

প্রাচীন মিশরে বিশালাকার মন্দিরও নির্মিত হয়। থিবিসের (Thebes) নিকট দের-আল-বাহ্‌রি (Dayr -al-Bahri) তে ফেরো হাটসেপসুট (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫২০-১৪৮৩) খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৭৮ সালে তিন তলা থাম বিশিষ্ট পাহাড় কেটে এক বিশাল মন্দির তৈরি করেন। তবে এইসব মন্দিরে শুধুমাত্র রাজা এবং প্রধান পুরোহিতেরা ধর্মীয় রীতি পালন করার সুযোগ পেতো। শত শত বছর ধরে একই মন্দিরে নির্মাণ কাজ চলেছে। আকার অবিশ্রান্তভাবে বর্ধিত করা হয়েছে; তবে মন্দিরের মূল স্থাপত্য পরিকল্পনা বা বৈশিষ্ট্য কখনো নষ্ট করা হয়নি।

৭৮ হাটসেপসুট এর মন্দির

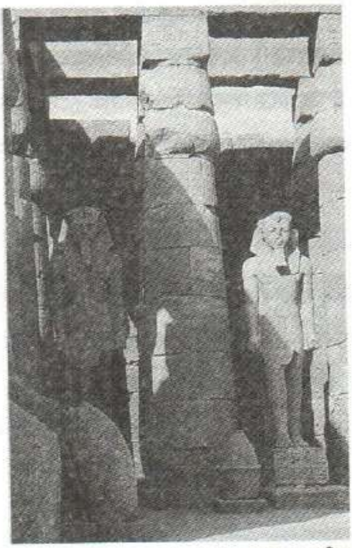

৭৯ এডফুতে হোরুসের মন্দির

আকাশ, আলো ও সদ্‌গুণের দেবতা এডফুতে হোরুসের মন্দির এমনই এক নিদর্শন। প্রাচীন থিবিস শহরের নিকট কার্নাক (Karnak) গ্রামে অবস্থিত সুদৃশ্য বিশাল এক বর্গমাইল

স্থান জুড়ে মন্দিরের বাইরে রাস্তার দুধারে রয়েছে পাথরের তৈরি অর্ধমানব এবং অর্ধজানোয়ারের প্রতিকৃতিতে বিশালাকার ভাস্কর্য, যা স্ফিঙ্ক্স (Sphinx) নামে পরিচিত।

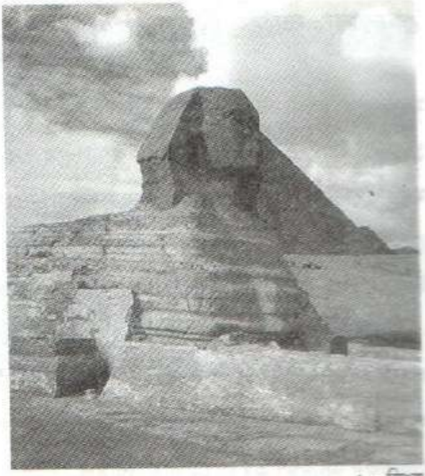

৮০ স্ফিংক্স

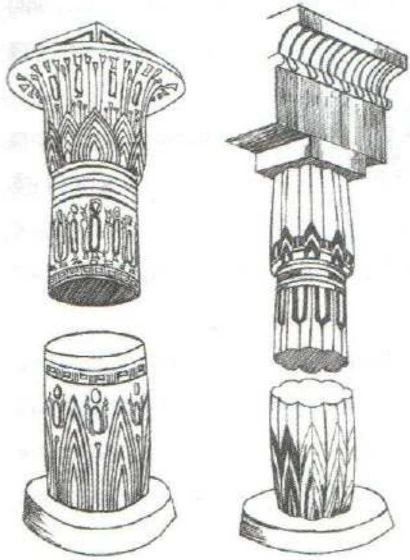

৮১ মিশরীয় থাম

বোঝাই যাচ্ছে মিশরে প্রধানত পাথর দিয়ে নির্মাণ কাজ হতো। মিশরীয়রা পাথর দিয়ে বাইরে দেয়াল তৈরি করলেও ভিতরে থাম এবং কড়ি ব্যবহার করত। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে তারা পাথরের শক্তি সম্বন্ধে খুব একটা অবগত ছিল না। তাই লম্বার তুলনায় মোটা থামগুলো খুবই কাছাকাছি বসাত। বাইরের দেয়ালে রঙিন লেখা, নক্‌শা এবং ছবি খোদাই করা হতো। ভিতরের থামের উপরে স্থান পেতো পদ্মকলির আকার। নীল নদী মিশরের স্থাপত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই নদীর কূল থেকেই পাথর সংগ্রহ করা হতো। নদীর পাশে অবস্থিত তালগাছ, পদ্ম, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি থামগুলিতে দেখা যায়। মিশরীয়রা লিখতেও জানত। বস্তুর ছবি বা প্রতিকৃতি দিয়ে মিশরীয়রা লেখার কাজ করত; যার ইংরেজি নাম হায়রোগ্লীফিক্স (hieroglyphics)।

৮২ লাক্সরে কার্নাকের মন্দির

৮৩ হায়রোগ্লিফক্স

মেসো-আমেরিকার (Meso-America) স্থাপত্য

মধ্য-আমেরিকায় বহু প্রাচীন কাল হতে বিভিন্ন সভ্যতা ছিল। আধুনিক মেক্সিকো (Mexico) এলাকায় খ্রিষ্টপূর্ব ১২,০০০-১০,০০০ সালে মানুষ যে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং চাষাবাদ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মধ্য-আমেরিকায় সময়ের বিবর্তনে যে সকল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে অল্‌মেক (Olmec), মায়া (Maya), য্যাপোটেক (Zapotec), তোতোন্যাক (Totonac), টলটেক (Toltec), ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই এলাকার এযাবৎ সন্ধানপ্রাপ্ত সবচেয়ে পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন হচ্ছে ৩,০০০ বছর আগের অল্‌মেকদের দ্বারা তৈরি লা ভেন্টার (La Venta) পবিত্র শহর। সমগ্র মধ্য-আমেরিকার স্থাপত্যে যে দুই ধরনের নির্মাণ কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে - সেই পিরামিড এবং ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বল খেলার আঙিনার প্রাচীনতম উদাহরণ এই লা ভেন্টায় অবস্থিত। সুদূর খনি হতে ৫০ টন (ton) ওজনের পাথর এনে অলমেকরা তাদের ইমারত তৈরি করেছিল।

এই এলাকার সাধারণ ঘর-বাড়ি হতে ধর্মীয় ভবনের আকার আবির্ভূত হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এলাকার বাসিন্দারা সামান্য উঁচু বেদীর উপর ঘর নির্মাণ করত। বেদীতে ওঠার জন্য থাকত সিঁড়ি। ঘরের দেয়াল তৈরি করা হতো গাছের ডাল দিয়ে; দেয়ালের দুই পাশ মাটি দিয়ে লেপে তার উপরে সাদা চুনকাম করা হতো। চতুর্দিক থাকত বন্ধ, জানালার কোনো বালাই নেই। প্রবেশ করার জন্য থাকত শুধু একটি দরজা।

৮৪ মায়া সভ্যতার শহর

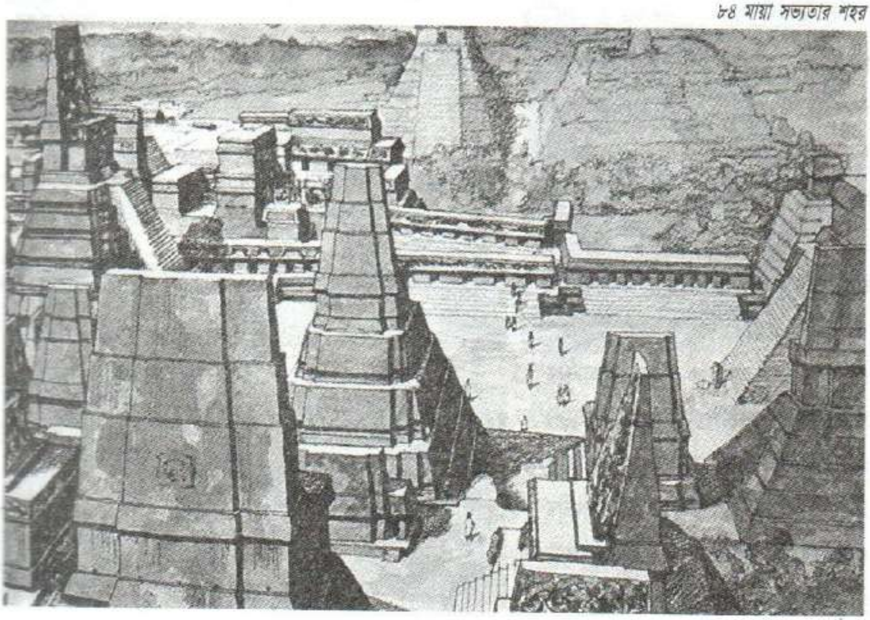

ছোট সেই ঘরের বেদী বড় আকার ধারণ করে হয়েছে বিশালাকার পিরামিড, যার উপর ভাগ ঐ কুঁড়েঘরের বেদীর মতো থাকত সমতল। পিরামিডের উপরটা কতকটা মঞ্চের মতো যেখানে তারা সব ধর্মীয় নিয়ম-রীতি পালন করত। কুঁড়েঘর রূপান্তরিত হয়েছে জানালাবিহীন মন্দিরে; যার ছাদে কাঠের অনুকরণে চিরুনি আকৃতির পাথরের ভাস্কর্য শোভা পেতো।

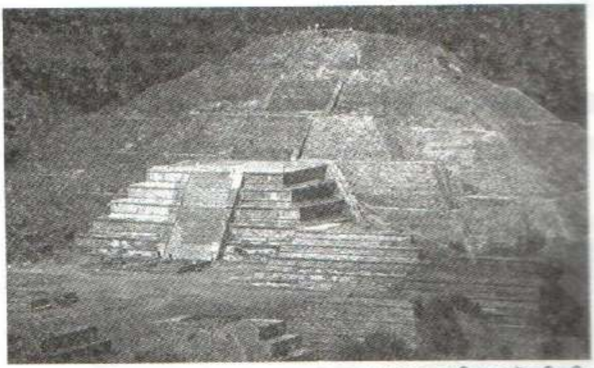

৮৫ মধ্য-আমেরিকার স্টেপ পিরামিড

গোল, সমকোণ এবং আয়তক্ষেত্রাকার পিরামিডগুলো সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উপরের দিকে ছোট হতে থাকত। দেখতে মিশরীয় স্টেপ পিরামিডের (step pyramid) মতো, তবে উপরে ওঠার জন্য থাকত চারপাশে চারটি প্রায় খাড়া সিঁড়ি। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, পাথরের তৈরি পিরামিড আস্তর করে উজ্জ্বল রঙ দিয়ে সাজানো হতো।

পিরামিড ছিল কৃত্রিম পাহাড়ের ন্যায়, যার চূড়ায় থাকত মন্দির; মানুষ সমবেত হবার স্থান ছিল পিরামিডের পাদদেশে। সবচেয়ে পুরাতন পিরামিড কুইলকুইলকোতে (Cuilcuilco) অবস্থিত। চোঙ্গাকৃতির প্রথম শতাব্দীর ঐ পিরামিড চার ধাপে গঠিত। পিরামিডের সর্বনিম্ন বেদীর ব্যাস ছিল প্রায় ৩৫০ ফুট আর উচ্চতা একশত ফুট।

মেক্সিকোর যুকাতান পেনিনসুলা (Yucatán Peninsula) বা উপদ্বীপে মায়ারা ১০০-৯০০ সাল, মতভেদে ৪০০-৯০০ সাল, নির্বিঘ্নে বাস করে। মায়ারা হঠাৎ করেই খুব সম্ভব উত্তর হতে আবির্ভূত হয়। ছয়-সাত শত বছর বসবাস করার পর আবার রহস্যজনকভাবে দশম শতাব্দীতে এসে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। মায়ারা পিরামিড, মন্দির, উপাসনালয়, খেলাধুলার স্থান, প্রাসাদ, ইত্যাদি নির্মাণ করে। প্রাসাদের ঘরগুলো ছিল আলো-বাতাসহীন এবং মানুষ বাস করার জন্য অযোগ্য। এমনও হতে পারে যে ধন-দৌলত ইত্যাদি রাখার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হতো।

চুনাপাথর (limestone) ছিল মায়াদের প্রধান নির্মাণ সামগ্রী; মশলা হিসেবে ছিল চুন আর বালুর মিশ্রণ। পাথরের গুড়া পুড়িয়ে তারা কংক্রিট (concrete) তৈরি করতে জানত। তারা পাথর ধাপে ধাপে সাজিয়ে খিলান বা করবেল্ড আর্চ (corbelled arch) দিয়ে জানালা এবং ছাদের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল।

পাথরে নির্মিত মায়াদের সবচেয়ে পুরাতন মন্দির হচ্ছে দ্বিতীয় শতাব্দীর ভ্যাক্সাক্টুন (Vaxactun)। আর টিকাল (Tikal) হলো মায়াদের বৃহত্তম শহর। এখানে রয়েছে আটটি বিশাল পিরামিড, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পুরোহিতদের জন্য প্রায় ৮০টি বাড়ি।

মায়াদের ভবনের বিভিন্ন স্থানে থাকত বিশাল অথচ নিখুঁত ভাস্কর্য, বিশেষ করে সভ্যতার শেষের দিকে ভাস্কর্যের মান ছিল অসামান্য। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চম-দশম শতাব্দীর চিচেন ইট্‌যা (Chichén Itzá) এবং নবম-দশম শতাব্দীর উক্সমাল (Uxmal) শহরের প্রাসাদসমূহের কথা উল্লেখ করা যায়।

উক্সমাল (Uxmal) শহরে অবস্থিত প্রাসাদ দৈর্ঘ্যে ছিল ৩২২ ফুট, প্রস্থে ৩৯ ফুট এবং উচ্চতায় ২৮ ফুট। ধনুকাকৃতির ছাদ বিশিষ্ট বিশটি ছোট ঘর ছিল এই প্রাসাদে। তবে এখানে দেখার মতো বস্তু হলো চুনাপাথরের ২০,০০০ ব্লক দিয়ে তৈরি খোদাই করা দেয়াল ভাস্কর্য বা ফ্রীয (frieze)।

মেক্সিকো সিটির (Mexico City) পঁচিশ মাইল উত্তরে রয়েছে প্রাচীন পবিত্র শহর টেওটিওয়াক্যান (Teotihuacán) যা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। মায়ারা এবং পরে আযটেকরা এখানকার স্থাপত্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছে। টেওটিওয়াক্যানের পিরামিড অব দ্যা সান (Pyramid of the Sun) সম্ভবত দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোনো বিরতি ছাড়া একবারেই নির্মাণ করা হয়েছিল। পাঁচ ধাপের এই পিরামিড ২০০ ফুট উঁচু এবং মেঝেতে প্রতি পাশ প্রায় ৭৫০ ফুট। এই শহরেই আছে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর পিরামিড অব্ দ্যা মুন (Pyramid of the Moon) যা সানের (Sun) চেয়ে ছোট। সপ্তম শতাব্দীর পর টেওটিওয়াক্যান হঠাৎ করে রহস্যময়-ভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

মায়াদের সময়কালে য্যাপোটেক (Zapotec) নামে ভিন্ন কৃষ্টির একদল মানুষ মন্টে অ্যালবান (Monte Alban)-এ গড়ে তোলে তাদের পবিত্র শহর। সেখানে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সাল হতে ১৪৫০ সাল পর্যন্ত তারা বসবাস করেছে। রুক্ষ, অলঙ্কারবিহীন বেদী ও ভবন, বিশাল সিঁড়ি - এই ছিল তাদের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য।

অষ্টম শতাব্দী ছিল য্যাপোটেক কৃষ্টির চূড়ান্ত পর্যায় এবং বর্তমানে যে সকল ইমারত পাওয়া গেছে তা সবই সেই সময়কার।

য্যাপোটেকদের অনেকগুলো কবরে পাওয়া গয়না, ধাতুর সামগ্রী, পবিত্র পাত্র ইত্যাদি হতে তাদের

৮৬ টেওটিওয়াক্যান

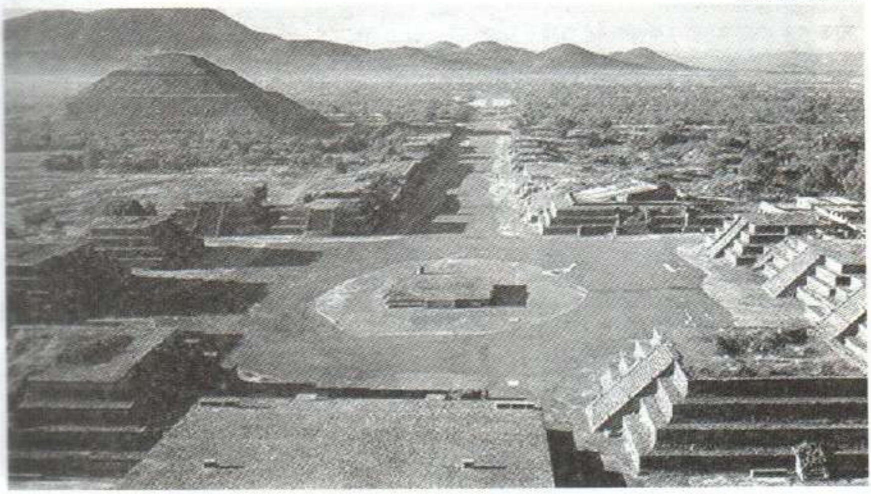

জীবন সম্বন্ধে কিছুটা আভাস মেলে। মন্টে অ্যালবান-এ প্রায় পাঁচ শত ফুট সমকোণ বেদীর উপরে দুইটি পিরামিড রয়েছে; দেয়ালে ছিল ভেজা আস্তরের উপর রঙ করা নকশা বা ফ্রেস্কো (fresco)।

তাহিন (Tajin) শহর ছিল তোতোন্যাক (Totonac) কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল। ভাস্কর্য দিয়ে অলঙ্কৃত বিভিন্ন আকারের অনেকগুলো ভবনের এই শহর ৫ম হতে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকার পর হঠাৎ করে একদিন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ব্যাপারটা এলাকার অন্যান্য বিলুপ্ত সভ্যতার মতো রহস্যে ঘেরা।

৮৭ চিচেন ইট্যা : হাওয়ারিসের মন্দির

৮৮ চিচেন ইট্যা

টলটেকরা (Toltec) ১০ম-১২শ শতাব্দীর দিকে মায়াদের উপর আক্রমণ করে এলাকার কর্তৃত্ব দখল করে। তারা টুলা (Tula) শহর স্থাপন করে। তারা ত্লাউইজকালপান্তেকুতলি (Tlahuizcalpantecuhtli)-র প্রতি উৎসর্গ করে টুলায় হিংস্র ভাস্কর্য সমেত এক বিশাল পিরামিড নির্মাণ করে।

পাথর দিয়ে কাজ করতে টলটেকরা অধিক পারদর্শী ছিল। তারা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে মায়াদের শহর চিচেন ইট্যা (Chichén Itzá) পুনর্নির্মাণ করে। টলটেকদের দ্বারা নির্মিত চিচেন ইট্যার সমাদৃত নিদর্শন হচ্ছে ১২শ শতাব্দীর কাস্টিলোর (Castilo) নয়-ধাপ বিশিষ্ট পিরামিড, জ্যাগুয়ারেস-এর মন্দির (Temple of Jaguares) এবং হাওয়ারিসের মন্দির (Temple of Hawaris)। সমগ্র মধ্য-আমেরিকায় ধর্মীয় বল খেলার বিশালতম মাঠ টলটেকরা এই চিচেন ইট্যায় নির্মাণ করে। টলটেকদের ক্ষেত্রে ধনুকাকৃতির ছাদ থামের উপর থাকত, মায়াদের মতো দেয়ালের উপর নয়।

আযটেকরা (Aztecs) আসে ১৪শ শতাব্দীতে। তারা টেক্সকোকো হ্রদের (Texcoco Lake) মাঝে স্থাপন করে তাদের রাজধানী, নাম তার তেনোশতিত্‌লান (Tenochtitlán)। মূল ভূখণ্ড হতে দ্বীপে যাবার জন্য বিশেষ পথ ছিল। অতি অল্প সময়ে আযটেকরা অনেক শক্তি সঞ্চয় করে এবং ১৫২০ সালে স্প্যানিশদের আক্রমণের আগে সমগ্র মধ্য-আমেরিকা ছিল তাদের কব্‌জায়।

স্প্যানিশরা তেনোশতিত্‌লান এবং আযটেকদের বহু পিরামিড ও মন্দিরের পবিত্র শহর ছোলুলা (Cholula) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। ঐতিহাসিক তেনোশতিত্‌লান এখন মেক্সিকো সিটির নিচে এক ধবংসস্তূপ। তবে স্প্যানিশদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, বিশাল দোতলা এক প্রাসাদ ছিল, যার বেদী ছিল প্রতি পাশে ৬০০ ফুট। থামবিশিষ্ট প্রাসাদে ছিল একাধিক উঠান ও বারান্দা; সমতল ছাদ। প্রাসাদের ভিতরের দেয়ালে রঙিন প্রলেপ বা স্টাকো (stucco), রঙিন পশমি সুতা দ্বারা অলঙ্কৃত কাপড় বা ট্যাপেস্ট্রি (tapestry); বাইরে উজ্জ্বল সাদা চুনকামে দেয়াল ঝকমকে, ফুল ফুটে থাকত সবুজ বাগিচায়।

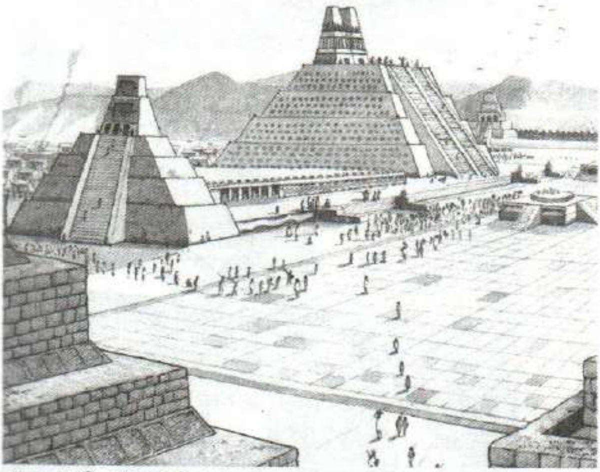

৮৯ তেনোশতিত্‌লানদের মন্দির

আযটেকরা তাদের পূর্বসূরিদের স্থাপত্যরীতি গ্রহণ করে এবং দ্বৈত-পিরামিড ছাড়া তাদের নিজস্ব কোনো অবদান ছিল না। টেনায়ুকায় (Tenayuca) ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈত-পিরামিড যা ধর্মীয় কারণে প্রতি ৫২ বছর অন্তর পুনর্নির্মাণ করা হতো। বর্তমান দ্বৈত-পিরামিড নির্মিত হয় ১৪৫০-১৫০০ সালে।

আযটেকরা যেমন বর্বর তেমনি কোমলমনাও ছিল বলে মনে করা হয়। তেনোশতিত্‌লান উৎসর্গকরণ অনুষ্ঠানে ২০,০০০ মানুষ জবাই করা হয় বটে; আবার দেবদেবতা, মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালার ভাস্কর্যের আকারে প্রকাশ পায় তাদের স্পর্শকাতর হৃদয়। আযটেকরা পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল। আর বাষ্প দ্বারা স্নান সম্বন্ধে তো মায়ারাই জানত।

আযটেকরা সমগ্র মধ্য-আমেরিকা জয় করলেও মিক্সটেক (Mixtec) নামে এক ছোট্ট গোত্র তাদের কৃষ্টিগত স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছিল। আধুনিক মেক্সিকোর দু-তিনটি প্রদেশে অবস্থানরত মিক্সটেকদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে মিতলা (Mitla), যেখানে নেই কোনো পিরামিড, আছে শুধু প্রাসাদ। উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো স্তম্ভ-প্রাসাদ (Palace of the Columns) যেখানে রয়েছে নিখুঁতভাবে খোদাইকৃত কাজ।

৯০ গ্রিসদেশীয় ভবনে মার্বেলের ব্যবহার

খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালের আগে হতে গ্রিসদেশীয় সভ্যতার আভাস পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০-৩০০ সালে গ্রিস ভাষায় সাহিত্যচর্চা পূর্ণতা লাভ করে।

গ্রিসদেশীয়রা তাদের দালানকোঠা খুব হিসাবনিকাশ করে এবং অনেক নিয়ম-কানুন মেনে নির্মাণ করত। তাদের দালানের মাঝখান দিয়ে ভাগ করলে একপাশের সকল অংশের সাথে অন্য পাশের অংশগুলোর হুবহু মিল থাকত; যাকে বলা হয় পূর্ণসাদৃশ্য বা সিমেট্রী (symmetry)। দালানের এক অংশের সাথে অন্য অংশের আনুপাতিক সম্পর্ক বা প্রোপোরশন (proportion) গ্রিস স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মৌলিকত্ব বা উদ্ভাবনের দিকে জোর না দিয়ে, একই অবয়ব বা আকারকে সার্বিকভাবে পূর্ণতা দিতে প্রাচীন গ্রিসবাসীরা সদা সচেষ্ট ছিল। যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রযুক্তি এবং কলাকৌশল-বিদ্যা যুগের পর যুগ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে হস্তান্তর হতে থাকে।

৯১ গ্রিসদেশীয় ভবনে দৃষ্টি সংক্রান্ত সংশোধনী

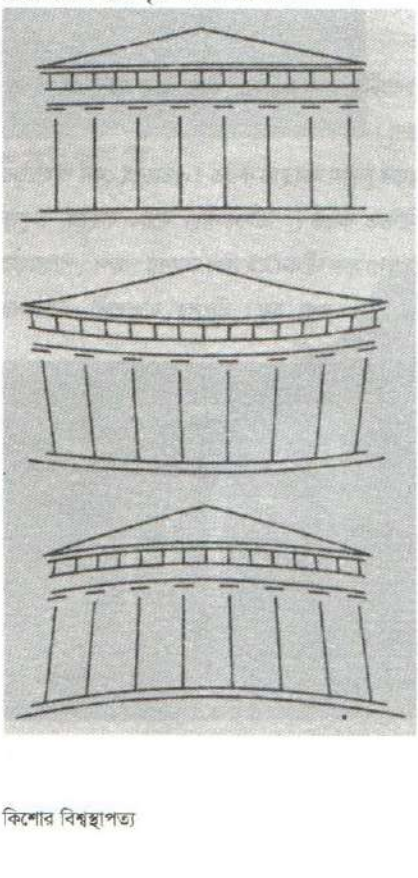

প্রাচীন গ্রিস থাম এবং সমান্তরাল কড়ি ব্যবহারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ভবনের বহির্ভাগ অভ্যন্তরের তুলনায় অধিক গুরুত্ব পেতো। ভবনকে ভাস্কর্যসম মনে করে, এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ী পারিপার্শ্বিকতার অন্তর্ভুক্ত বস্তু হিসেবে নির্মাণ করা হতো। জ্যামিতিক গঠন এবং আকৃতি সর্বত্রই রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশে স্থান পেতো।

চুনাপাথর এবং মার্বেল (marble) ছিল প্রধান নির্মাণ সামগ্রী। পাথর ব্যবহারে এবং খোদাই করার কাজে গ্রিসবাসীরা ঈর্ষণীয় মান অর্জন করতে সক্ষম হয়। এমনকি এসব ভবনের চাক্ষুষ

ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে তারা ভবনের অংশগুলোকে ছোট-বড় করত। এতে করে, ভূমি থেকে থামের উপরিভাগ প্রকৃতপক্ষে নিচের তুলনায় সরু দেখা যাবার কথা হলেও দৃষ্টি সংক্রান্ত সংশোধনীর (optical correction) মাধ্যমে উপর হতে নীচ পর্যন্ত সমান মনে হতো।

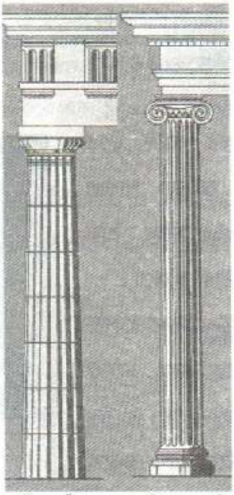

৯২ গ্রিসদেশীয় থাম : ডরিক, আয়োনিক

৯৩ করিন্থিয়ান ক্যাপিটাল

তবে গ্রিসবাসীদের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ প্রভাব হচ্ছে তিন প্রকার থামের প্রবর্তন। আজ অবধি সারা বিশ্বে সেই থামের আকার অনুকরণ হয়ে আসছে। এই তিন প্রকার থাম ডরিক (Doric), আয়োনিক (Ionic) এবং করিন্থিয়ান (Corinthian) নামে পরিচিত। ডরিক সরাসরি মেঝে থেকে উঠে এলেও অন্য দুই প্রকার থাম স্তম্ভমূলে অবস্থিত। তবে তিন প্রকার থামের প্রধান পার্থক্য স্তম্ভের শীর্ষদেশে বা ক্যাপিটালে (capital) কারুকাজ। স্তম্ভের প্রকার ও প্রকরণ পাশ্চাত্যের স্থাপত্যকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। আজ অবধি পশ্চিমে এবং বলতে গেলে পৃথিবীর সর্বত্র ভবনের শোভা বৃদ্ধি করার জন্য গ্রিসবাসীদের প্রবর্তিত স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়।

গ্রিক সভ্যতা শুধু স্থাপত্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাচীন গ্রিস থেকেই পাওয়া যায় রাজনীতি, দর্শন, বিচার ব্যবস্থা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা।

গ্রিক সভ্যতার মন্দির এবং ধর্মীয় ভবনগুলো পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করত। এভাবেই যেন পাহাড়ের নিম্নাংশে অবস্থিত শহরের উপর মন্দির তার কর্তৃত্ব নিশ্চিত করত। গ্রিসবাসীরা ঘরের বাইরে, উন্মুক্ত আকাশের নিচেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করত। খোলামেলা মুক্ত জীবনটাই ছিল তাদের পছন্দ। পাহাড়ের উপরে সুরক্ষিত মন্দির নগরীকে এক্রোপলিস (Acropolis) বলা হয়। গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের

৯৪ এ্যাম্পিথিয়েটার: গ্রিসদেশে উন্মুক্তস্থানে মিলনায়তন

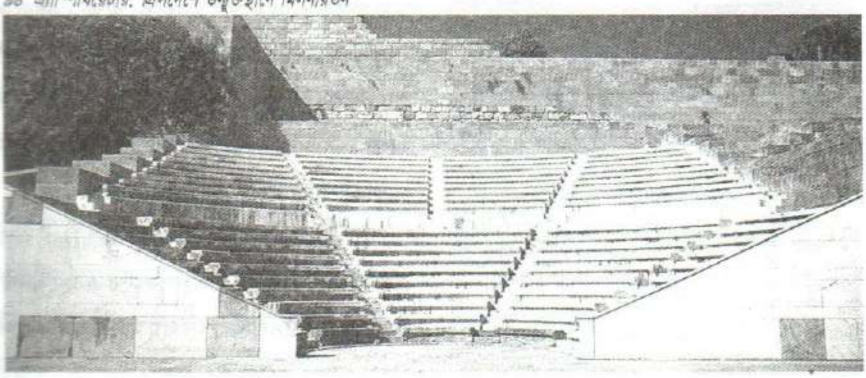

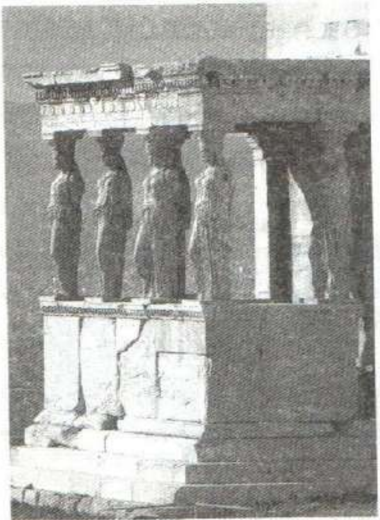

৯৫ এক্রোপলিস-র মন্দির

৯৬ পুরাতন এথেন্স শহর

এক্রোপলিসের মাঝে স্থান পেয়েছে আকারশুদ্ধতায় সবচেয়ে নিখুঁত বিশ্বনন্দিত মন্দির পারথেনন্ (Parthenon)। পরবর্তীকালে পারথেনন গির্জা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক সময় মসজিদ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল। খাঁজকাটা ডরিক স্তম্ভ, চকচকে মার্বেল, নানা রঙএর আয়োজন, পরিকল্পনায় অনাড়ম্বর, ভবনের অংশগুলোকে প্রয়োজন মোতাবেক ছোট-বড় করে ভবনের দৃষ্টি সম্বন্ধীয় ভারসাম্য রক্ষা, অঙ্ক কষে বিভিন্ন অংশের আকার অনুপাত নির্ধারণ; এসবে এবং আরো অনেক গুণে গুণান্বিত পারথেনন্। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪৭-৪৩২ সালে নির্মিত পারথেনন্ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভবন হিসেবে বিবেচিত।

গ্রিসের আদি শহরগুলো পরিকল্পিত ছিল না। পরবর্তীকালে সমকোণভিত্তিক রাস্তা তৈরি করে এবং ভবনের ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী শ্রেণিগত, অর্থাৎ জোনিং (zoning), করে গ্রিকরা শহরগুলোকে পরিচ্ছন্নতার ছাপ দিতে সক্ষম হয়েছিল।

৯৭ পার্থেনন, এথেন্স

মিনোয়া (Minoa) *এবং মাইসিনি* (Mycaenae)

গ্রিক সভ্যতার আবির্ভাবের আগে গ্রিস দেশের মিনোয়া এবং মাইসিনি নামক শহরের নির্মাণ কাজ লক্ষণীয়। ক্রীট (Crete) দ্বীপের উপর ভিত্তি করে মিনোয়াদের নগর গড়ে উঠেছিল। তাদের সমুদ্রশক্তি ছিল কিন্তু তাদের নির্মাণ কৌশল ছিল নিম্নমানের। তবে মৃৎশিল্প, রত্নখচিত অলঙ্কারাদি এবং ধাতুশিল্পে মিনোয়ানরা পারদর্শী ছিল।

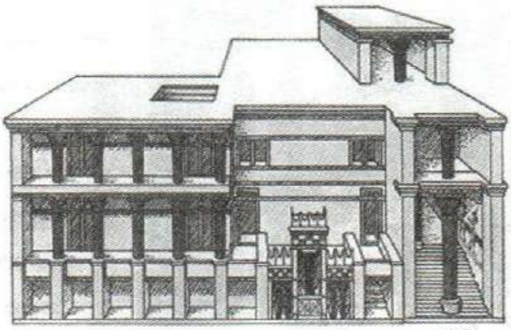

৯৮ মিনোয়া এবং মাইসিনির ভবন

গ্রিক সভ্যতার আগে থেকেই মাইসিনিয়রা ছিল সমরপ্রিয়। পাথর দিয়েই তারা বেশি কাজ করত। আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাইসিনি শহর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রবেশ পথে ছিল বিখ্যাত সিংহদরজা যা লায়ন গেট (Lion Gate) নামে পরিচিত। দরজার উপরের পাথরটি অবিশ্বাস্যভাবে বিরাট। লম্বায় ১৬ ফুট, উচ্চতায় সাড়ে তিন ফুট এবং দৈর্ঘ্যে আট ফুট। এই পাথরটির উপরে রয়েছে পাথরের তৈরি মুখোমুখি দুটি সিংহ।

৯৯ সিংহদরজা বা লায়ন গেট, মাইসিনি

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধের জন্মতারিখ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে একথা সত্য যে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে নেপালের লুম্বিনি (Lumbini) নামক স্থানে সমরপ্রিয় সাক্য (Sakya) রাজপরিবারে তাঁর জন্ম। আটাশ বা উনত্রিশ বছর বয়সে গৌতম গভীর ধর্মীয় অনুভূতি উপলব্ধি করেন। অস্তিত্বের বোঝা হতে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেন। তারপর বিভিন্ন স্থান ঘুরে অবশেষে বুদ্ধগয়ায় বটগাছের তলে ছয় বছর সাধনা করেন। অত:পর গৌতম খুঁজে পান জীবন যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পাবার পথ ;

তিনি হলেন "বুদ্ধ", অর্থাৎ জ্ঞানী। তাঁর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধরা পুনর্জন্মে এবং কর্মের ফল প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষ ছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম বর্মা, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। আশি বছর বয়সে ভারতের উত্তর প্রদেশের কুশিনগরে গৌতম বুদ্ধ পরিনির্বাণ করেন।

ভারতের সবচেয়ে পুরাতন ভবনগুলো বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। খ্রিষ্টপূর্ব কাল হতেই ভারতে রাজত্ব করছিলেন মৌর্য (Maurya) সম্রাটরা (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১-১৮৫)। রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কৌটিল্য নামক এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় গ্রিস দেশ হতে আগত সম্রাট আলেক্সান্ডারকে (Alexander) (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫৬-৩২৩) পরাজিত করে নিজ সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। চন্দ্রগুপ্তের নাতি রাজা অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ২৯১-২৩২) খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৪ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৫ সালে বৌদ্ধ ধর্মকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। অশোকের সময়কালের আগে ভারতের নির্মাণশিল্প এবং স্থাপত্য কি ছিল তা আজ স্পষ্ট নয়।

ভারতের স্থাপত্যে অশোকের আমলের প্রধান ছয়টি অবদান হল ঃ

ক- পাথরের উপর খোদাই করা বিভিন্ন আদেশনামা বা শিলালিপি,
ইংরেজিতে এডিক্ট (edict)।

খ- বেশ কয়েকটি স্তূপ, বা ইংরেজিতে স্টুপা (stupa)।

গ- একখানি মাত্র পাথর কেটে পাথরের উঁচু কয়েকটি স্তম্ভ বা
মনোলিথিক থাম (monolithic pillar)।

ঘ- একখানি মাত্র পাথরের তৈরি মন্দিরের (monolithic temple) অংশবিশেষ।

ঙ- কাঠের তৈরি এক বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

চ- পাহাড়ের গায়ে খোদাইকৃত একগুচ্ছ গুহা।

অশোকের আমলে ভিত্তি, থাম, কড়ি, দেয়াল, বাঁকানো ও সমতল ছাদ ইত্যাদির জন্য সেগুন কাঠ বা টীক (teak) ব্যবহার হতো। সেগুলি এত উঁচু মাত্রার কাজ হয়েছিল যে আজ অবধি গুণগত মানে তা ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। তবে কাজগুলোতে গ্রিস দেশীয় এবং পারস্য স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নিঃসন্দেহে অশোকের শাসনকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হল একখানি মাত্র পাথর দিয়ে তৈরি পার্শ্ব সাহায্য বিনা দাঁড়িয়ে থাকা বা ফ্রি-স্ট্যান্ডিং (free-standing) স্তম্ভগুলো। ত্রিশটি থামের মধ্যে দশটির ধ্বংসাবশেষ আজও টিকে আছে। ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু গোলাকার থামের উপরে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো প্রতীক (সাধারণত জীবজন্তু) অবস্থান পেতো। সবটা মিলে উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট।

BANSDOC Library * Dhaka *

উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান পাটনা শহরে দক্ষিণে পাটলিপুত্র (Pataliputra) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল অশোকের প্রাসাদ। উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা প্রাসাদ এলাকার ভিতরে অনেকগুলো ভবন ছিল। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভবন ছিল অসংখ্য থামের সাহায্যে তৈরি তিন তলা এক বিশাল হলঘর যার সাথে পারসিপলিসের (Persepolis) একশত থাম সমৃদ্ধ হলঘরের সাদৃশ্য রয়েছে। থামগুলো ছিল মানুষের আকৃতির এবং এগুলোর উপরই ছিল কাঠের ছাদ।

ভারতে পাহাড় কেটে মন্দির

পাহাড়ের গায়ে পাথর খোদাই করে মন্দির তৈরি করা ভারতের স্থাপত্যের এক ব্যতিক্রমধর্মী ঐতিহ্য। অশোকের সময়কাল হতেই পাহাড়ের পাথর কেটে উপাসনালয়, মন্দির, মঠ, ইত্যাদি তৈরি করা হতো। তবে পাথরের তৈরি ধর্মীয় ভবনগুলোতে পূর্ববর্তী কাঠ দিয়ে তৈরি নির্মাণ কাজের প্রভাব স্পষ্ট।

খ্রিষ্টপূর্ব কাল হতেই হীনযানী (Hinayana) বৌদ্ধরা পাহাড় কেটে গুহার ভিতরে উপাসনালয় তৈরি করত। অজন্তার (Ajanta) পাহাড়ে হীনযানীরা এরকম পাঁচটি গুহা খনন করে ; তার মধ্যে দুইটি ছিল চৈত্য হল (Chaitya Hall) বা মন্দির এবং অন্যগুলো বিহার (Vihara) বা মঠ। খ্রিষ্টাব্দ শুরুর পরবর্তী চারশত বছর কোনো অজ্ঞাত কারণে অজন্তায় নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল।

নাসিকে (Nasik) তিনটি অলঙ্কৃত একতলা বিহার (প্রথম শতাব্দী) খোদাই করা হয়। কোন্দান (Kondane) নামক স্থানে হীনযানীদের তৈরি বিহার ও চৈত্য হল (মন্দির) আছে।

১০০ অজন্তার গুহা

জৈনদের গুম্ফা (Gumpha)

উড়িষ্যার কটক্ (Cuttack) শহরের নিকটবর্তী খ্রিষ্টপূর্ব দেড়শত বছর আগে জৈনদের খোদাইকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির কিছু গুহা পাওয়া গেছে। এরূপ গুহাকে স্থানীয়ভাবে গুম্ফা বলা হয়। অধিকাংশ গুম্ফা উদয়গিরি (Udaigiri) পাহাড়ে অবস্থিত এবং দুই একটা রয়েছে খান্দ্রাগিরি (Khandragiri) পাহাড়ে। জৈনদের গুহা স্থাপত্যে মন্দিরের বৈশিষ্ট্য ছিল না; ঘরগুলো সম্ভবত হীনযানীদের বিহারের মতো ব্যবহার হতো। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে পাথরে খোদিত কাহিনী সমেত হাতি গুম্ফা (খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০), কতকটা মন্দিরের মতো ব্যতিক্রমধর্মী দোতলা রানী গুম্ফা এবং বাঘের মুখাকৃতির মতো ছোট এক প্রকোষ্ঠের বাঘ গুম্ফা।

এর পরে দেখা যায় যে মহাযানী (Mahayana) বৌদ্ধরা (৪৫০-৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ) পাহাড় কেটে চৈত্য হল এবং বিহার তৈরি করেছে। মহাযানী বৌদ্ধদের প্রশংসনীয় স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন অজন্তা, ইলোরা ইত্যাদি স্থানে আজও বর্তমান। ভিতরে ও বাইরে ভাস্কর্য দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা বৌদ্ধদের চৈত্য হল।

পাহাড় কেটে নিপুণ কারুকার্য সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মীয় ভবনগুলোর মাঝে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০ সালের কারলী (Karli), খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ হতে অষ্টম শতাব্দীর অজন্তা এবং ষষ্ঠ হতে অষ্টম শতাব্দীর ইলোরার মন্দিরগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অজন্তার পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন হীনযানী (Hinayana) বৌদ্ধদের পাঁচটি এবং পরবর্তী মহাযানী (Mahayana) বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য তেইশটি ঘর পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটি চৈত্য হল এবং অন্যগুলো মঠ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। চৈত্য হল এবং মঠের অনেক নিচ দিয়ে বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা সরু জলপ্রবাহ।

১০) কারলী মন্দির

একদা যে স্থান শত শত সন্ন্যাসী, শিল্পী ও কারিগরের কর্মব্যস্ততায় ছিল মুখর, আজ সেই অজন্তা শুধু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। অজন্তার মন্দির যখন খোদাই করা হচ্ছিল তখন বৌদ্ধ ধর্ম ছিল তুঙ্গে। সেই আমলে অজন্তায় যে উঁচু মানের স্থাপত্যশিল্প সৃষ্টি হয়েছিল তা পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে সুদূর চীন ও জাপানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

দাক্ষিণাত্যে ৬৪২ সালে হিন্দু রাজা পল্লবের (Pallava) আক্রমণের পর অজন্তার পাহাড়ে বৌদ্ধদের মন্দির খোদাই করার কাজ হঠাৎ করেই থেমে যায়। অজন্তার অনেক বৌদ্ধ কারিগরকে দক্ষিণে মাদ্রাজের নিকট মামাল্লাপুরমে (Mamallapuram) নয়নাভিরাম পাথর-কাটা হিন্দু মন্দির (অষ্টম শতাব্দী) তৈরি করতে নিয়ে যাওয়া হয়। মামাল্লাপুরম আবার মাহাভালিপুরম নামেও পরিচিত।

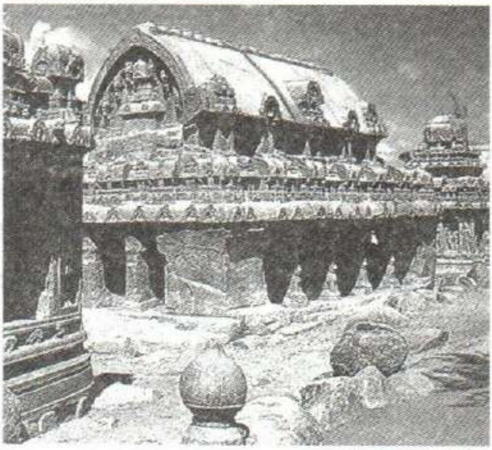

১০২ মামাল্লাপুরমে মন্দির

স্তূপ (stupa)

১০৩ সাঁচীর স্তূপ

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে এমন প্রাচীন জায়গার উপর অর্ধবৃত্তাকার স্তূপ নির্মাণ করত। এগুলোর চারপাশে প্রদক্ষিণ পথ থাকত। চারিদিকে গোলাকৃতি দেয়াল দিয়ে ঘেরা স্তূপের বেষ্টনীতে প্রবেশ করার জন্য থাকত অত্যধিক অলঙ্কৃত প্রবেশদ্বার। খোদাইকৃত কাজ করা এই প্রবেশদ্বার স্তূপের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সাঁচীর (Sanchi) স্তূপগুলো প্রথম শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল।

ভারতে হিন্দু ধর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশ বৌদ্ধদের প্রভাব কমে যায়। তবে স্থাপত্যে প্রকৃত হিন্দু স্টাইল স্থাপিত হতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

হিন্দু ও জৈন (Jain) ধর্ম

ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় ব্যবস্থা। সুদূর অতীতের ভারতীয় আর্যদের

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদের (Veda) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। হিন্দুদের আলাদা ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। হিন্দুরা পুনর্জন্ম এবং কর্মের ফল প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে।

হিন্দুদের মধ্য থেকে যারা মহাবীরের (Mahavira) (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭) শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে তাদেরকে জৈন (Jain) বলা হয়। সমবেদনা এবং করুণার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত জৈন ধর্মে কোনো দেবতা নাই।

হিন্দু স্থাপত্য

ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ হবার কারণেই গভীর ধর্মীয় অনুভূতি দ্বারা উজ্জীবিত হিন্দু স্থাপত্য মূলত ভারতবর্ষে সীমিত। তবে ধর্ম প্রসারের মাধ্যমে দূরপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে এর প্রভাব দেখা যায়।

বিশ্বের প্রাচীন ধর্মের মাঝে অন্যতম হয়েও হিন্দু স্থাপত্য বলে আজ যা পরিচিত তা তুলনামূলকভাবে বেশি দিনের নয়। হিন্দু স্থাপত্যের চেয়ে হিন্দু ধর্ম অনেক প্রাচীন। প্রকৃত হিন্দু স্থাপত্যের বর্তমান আকৃতি স্থাপিত হয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে। কম টেকসই নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের কারণে বোধ করি পুরাতন নিদর্শনের অস্তিত্ব এখন আর নেই। প্রথমে হিন্দুরা পাথরের পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণ শুরু করে এবং তারপরই কাঠামোগত মন্দির নির্মাণে মনোনিবেশ করে।

১০৪ কৈলাশ মন্দির, ইলোরা

রোমান সাম্রাজ্য

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৯ সালে এট্রুস্কানদের (Etruscan) পরাজিত করার পর রোমানরা প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। রোমানরা তাদের পূর্বপুরুষ এট্রুস্কানদের বহু ভবন ধ্বংস করে। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হতে চতুর্থ শতাব্দীর কিছু দেয়াল রোমানদের ধ্বংসলীলা হতে রক্ষা পায়; আজও তার কিছু নমুনা বর্তমান। এইসব দেয়ালে সুদৃশ্য খিলানযুক্ত দরজা দেখা যায়।

এট্রুস্কানরা নির্মাণ কাজে ছিল অত্যন্ত সুদক্ষ। খাল কাটা, পয়ঃনিষ্কাশন, বন্যানিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পুরকৌশলগত কাজে তারা ছিল বিশেষভাবে পারদর্শী। নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করত কাঠ, পাথরের টুকরা, কাদামাটি (কদাচিৎ পোড়ানো); এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবনের ভিত্তি, দুর্গের প্রাচীর ও কবরের জন্য পাথর।

এট্রুস্কানরা মাটির নীচে পাথর কেটে কবর তৈরি করত; অভ্যন্তর ছিল রং দিয়ে ঢাকা। উদাহরণস্বরূপ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভূগর্ভস্থ স্টাচ্চীর সমাধি (Tomb of the Stuchchi) উল্লেখ করা যায়।

এট্রুস্কানদের পরাজিত করার পর পার্শ্ববর্তী এলাকা, যেমন দক্ষিণ ইতালী, গ্রিস এবং ম্যাসিডোনিয়া (Macedonia) দখল করে রোমানরা আধিপত্য বিস্তার করে। পরবর্তীকালে উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, মধ্যপ্রাচ্য সবই রোমানদের অধীনে চলে আসে। সম্রাট জুলিয়াস সীজারের (Julias Caeser) আমলে (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮-৪৯) রোমানদের উত্তর সীমানা ছিল রাইন (Rhine) নদী এবং ইংলিশ চ্যানেল (English Channel)। প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি রোমান সাম্রাজ্য পূর্ণতা লাভ করে।

রোমান সভ্যতায় গ্রিসদেশীয় স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়। রোমানরা প্রকৌশল বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। বিরাটাকার অভ্যন্তরীণ স্থান নির্মাণে রোমানরা ছিল বিশেষভাবে পারদর্শী। বালি, সিমেন্ট এবং পাথরের টুকরার সংমিশ্রণে সৃষ্ট কংক্রিট (concrete) তৈরিতে রোমানরা নৈপুণ্য অর্জন করে। কংক্রিটের নমনীয়তার কারণে খিলান, ধনুকাকৃতির ছাদ এবং গম্বুজ নির্মাণ সহজ হয়।

১০৫ রোমান সাম্রাজ্য

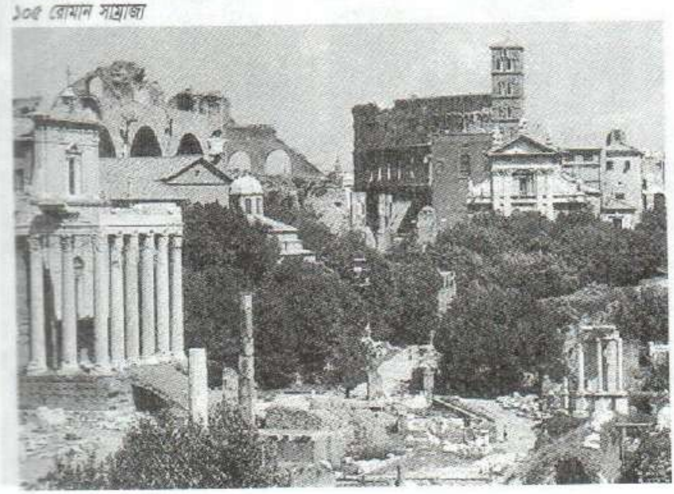

ধনুকাকৃতি ছাদ বা ভল্ট (vault) প্রবর্তন করে প্রাচীন এই রোমানরা। তবে রোমান স্থাপত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল রোমান থাম বা অর্ডার (Roman Order) এবং গোলাকৃতির খিলান। গ্রিকদের ন্যায় রোমে

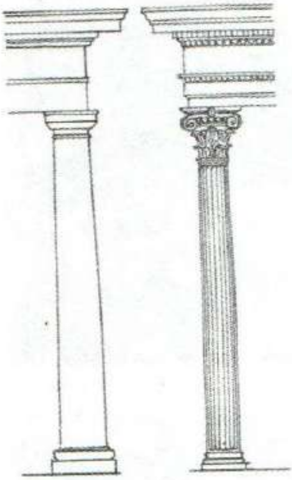

১০৬ রোমান থাম

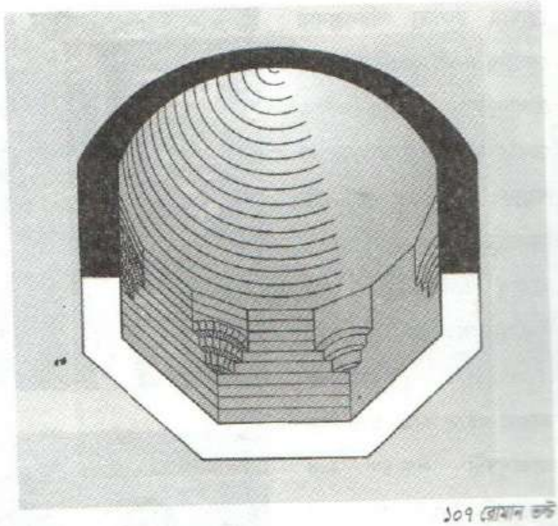

১০৭ রোমান ভল্ট

ছিল ডরিক (Doric), আয়োনিক (Ionic) এবং করিন্থিয়ান (Corinthian) থাম। তবে বাড়তি আরো দুই ধরনের থাম ছিল টুসকান (Tuscan) এবং যৌগিক বা কম্পোসিট (Composite) থাম।

শক্তিশালী ও দাম্ভিক রোমান সাম্রাজ্যের মহিমা প্রতিফলিত হয় তাদের বিশালাকার দালানে। যুগের তুলনায় ভবনের প্রতিটি মাত্রা ছিল বিস্ময়কর। রোমানরা দালানের আকার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাত না। এর ফলে তারা কাঠামোকে অলঙ্করণ থেকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিল।

নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার হতো কংক্রিট, মার্বেল ও বিভিন্ন ধরনের পাথর, ইট ইত্যাদি। বিভিন্ন রঙের পাথর জোড়া লাগিয়ে তৈরি করত মোজাইক (mosaic)। অভ্যন্তরীণ দেয়াল বা ছাদ অলঙ্করণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রলেপ বা আস্তর ব্যবহার করা হত। ভবনের বহিরাংশ অনেক ক্ষেত্রে পাথর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হত। ভিত্তিতে পাথর, দেয়ালে ইট এবং খিলানে ঝামা পাথর ব্যবহার করে রোমানরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

রোমান স্থাপত্যে একই কাঠামোতে থাম ও কড়ির সাথে খিলান ও ধনুকাকৃতির ছাদ দেখা যায়। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তারা দুই থামের মধ্যবর্তী ব্যবধান ৯০ ফুট পর্যন্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বিস্তৃত বিশাল স্থান নির্মাণ করে রোমানরা যে দক্ষতা প্রদর্শন করে তা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অতিক্রম করা যায়নি।

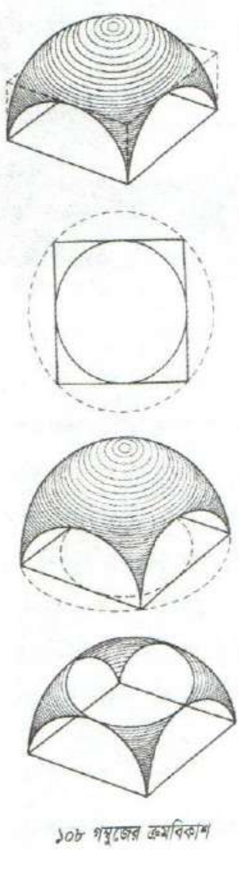

১০৮ গম্বুজের ক্রমবিকাশ

রোমান স্থাপত্য পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় একটি কাল্পনিক রেখার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। কল্পিত রেখার দুই পাশে ভবনের বা শহরের অংশগুলো মোটামুটি সমভাবে অবস্থান করত; তাতে থাকত আদিকালের সেই পূর্ণসাদৃশ্য বা সিমেট্রী (symmetry)। ঘনবসতির কারণে শহরে জমির মূল্য ছিল আকাশচুম্বী। পাঁচ-ছয় তলা বসতবাড়ি নির্মাণ করে অল্প জমিতে বেশি লোক থাকার ব্যবস্থা করে নেয় প্রাচীন রোমানরা। সেই হিসেবে অ্যাপার্টমেন্ট (apartment) ভবনের প্রবর্তকও রোম নগরীর অধিবাসীরা। আদালত-কক্ষ হিসেবে রোমে ছিল আয়তক্ষেত্রাকার একটি হলঘর, যা রোমান স্থাপত্যে ব্যাসেলিকা (basilica) নামে পরিচিত।

১০৯ রোমান বিশালাকার থিয়েটার

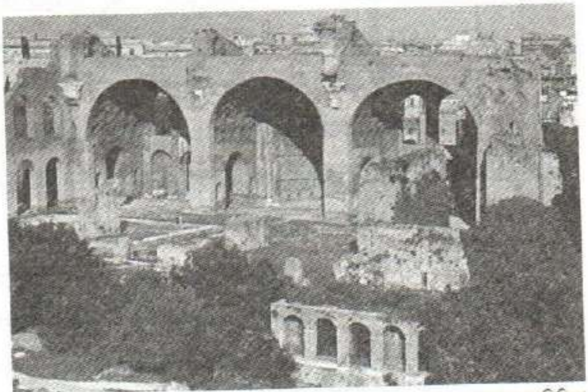

১১০ রোমান ব্যাসিলিকা

কৃত্রিম নালা বা অ্যাকুউডাক্ট (aqueduct) এর সাহায্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পানি নিয়ে যেত রোমানরা এবং ঘরের ভিতরে পাইপ দ্বারা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতেও তারা সক্ষম হয়।

১১১ রোমান অ্যাকুউডাক্ট

জনসাধারণের জন্য নির্মাণ করা হতো অনেক কক্ষ বিশিষ্ট স্নানঘর, যেখানে গরম ও ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ ছাড়া বিভিন্ন খেলাধুলা ও চিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা থাকত। রোম শহরে ২১১-২১৭ সালে নির্মিত হয় ১৬০০ কক্ষ বিশিষ্ট কারাকাল্লা স্নানগৃহ বা বাথস্ অব কারাকাল্লা (Baths of Caracalla)।

রোমান স্থাপত্যে বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ

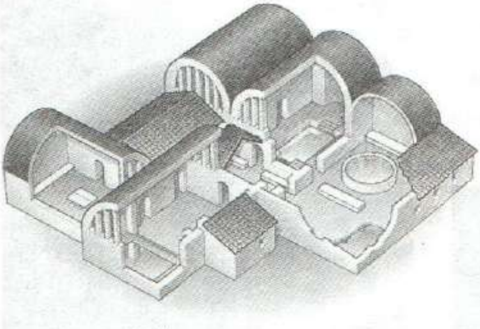

১১২ বাথস্ অব কারাকাল্লা

১১৩ বাথস্ অব কারাকাল্লা

এবং স্টেডিয়াম স্থান পায়। তন্মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত রোমে অবস্থিত কলিসিয়াম (Coliseum) ৭০-৮২ সালে তৈরি হয়। ডিম্বাকার এই স্টেডিয়ামের দৈর্ঘ্য ৬২০ ফুট। চার তলাবিশিষ্ট কলোসিয়ামে ৫০,০০০ দর্শকের আসন ক্ষমতা ছিল। জীবজন্তুর সাথে মানব সন্তানের শক্তি পরীক্ষার নামে মর্মান্তিক লড়াইয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল মধ্যমাঠ বা এরিনা (arena)। মধ্যমাঠের নিচে জীবজন্তু ও ক্রীতদাস রাখার জন্য ছিল অনেকগুলো কামরা। কোনো এক অদ্ভুত কারণে কলোসিয়ামের বিভিন্ন তলায় এককভাবে ডরিক, আয়োনিক এবং করিন্থিয়ান থাম ব্যবহার করা হয়।

১১৪ রোমের কলিসিয়াম

রোমান স্থাপত্যের অনেক ভবনের মধ্যে অন্যতম দৃষ্টান্ত প্যান্থিয়ন (Pantheon) নামক মন্দিরটি। এই ভবনে খিলান সর্বত্রই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বিরাট এই ভবনের গম্বুজাকৃতির ছাদকে

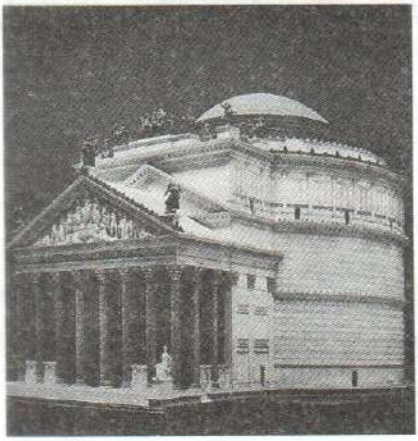

১১৫ প্যান্থিয়ন, রোম (মডেল)

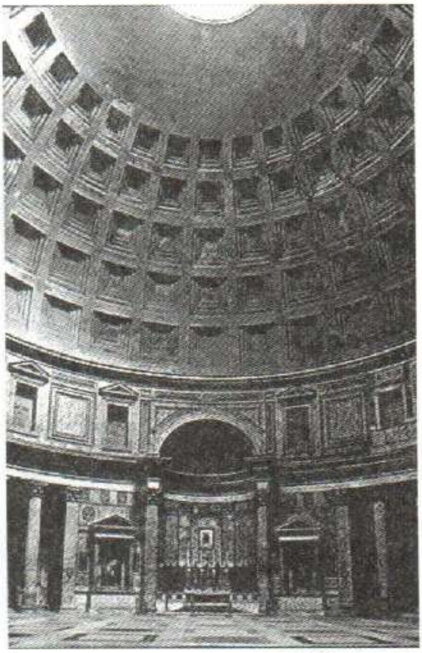

১১৬ প্যান্থিয়নের অভ্যন্তর

হালকা ভাব দেবার জন্য ২১ ফুট পুরু দেয়ালের বহিরাংশে অলঙ্কৃত থাম দেওয়া হয়েছে। মন্দিরটির আকৃতি সিলিন্ডারের (cylinder) মতো। তবে এর বৈশিষ্ট্য হল বৃত্তাকার মেঝে যত চওড়া, ভবনের উচ্চতাও ঠিক তাই; দুটো মাত্রাই ১৪২ ফুট ৬ ইঞ্চি। গম্বুজাকার ছাদের মাঝে ২৭ ফুট ব্যাসের একটি ফাঁকা স্থান রয়েছে যার ভিতর দিয়ে সূর্যালোক অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ভবনটির আলোর একমাত্র উৎস ছাদের ঐ গোলাকার ফাঁকা স্থানটুকু। থামগুলো সব করিন্থিয়ান। বাইরের সবটুকুই এবং মেঝে মার্বেল দিয়ে মোড়া। বলাবাহুল্য ভিতরের দেয়ালে নানা রঙের মার্বেলের কাজ। গম্বুজের উপর সোনার মতো উজ্জ্বল পিতল, তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে প্রস্তুত ধাতু। কালের আবর্তে প্যান্থিয়নের প্রকৃত সৌন্দর্য হারিয়ে গেলেও আজও এই মন্দির পর্যটকদের তাক্ লাগিয়ে দেয়।

১১৭ প্যান্থিয়নে দর্শকের ভিড়

রোমান স্থাপত্য এবং কারিগরি দক্ষতা পরবর্তীকালে প্রাক-খ্রিষ্টীয়, রোমানেস্ক, গথিক এবং রেনেসাঁ যুগের স্থাপত্যকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করে।

খ্রিষ্টাব্দের শুরু ধরা হয় হযরত ঈসা (আ:) বা যিশুর (Jesus Christ) জন্মগ্রহণের সাল হতে। তবে সম্প্রতি কালে হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব চার সালে, বেথলেহেমে (Bethlehem) নামক স্থানে। ত্রিশ বছর বয়সে বার জন ভক্ত নিয়ে হযরত ঈসা (আ:) ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ করে। খ্রিষ্টাব্দ ২৯ বা ৩০ সালে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হয়। তাঁর প্রচারিত বাণীর উপর ভিত্তি করে যে খ্রিষ্টান ধর্ম (Christianity) স্থাপিত হয়েছিল আজ তা বিশ্বের অন্যতম ধর্ম।

খ্রিষ্টান ধর্মের প্রারম্ভে তিন ধরনের ভবন দেখা যায়:

(ক) বিশ্বাসীদের মিলনয়াতন,

(খ) মাটির নীচে সমাধিস্থল বা ক্যাটাকুম্ব (catacomb),

(গ) ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীর স্মৃতিসৌধ বা যিশুর জীবনের কোনো ঘটনাবহুল স্থলের চিহ্ন, যাকে বলা হয় মার্টারিয়াম (martyrium)।

প্রথমদিকের খ্রিষ্টীয় (Early Christian) স্থাপত্যে আয়তক্ষেত্রাকার মিলনয়াতনে দুই পাশে চলাচলের পথবিশিষ্ট একটি থামবিহীন হলঘর এবং আরো কতকগুলো ছোট ঘর থাকত। প্রবেশদ্বার ছিল সর্বদা হলঘরের পশ্চিমে; যেখানে থাকত স্তম্ভের উপরে ছাদবিশেষ বা পোর্টিকো (portico)। পূর্বপ্রান্তে থাকত ধনুকাকৃতি ছাদবিশিষ্ট এপস্ (apse)। কাঠের ছাদবিশিষ্ট হলঘর সাধারণত যতটুকু চওড়া হতো, তার দ্বিগুণ হতো লম্বা। ভবনে তেমন কোনো চাকচিক্য থাকত না।

১১৮ র‍্যাভেনার স্যান ভিটাল এ বাইজ্যানটাইনী মোজাইক

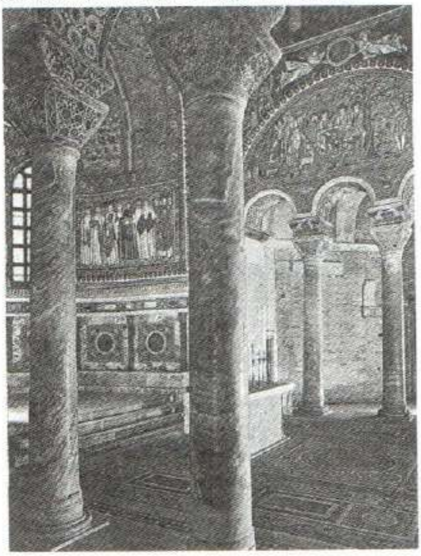

১১৯ প্রথমদিকের খ্রিষ্টীয় গির্জা

চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য যখন পতনের মুখে তখন সম্রাট কনস্ট্যান্টিন (Constantine)

সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করলেন। ঐতিহাসিক তুর্কী শহর কনস্ট্যান্টিনোপলে (Constantinopole), যার বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল (Istanbul) সেখানে স্থাপিত হল নতুন রাজধানী। খ্রিষ্টান ধর্মকে রাজা কনস্ট্যান্টিন মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন এবং রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দিলেন। এই কনস্ট্যান্টিনোপলের এবং বর্তমান ইস্তাম্বুলের আদি নাম বাইজ্যানটিয়া (Byzantia) এবং ঐ আদি নামেই এই এলাকার স্থাপত্য পরিচিত। প্রারম্ভিক খ্রিষ্টীয় স্থাপত্যের পরবর্তী রূপ হলো বাইজ্যানটাইন (Byzantine) স্থাপত্য।

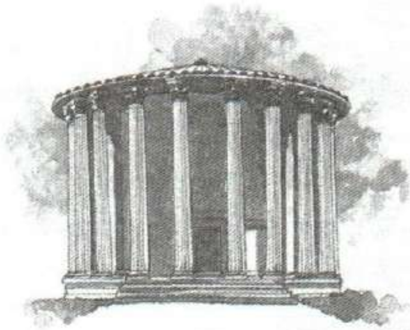

১২০ ব্যাসিলিকা ও বৃত্তাকার ধরনের গির্জা

১২১ বৃত্তাকার গির্জা

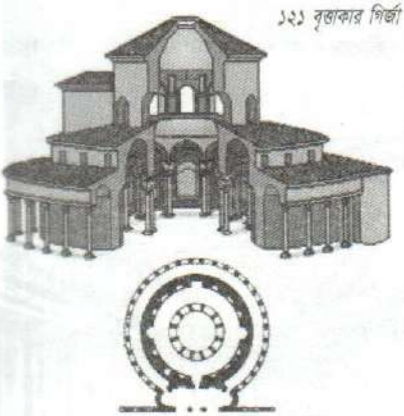

১২২ ক্রুশাকৃতির গির্জা

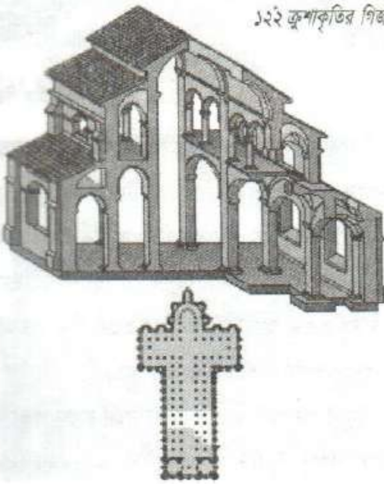

খ্রিষ্টান ধর্ম প্রসার লাভ করার সাথে সাথে ধর্মীয় সভার জন্য মিলনায়তনের পরিবর্তে প্রয়োজন হয়ে পড়ল বিশেষ ধরনের দালান, যাকে সাধারণত চার্চ (church) বা গির্জা বলা হয়। পশ্চিমে গড়ে উঠল আয়তক্ষেত্রাকার গির্জা; বিগতদিনের রোমান ব্যাসিলিকার (basilica) অনুকরণে। পূর্ব প্রান্তে নির্মিত হল বৃত্তাকার গির্জা। তবে ব্যাসিলিকা ও বৃত্তাকার ধরনের গির্জার পাশাপাশি বাইজ্যান্টাইনে ক্রুশাকৃতির (cruciform) অথবা বহুভুজ আকারের গির্জাও নির্মাণ করা হতো; প্রবেশদ্বার সেই পশ্চিমে, বেদি পূর্বদিকে।

রোমানরা বৃত্তের উপর গম্বুজ নির্মাণ করলেও বাইজ্যানটাইনের নির্মাতারা আর এক ধাপ এগিয়ে যায়; পেন্‌ডেন্‌টিভ (pendentive) নামক খিলান আবিষ্কার করে চতুর্ভূজাকৃতির উপর গম্বুজ বসাতে সক্ষম হয়। তবে ক্রুশাকৃতির প্ল্যানের উপর গম্বুজ সাধারণত মার্টারিয়ামে (martyrium) দেখা যেত।

পশ্চিমে ব্যাসিলিকার আকারে গির্জায় থাকত একটি প্রধান হল বা নেইভ (nave); হলের দুপাশে লম্বা বারান্দা বা আইল (aisle) এবং পূর্ব প্রান্তে অর্ধবৃত্তাকার এপস্ (apse) নামে পরিচিত স্থান।

ব্যাসিলিকা, ক্রুশাকৃতির প্ল্যান ও গম্বুজ, ইত্যাদির সমন্বয়ে বাইজ্যান্টাইনের স্থপতিরা গির্জার অভ্যন্তরে আলো-ছায়া, খোলা-বন্ধের এক অপরূপ রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন। এমন গির্জার মধ্যে ৫৩২-৩৭ সালে নির্মিত কনস্ট্যানটিনোপলের হায়া সোফিয়া (Hagia Sophia) শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বাইজ্যান্টাইন স্থাপত্যে ইটের ব্যবহার অধিক প্রচলিত ছিল; ইট দিয়ে বিভিন্ন দেয়ালে নকশা করা হতো। আবার কখনো দেয়ালে আস্তর করা হতো। ইটের খিলান, খিলানবিশিষ্ট ধনুকাকৃতির ছাদ ও গম্বুজ জনপ্রিয় ছিল। থাম যথাসম্ভব কম ব্যবহার হতো। কাঠ কিংবা পাথরের খিলান দ্বারা ছাদ নির্মাণ হতো। ছাদ থাকত টালি কিংবা সীসা দিয়ে ঢাকা।

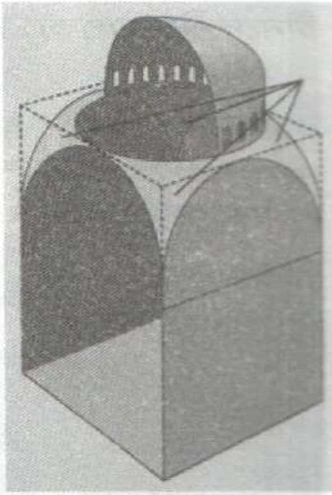

১২৩ পেন্ডেন্টিভ দিয়ে গম্বুজ নির্মাণ

আস্তর দিয়ে ঢাকা বা ইটের তৈরি বাইরের দিকটা থাকত সাদামাটা; ভিতরটা মার্বেলের পাতলা আবরণে এবং রঙ-এর বাহারে জ্বলজ্বল করত। বাইরের দিকের কিছু খিলান আবার ইট দিয়ে বন্ধ করা হতো। অভ্যন্তরে ব্যবহৃত জমকালো মোজাইক, হরেক রকমের মার্বেল, দামি পাথর ইত্যাদি বাইজ্যানটাইন স্থাপত্যকে দিয়েছে প্রাচুর্যের ছাপ।

বাইজ্যানটাইনের ভাস্কর্যে মানব-মূর্তি দেখা যায় না। অলঙ্করণে জ্যামিতিক আকার, গাছ-পালা, ফুল, ফল ইত্যাদির ব্যবহার হতো।

১২৪ হায়া সোফিয়া

উত্তরে হোয়াং-হো (Hwang-Ho) বা ইয়েলো রিভার (Yellow River), মাঝখান দিয়ে গেছে ইয়াংজি-কিয়াং (Yangtze-Kiang) এবং দক্ষিণে সি-কিয়াং (Si-King) নদী এই নিয়ে চীনদেশ; বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দেশ এবং এক শত কোটির বেশি মানুষ নিয়ে যার জনসংখ্যা বিশ্বের সর্বাধিক।

১২৫ চীনা দালান

প্রাচীন চীনদেশে কাঠ, খড়কুটা ইত্যাদি দিয়ে ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে বাড়িঘর নির্মাণ করা হতো। তাই খুব পুরোনো নিদর্শনের অস্তিত্ব এখন আর নেই। মিং সাম্রাজ্যের (১৩৬৮-১৬৪৪) আগের কোনো আবাস ভবন বা প্রাসাদের নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পাথর এবং ইটের ব্যবহার ভিত, দুর্গ এবং বৌদ্ধ মন্দিরে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে সমাধির উপরে পাথর এবং ইটের ধনুকাকৃতির ছাদ যে চীনারা ব্যবহার করত তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও, ১৩শ শতাব্দীর আগে ঐ পদ্ধতি তারা কাজে লাগায়নি।

থাম এবং কড়ি, বাঁকানো ছাদ (যার অনেকটা থামের অনেক বাইরে ঝুলে থাকত), ইত্যাদি ভবনের অংশ কারুকার্যে পরিপূর্ণ থাকত। দেয়াল ছাদের ভার বহন করত না; শুধু আড়াল করা বা পর্দার কাজে ব্যবহার করা হত। বৌদ্ধ মন্দির তথা প্যাগোডা (pagoda) ব্যতীত সকল ভবন একতলা হত। তবে কখনো কখনো বাড়িতে বা প্রাসাদে চিলেকোঠা থাকত। দালান বা নির্মাণ কাজে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য গুরুত্ব পেতো।

সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে ট্যাং (Tang) সাম্রাজ্যের (৬১৮-৯০৬)

১২৬ চীনা দালানের ক্ষুদ্র অংশ

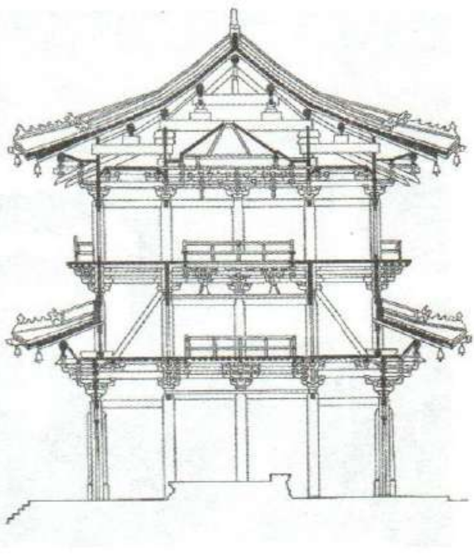

প্যাগোডা, যার মূল আকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাধ্যমে ভারত থেকে আমদানি হয়। পরে অবশ্য স্থানীয় প্রভাব প্রাধান্য পায়। প্ল্যানে প্যাগোডা হত সমকোণ আকৃতির যা প্রতি ধাপে ছোট হতে থাকত। প্যাগোডা ইট এবং পাথর দিয়ে তৈরি হলেও অলঙ্করণে কাঠের আকার ধারণ করত। এই ধরনের প্যাগোডা ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত হতে থাকে।

১২৭ প্যাগোডা

চন্দ্রপৃষ্ঠ হতে পৃথিবীর বুকে মানুষের তৈরি যে প্রাচীর যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীত খালি চোখে দেখা যায় চীনারা প্রায় এক হাজার বছর ধরে সেটা নির্মাণ করেছে। বহিরাগতদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য খ্রিষ্টপূর্ব ২১০ সাল হতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত চীনারা তৈরি করে **১৭০০ মাইল লম্বা গ্রেট ওয়াল** (Great wall) **বা বিখ্যাত চীনের প্রাচীর।**

আধুনিক চীনা স্থাপত্যকর্মেও উঠান, বাঁকানো ছাদ, সাদা মার্বেল পাথরের রেলিং ইত্যাদির আদি প্রভাব দেখা যায়। ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর হতে ইয়োরোপীয় কিছু প্রভাব নির্মাণ কাজে দেখা যায়, যেমন নানকিং (Nanking) বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার হল (Lecture Hall)। ১৯২০ সালে

১২৮ চীনদেশের গ্রেট ওয়াল

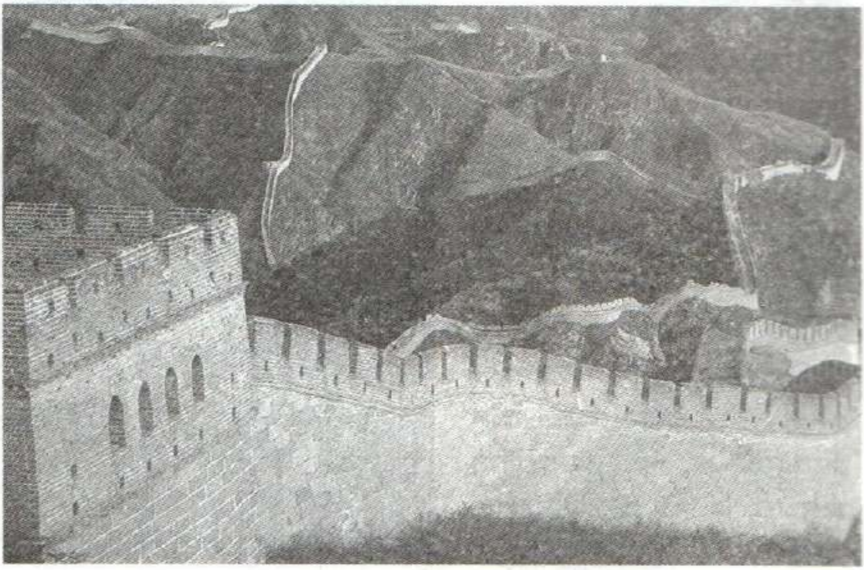

চীনা রেনেসাঁর (Renaissance) পর ইয়োরোপীয় স্টাইলে নির্মিত অনেক ভবনে চীনা অলঙ্করণ লেপ্টে দেওয়া হয়। তবে ১৯৪৯ হতে আন্তর্জাতিক আধুনিক স্টাইল প্রাধান্য বিস্তার করছে। এখন বহুতল ভবন নির্মিত হলেও নান্দনিক কারণে বেইজিং (Beijing) এ নয় তলার অধিক ভবন নির্মাণ করতে দেওয়া হয় না।

ইসলামের প্রভাবে স্থাপত্য

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নাই এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) (৫৭০-৬৩২) তাঁর প্রেরিত রসুল, এই বিশ্বাস যারা গ্রহণ করে তারা মুসলমান; ইসলাম তাদের ধর্ম।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ৬১০ সালে নবুয়ত লাভ করার পর হতে আজ অবধি ইসলাম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ইসলামের শুরুতে মাত্র এক থেকে দেড় শত বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিরাট একটা অংশ ইসলামকে নিজ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। মুসলমানগণ পশ্চিম প্রান্তে উত্তর আফ্রিকা জয় করে স্পেন পর্যন্ত, পূর্বে মধ্য এশিয়া এবং ভারত উপমহাদেশ বশ করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন। অমুসলিম দেশগুলোতে ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। ধর্ম প্রচারকদের বাণী বহু মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে একত্র করতে সক্ষম হয়েছিল।

১২৯ ইসলামে একাধিক কৃষ্টির মিলন : মতি মসজিদ

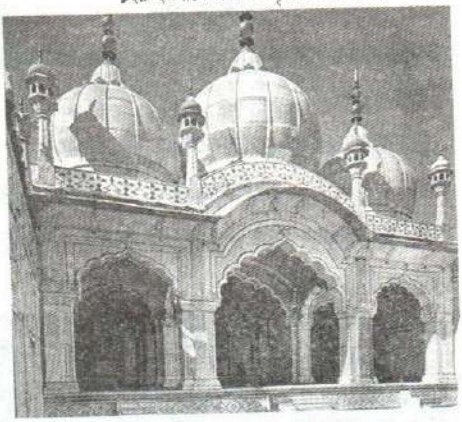

১৩০ ইসলামি স্থাপত্যে ফুলের কাজ

ইসলামি সাম্রাজ্য যেখানেই স্থাপিত হয়েছে, মুসলমানরা সেই দেশের কৃষ্টি, স্থাপত্য ও চারুকলার গ্রহণযোগ্য দিকগুলো অনুমোদন করেছে। শুধু তাই নয়, সেই অঞ্চলের ঐ সকল গুণাবলীর সাথে ইসলামের ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার সমন্বয় ঘটিয়ে ইসলামকে কেবল বিশ্বের অন্যতম ধর্মে পরিণত করেনি, ইসলামি কৃষ্টি ও স্থাপত্যকেও শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌছাতে সাহায্য করেছে। ইসলাম ভিন্নধর্মী একাধিক কৃষ্টির স্থাপত্য এবং চারুকলাকে একীভূত করার অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া এবং বাইজ্যানটাইন স্থাপত্যের সূত্র ধরে ইসলামি স্থাপত্য আবির্ভূত হয়।

অধিকংশ স্থানে মসজিদ এবং বিশেষত ভারতবর্ষে প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের শৈল্পিক ও কারিগরি দক্ষতা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। মানব ও প্রাণী আকৃতি ব্যবহারে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে ইসলামি স্থাপত্যে জ্যামিতিক আকার, ডালপালা ও ফুলের কারুকার্যময় নক্‌শা এবং পবিত্র কোরানের লিখন প্রাধান্য পায়।

১৩১ ইসলামি হস্তলিপি

মসজিদ সাধারণত আয়তক্ষেত্রাকার হয়। মসজিদের কেবলামুখী (মক্কায় অবস্থিত কা'বা শরিফের দিক) দেয়ালে মিহ্‌রাব (mihrab) নামক ছোট একটি ঘর থাকে। সাধারণত অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজাকৃতির ছাদ বিশিষ্ট এই মিহ্‌রাবে দাঁড়িয়ে ইমাম নামাযের নেতৃত্ব দেন। কেবলামুখীর বিপরীত দেয়ালের অপর প্রান্তে প্রায়শই খোলা উঠান থাকে; যার আরবি নাম সাহ্‌ন (sah'n)। উঠানের চতুর্দিকে থাম বিশিষ্ট বারান্দা অথবা আইওয়ান (iwan) মসজিদের আরেক বৈশিষ্ট্য। সাহ্‌নের মধ্যস্থানে রাখা হয় ওজুর জন্য পানির ব্যবস্থা। মিহ্‌রাবের ডান পাশে দু-তিনটি সিঁড়ি বিশিষ্ট উঁচু স্থানটির নাম মিম্‌বার (mimbar)। জুমআ নামাজের আগে ইমাম মিম্‌বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা পাঠ করেন। ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকে নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য মসজিদের ভিতরে মাক্‌সুরা (maqsura) নামক একটি কাঠের গ্রিল (grill) ব্যবহার করা হতো।

১৩২ মসজিদের বিভিন্ন অংশ

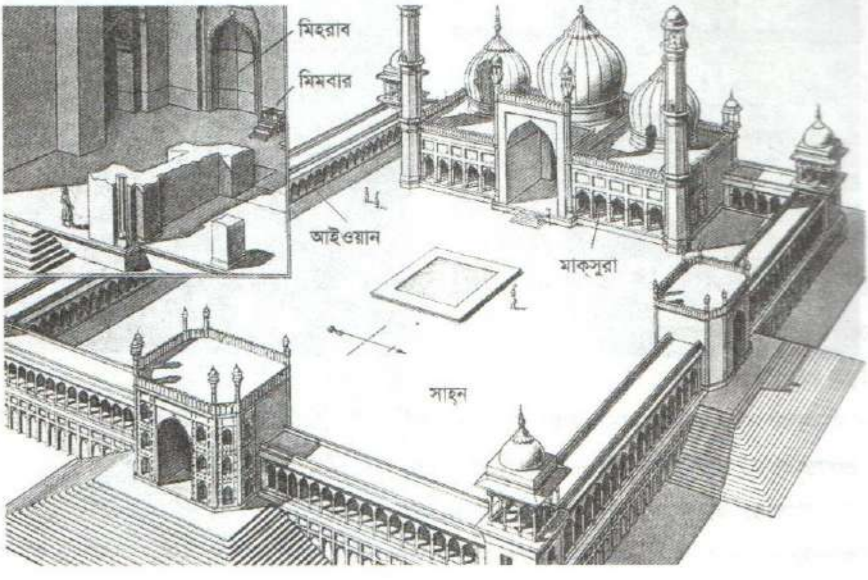

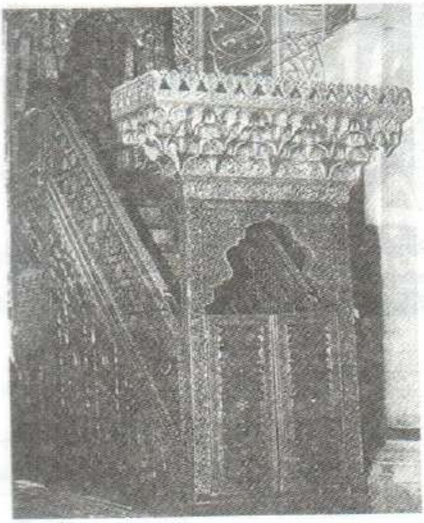

১৩৩ মিমবার

মসজিদ সহ ইসলামি স্থাপত্যে ভবনের বিভিন্ন অংশ, ভবনের মাঝখানের একটি কাল্পনিক রেখার দুই পাশে প্রতিসমভাবে থাকে। আগেই বলা হয়েছে এই পদ্ধতিকে সিমেট্রি (symmetry) বলা হয়। উপরন্তু একই আকার বারবার ব্যবহার করা হয়। জানালা এবং দরজার উপরিভাগে এবং টানা লম্বা বারান্দায় পার্শ্ববর্তী দুটি থামের মাঝে খিলান ব্যবহার করা ইসলামি স্থাপত্যে অনেকটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। খিলান অশ্বখুরাকৃতি (horse-shoe) অথবা সুচালো হতে পারে। গম্বুজ দিয়ে ইসলামি স্থাপত্যে যে ছাদ তৈরি করা হয় তা বাইজ্যানটাইনের একটি শক্তিশালী প্রভাব।

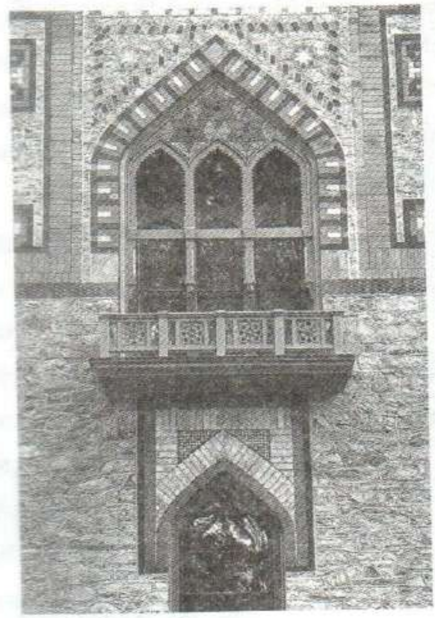

১৩৪ ইসলামি স্থাপত্যে খিলান

১৩৫ অশ্বখুরাকৃতি খিলান

সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে আরব দেশে লেখার গুরুত্ব ছিল না। পবিত্র কোরান শরিফকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে কুফিক (Kufic) নামের লিখনশৈলীর প্রসার ঘটে।

উঁচুমানের অলঙ্করণের জন্য ইসলামি স্থাপত্য বিশেষভাবে সমাদৃত। দেয়ালের গায়ে চক্চকে টালি, মোজাইকে রঙএর প্রাচুর্য, আস্তরের উপর খোদাই এবং রঙের কাজ, কাঠের কাজ, নক্শাকৃত ইটের

কাজ, ইত্যাদি ইসলামি স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। অলঙ্করণ দ্বারা ভবনকে প্রায়শই সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেওয়া হতো। অলঙ্করণ করার সময় সেই এলাকার পরিচিত বস্তুবিশেষ অনুকরণ করা হতো। যেমন পাথরের ভবনে তাঁবুর প্রকাশ।

নির্মাণ কৌশলের ব্যাপারে ইসলামি স্থাপত্য রোমান ও বাইজ্যানটিয়ান রীতির পাথরের কাজ এবং মেসোপোটিমিয়ানদের ইটের কাজের কাছে ঋণী। জিপসাম্ (gypsum) দ্বারা তৈরি প্লাস্টার (plaster) স্তরে স্তরে দেয়ালে লাগিয়ে খোদাই, রং এবং খুব করে পালিশ করা হতো। কাঠ সহজলভ্য ছিল না বলে কাঠের কাজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল।

১৩৬ কুফা অঞ্চলের আরবি হস্তলিপি

১৩৭ মসজিদে অলঙ্করণ

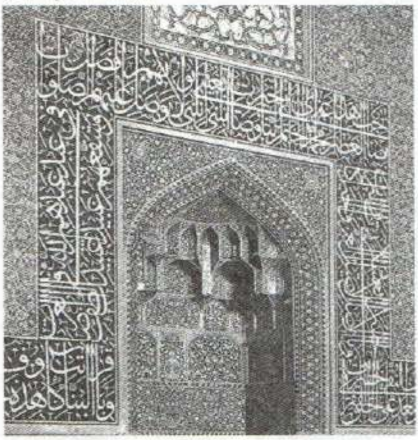

১৩৮ ইসলামি স্থাপত্যে জ্যামিতির ব্যবহার

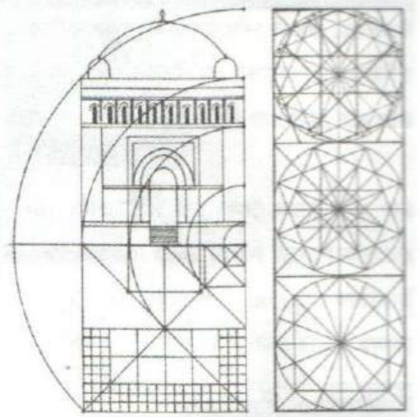

১৩৯ ইসলামি স্থাপত্যে কাঠের অনুকরণে নকশা

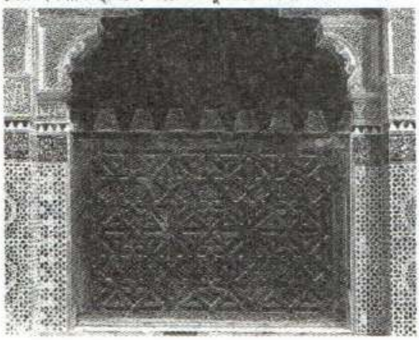

ইরান, স্পেন এবং ভারতবর্ষে মূলত ইসলামি স্থাপত্যের বিশিষ্ট নিদর্শনগুলো অবস্থিত। তবে বিশ্বের যেখানেই মুসলমান বাস করছে সেখানে মুসলমানদের জন্য মসজিদ, কবর বা সমাধি ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। সাম্রাজ্যের কর্তাব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন হয়েছে রাজকীয় প্রাসাদ। ইসলামি স্থাপত্যের আদি উৎসের সাথে স্থানীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের অপরূপ মিলন সাধন করে

১৪০ অলঙ্করণ : সেলজুক আমলের সমাধি

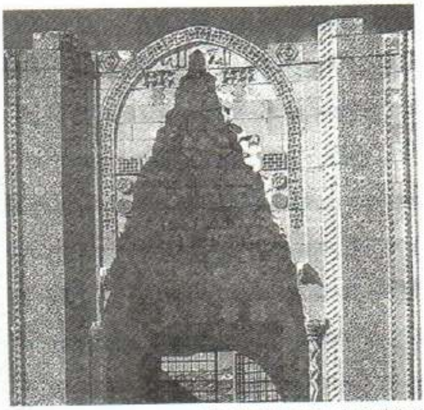

১৪১ সেলজুক ভবনে তাবুর ভাবান্তর

স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দেশে দালানসমূহ। ইসলামি স্থাপত্য স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে বারবার নতুন রূপে প্রকাশ পেলেও মৌলিক ধর্মীয় বিষয়বস্তু কখনও তা থেকে হারিয়ে যায়নি।

১৪২ বিভিন্ন দেশে ইসলামি ইমারত : মালয়শিয়া (উপরে), তুরস্ক (বায়ে), স্পেন (ডানে)

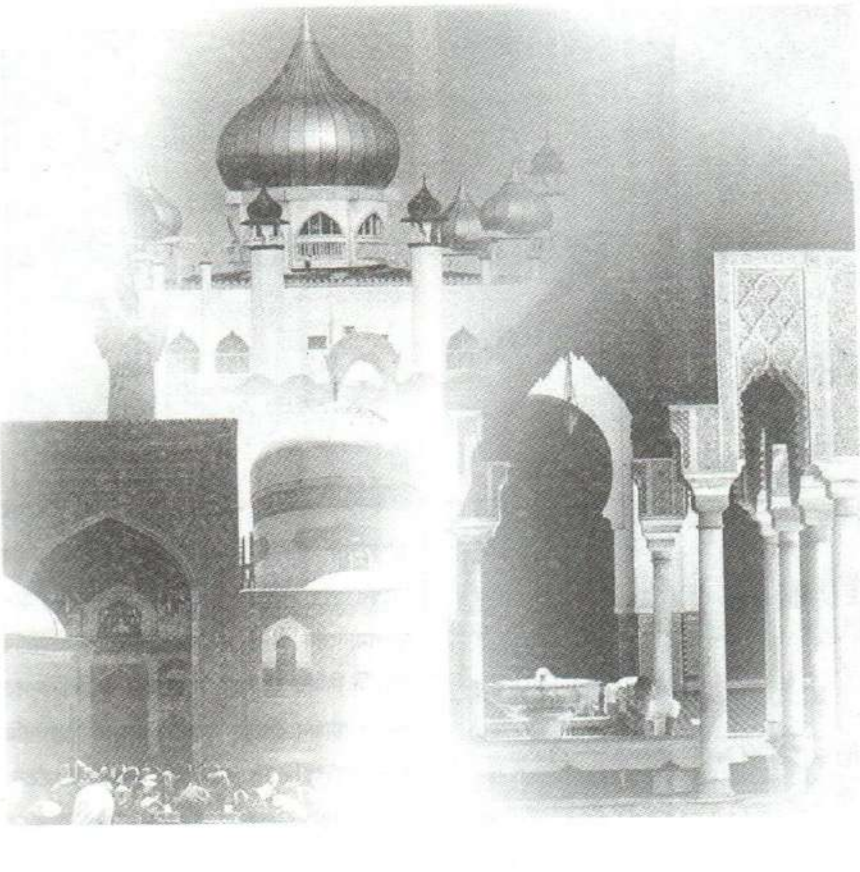

চীনের মাধ্যমে ৫৫০ সালের দিকে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম আসে। আর তাই সবচেয়ে পুরাতন ভবনগুলো ধর্মীয় হওয়াটাই স্বাভাবিক।

প্রাচীন চীনদেশের স্থাপত্য পাশ্ববর্তী জাপান ব্যতীত অন্য কোথাও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। চীনের সাথে জাপানের স্থাপত্যের অনেক মিল রয়েছে। জাপানেও কাঠ ছিল প্রধান নির্মাণ সামগ্রী; আর চীনের মতো জাপানেও প্যাগোডা তৈরি হয়। প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ বিহার হরিউজি (Horyuji) অন্যতম। এখানে রয়েছে বেষ্টনীর মধ্যে অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ, বহু-থামবিশিষ্ট বৌদ্ধ হল, পাঠাগার এবং পাঁচ তলাবিশিষ্ট প্যাগোডা, যার প্রতি তলার বাঁকানো ছাদ অনেকখানি বাইরের দিকে ঝুলে আছে।

১৪৩ জাপানের দালান : কিন্‌কাকুজা মন্দির, কিওটো, ১৪শ শতাব্দী

১৪৪ জাপানের দালানের অভ্যন্তর

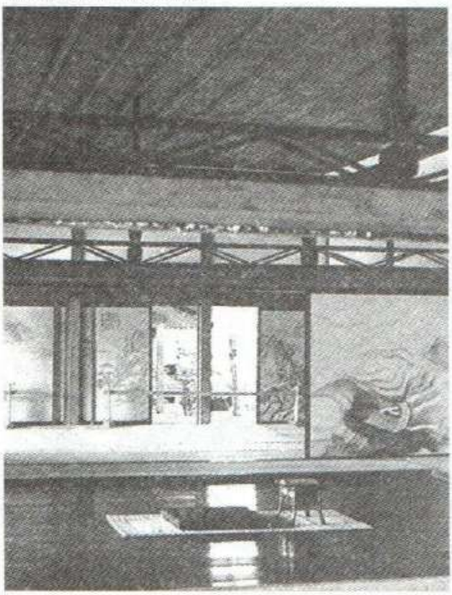

জাপানেও ছাদ বহন করার জন্য থাম ব্যবহার করা হতো, দেয়াল হিসেবে কাগজের বেড়া বা প্যানেল (panel), কার্ডবোর্ড (cardboard), ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। হালকা দেয়াল সরিয়ে ঘরকে ছোট-বড় করার ব্যবস্থা থাকত। জাপানি স্থাপত্যে কাঠের কাজের প্রাধান্যের পাশাপাশি ধাতুশিল্প, দেয়ালচিত্র এবং ল্যাকার (lacquer) বা বার্নিশ দ্বারা প্যানেলের অলঙ্করণে শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করা যায়।

ঘরবাড়ির পরিকল্পনায় জাপানিরা সরল সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করত। সাধারণ ঘরবাড়ি একতলার বেশি হতো না। ভবনের প্রতিটি অংশের মাপ নির্দিষ্ট এককের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা

১৪৫ জাপানের দালানে কাঠের ব্যবহার

হতো। সেই একক ছিল "ছয় ফুট গুণ তিন ফুট" -এর একটি মাদুর।

আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো জাপানি স্থাপত্যে প্রাধান্য পেতো, তবে চীনা চিন্তাধারা ও কৌশলের ছাপ চোখে পড়ে। জাপানি বাগানও সর্বত্র সমাদৃত। ভবনকে বাগানের অংশ হিসেবে গণ্য করে জাপানিরা সৃষ্টি করেছিল এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

আধুনিক স্থাপত্যের অন্যতম প্রবর্তক স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট (Frank Lloyd Wright) জাপানি স্থাপত্য দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাইট এবং তাঁর সহযোগী অ্যান্টনিন্ রেইমন্ড (Antonin Raymond) (১৮৯০-১৯৭৬) টোকিওতে ১৯১৬-২০ সালে ইম্পেরিয়াল হোটেল (Imperial Hotel) ডিজাইন করেন। পরবর্তীকালে অন্য নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে হোটেলটি ভেঙে ফেলা হয়। রেইমন্ড জাপানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আরো অনেক কাজ করার সুযোগ পান।

১৪৬ কেনজো টাঙের কাজ : অলিম্পিক স্পোর্টস হল, টোকিও

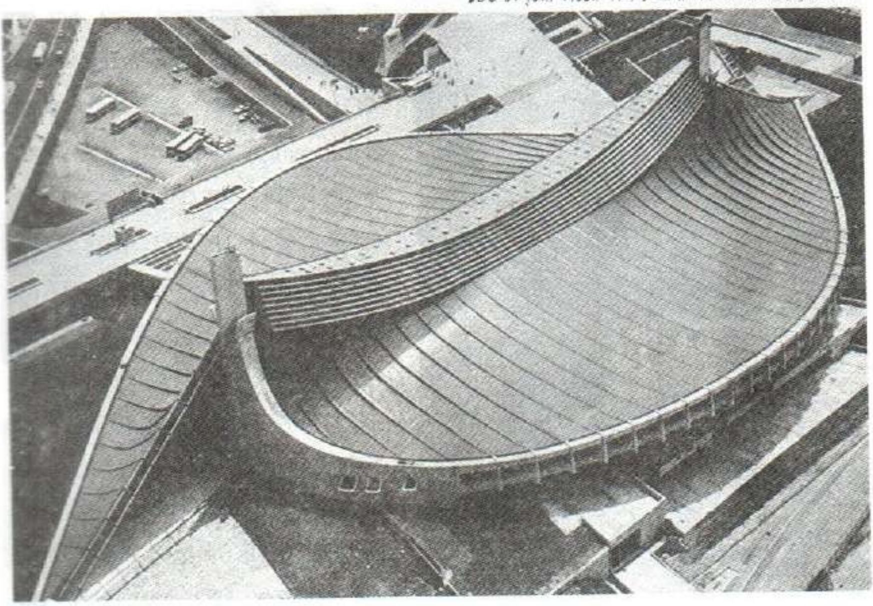

ধীরে ধীরে পশ্চিমা উপাদানগুলো আমদানি হতে থাকলেও ১৯৫০ দশকে কতিপয় স্থপতির কাজের মাধ্যমে তাঁদের গুরু ফরাসি স্থপতি লে কর্বুসিয়্যার (Le Corbusier) (১৮৮৭-১৯৬৬) জাপানের স্থাপত্যকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করেন। কুনিও মিকাওয়া (Kunio Maekawa) (১৯০৫-), জুন্‌জো সাককুরা (Junzo Sakakura) (১৯০৪-৭৪) এবং টাকামাসা ইয়োশিসাকা (Takamasa Yoshisaka) (১৯১৭-) লে কর্বুসিয়্যারের অফিসে কাজ করেন। লে কর্বুসিয়্যার তখন কংক্রিট এবং স্টিলের কাঠামোকে প্রকাশ করার রীতি ব্রুটালিজম্ (Brutalism) নিয়ে ব্যস্ত। তাঁরই বদৌলতে এই তিন স্থপতি সেই মনীষী স্থপতি কর্বুসিয়্যারের চিন্তাধারা জাপানে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৪৭ ইসোজাকির কাজ

কেনজো টাঙ্গে (Kenzo Tange) (১৯১৩-) জাপানের সবচেয়ে পরিচিত স্থপতি। টাঙ্গে প্রায় সব কাজে শুধু কংক্রিট ব্যবহার করেন। ১৯৬০ সালের টোকিও অলিম্পিক্সের (Tokyo Olympics) বিভিন্ন স্টেডিয়াম ডিজাইন করে টাঙ্গে বিপুলভাবে আলোচিত এবং প্রশংসিত হয়েছিলেন।

অ্যান্ডিজ (Andes)

সমগ্র পেরু (Peru), আংশিক বলিভিয়া (Bolivia) ও চিলিতে (Chile) আনুমানিক ১২০০ সাল হতে ইন্‌কা (Inca) সভ্যতা বিরাজমান ছিল। তবে ১৩শ শতাব্দীতে কুজকোতে (Cuzco) রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে ইন্‌কা সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। ইন্‌কাদের সামাজিক ব্যবস্থা, কৃষি কাজ, সড়ক নির্মাণ, কাচের থালা-বাসন, বস্ত্রশিল্প, দালান-কোঠা, ইত্যাদি হতে তাদের প্রগতিশীলকৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

ইন্‌কারা পাথরের কাজ খুব ভালো জানত। শ্যাভিন দ্যা হান্টরের (Chavin de Huntar) কাস্তিলোতে (Castilo) ভাঙ্গা পাথর দিয়ে তৈরি ঘর এবং বসার স্থান কাটাপাথর (cut stone) দিয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছিল। সেখানে ছিল নিখুঁত ভাস্কর্যে ভরা অলঙ্কৃত কার্নিশ।

উল্লেখ করার মতো ইন্‌কা নিদর্শনের মধ্যে আছে মোচা (Mocha) শহরে পিরামিড অব্ দা সান (Pyramid of the Sun); দৈর্ঘ্যে ৭৫০ ফুট, প্রস্থে ৪৫০ ফুট এবং উচ্চতায় ১৩৫ ফুট।

মধ্য-আমেরিকানদের মতো উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করত না ইন্‌কারা; তাদের ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত এবড়ো-খেবড়ো কাটা পাথর যা একটার সাথে আর একটার গায়ে লেগে থাকত। ইন্‌কারা সড়ক নির্মাণে পারদর্শিতা প্রমাণ করে; ৩২৫০ মাইল অ্যান্ডিজ সড়ক ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল বিশ্বের সর্বাধিক লম্বা সড়ক।

১৪৮ ইন্‌কাদের আমলে তৈরি দেয়াল

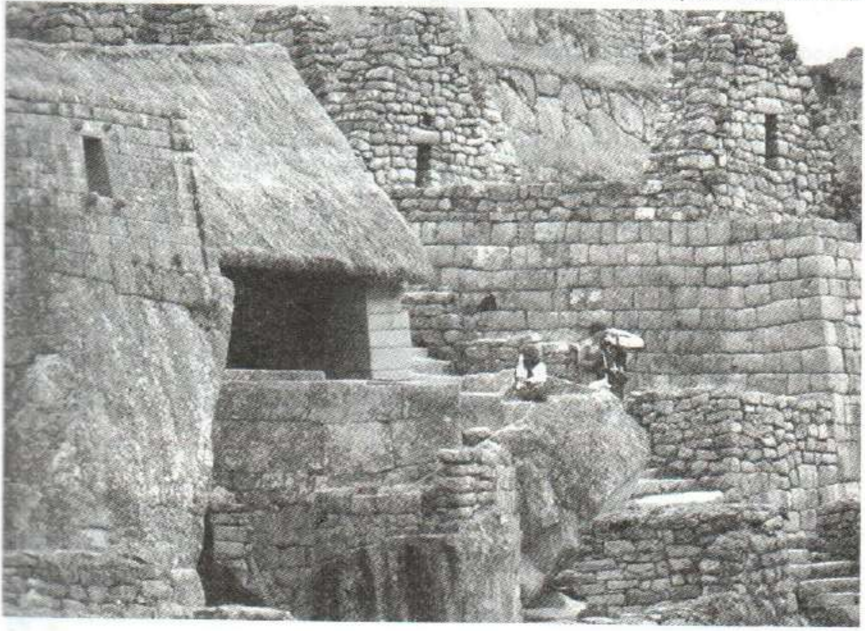

মধ্যযুগের ইয়োরোপ

মধ্যযুগে (১১০০-১৫০০ সাল) ইয়োরোপে আত্মরক্ষামূলক প্রাচীর এবং প্রাসাদ নির্মাণের কাজই বেশি। তখন জমিদার টাকার পরিবর্তে কর্মীদের জমি ভোগ করতে দিত। একে অপরের উপর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ছিল জমিদারদের এইসব আয়োজন। এমনকি স্থাপত্যেও। রাজা ছিল সব জমির মালিক। বিলেতে ব্যারন (Baron) এবং ফ্রান্সে ভ্যাসালদের (Vassal) মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে রাজারা জমি ভাড়া দিত। শহর আয়তনে বৃদ্ধি পেলে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হলে এবং যুদ্ধের পন্থা বদলে গেলে ১৪শ শতাব্দীতে বিলেতে এই পদ্ধতি ভেঙে পড়ে। আর ফ্রান্সে তো রীতিমতো ১৭৮৯ সালে সূচিত ফরাসি বিপ্লবের (French Revolution) মাধ্যমে মধ্যযুগীয় এই বর্বরতা বন্ধ করা হয়।

প্রাচীন রোম, বাইজ্যান্টাইন এবং অন্যান্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত সমগ্র ইয়োরোপে ১০০০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত যে স্টাইলের কর্তৃত্ব ছিল তার নামকরণ করা হয় অনেক পরে; উনবিংশ শতাব্দীতে। রোমানেস্ক (Romanesque) স্থাপত্য খ্রিষ্টান ধর্মের পুনর্জাগরণ হতে আবির্ভূত। গির্জার আকার প্রয়োজনে বড় হতে থাকল। সংঘাতে বিভক্ত ইয়োরোপকে একত্রিত করতে যে ধর্মীয় শক্তি কাজ করেছে তার মহিমা প্রতিফলিত হয় রোমানেস্ক গির্জাগুলোতে। প্রাচীন ব্যাসিলিকার সাথে যোগ হয় ছোট ছোট উপাসনালয়। বৃত্তাকার, চতুর্ভুজাকার বা অষ্টভুজ আকারের উঁচু স্তম্ভাকৃতির টাওয়ার (tower) ভবনের শোভা বৃদ্ধি করত।

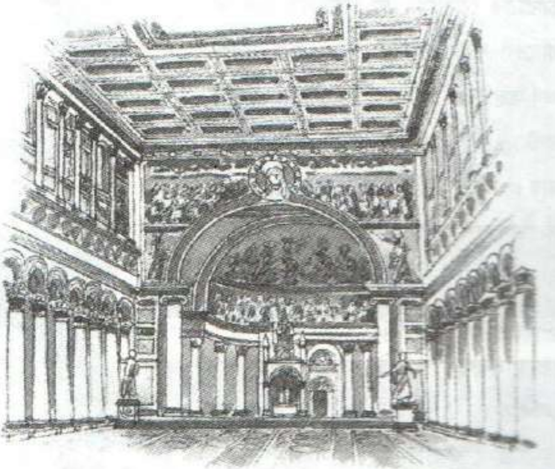

১৪৯ রোমানেস্ক গির্জা

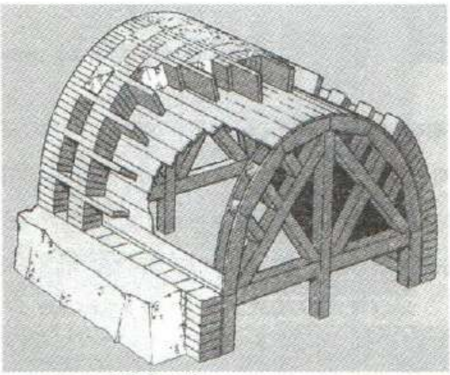

১৫০ ব্যারেল ভল্ট নির্মাণ পদ্ধতি

স্থাপত্য প্ল্যানে রোমানেস্ক গির্জা সর্বদা ক্রুশাকৃতির বা ল্যাটিন ক্রসের (Latin cross) ন্যায় হতো। বৃত্তাকার খিলান, গির্জার অভ্যন্তরে প্রধান হল বা নেইভ (nave) এবং দুই পাশের চলাচলের পথের বা আইলের (aisle) মধ্যবর্তী স্থানে খিলান, ক্রমাগত ছোট হয়ে যাওয়া একাধিক থামের মধ্যে দরজা, ছোট ও সরু জানালা যা অলঙ্করণের কারণে বড় দেখাত ,

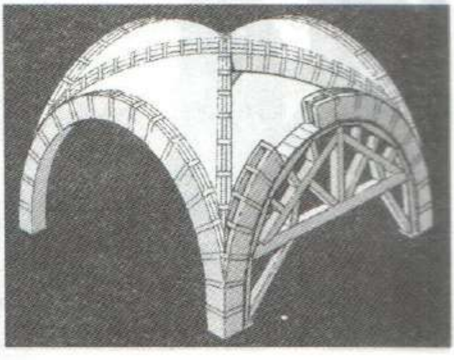

১৫১ গ্রয়েন ভল্ট

খোদাই কাজ ও ভাস্কর্য এবং ভারী পাথরের কাজ, ইত্যাদি রোমানেস্ক স্থাপত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অর্ধ-স্তম্ভাকৃতি ছাদ বা ব্যারেল ভল্ট (barrel vault) এবং দুইটি অর্ধ-স্তম্ভাকৃতি ছাদের সংযোগে সৃষ্ট গ্রয়েন ভল্ট (groin vault) রোমানেস্ক ভবনে দেখা যায়। নেইভ (nave) ও আইলের (aisle) সংযোগস্থলে দেয়ালের উপর দিয়ে আলোর ব্যবস্থা বা ক্লিয়ারস্টোরি লাইটিং (clerestory lighting) করার ব্যাপারেও রোমানেস্ক স্থপতিরা পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

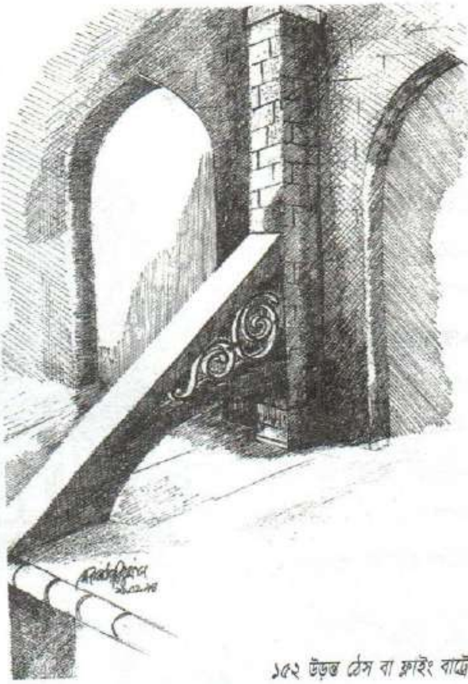

১৫২ উড়ন্ত ঠেস বা ফ্লাইং বাট্রেস

এসবের প্রধান নির্মাণ সামগ্রী পাথর। তবে হল্যান্ড এবং জার্মানীতে ইট ব্যবহার হয়েছে। ইটালীতে মার্বেল দিয়ে করা কিছু কাজের নমুনা পাওয়া যায়। ঢালু কাঠের ছাদ দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীকালে পাথরের তৈরি ধনুকাকৃতির ছাদ রোমানেস্ক স্থাপত্যে যোগ হয়। বাঁকানো ছাদের ভার বহন করার জন্য দেয়ালে বাড়তি ঠেস বা বাট্রেস (buttress) দেওয়া হয়। এই ঠেসের ডিজাইন পরে অন্যান্য রীতির প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়। যেমন, গথিক (Gothic) স্থাপত্যের ভবনে ব্যবহৃত হয় উড়ন্ত ঠেস বা ফ্লাইংবাট্রেস (flying buttress)। এর উজ্জ্বলতম নিদর্শন প্যারিসের

১৫৩ নটর্ ডেম ক্যাথিড্রাল, প্যারিস : গথিক স্থাপত্যের উড়ন্ত ঠেস

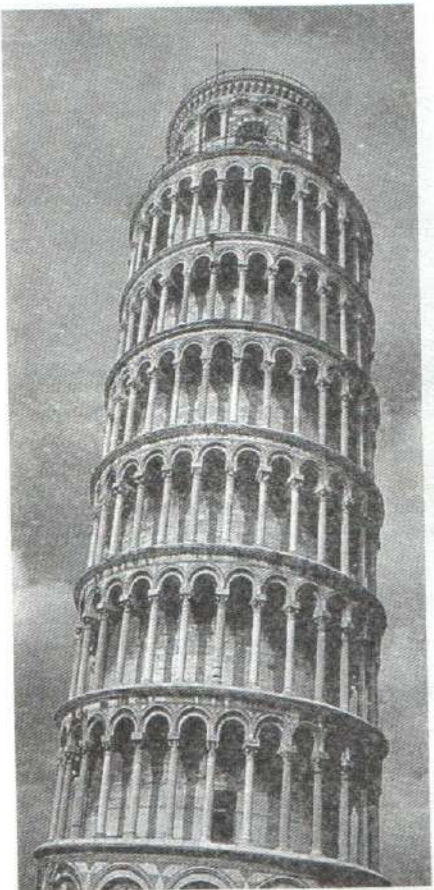

১৫৪ লিনিং টাওয়ার অব্ পিসা ⇧ ও সংলগ্ন ব্যাপটিস্ট্রি ⇩

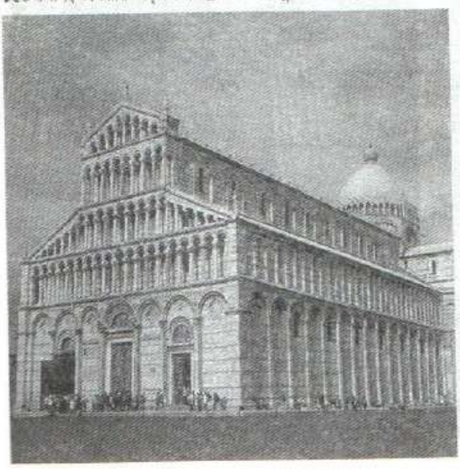

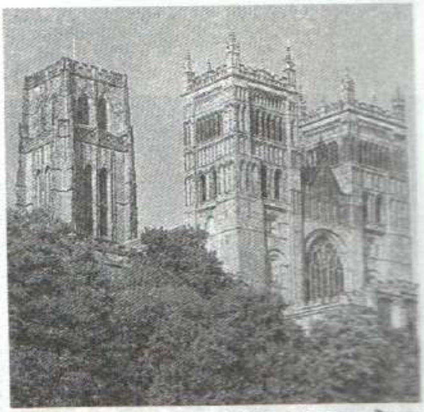

১৫৫ ডারহাম ক্যাসেল, ইংল্যান্ড

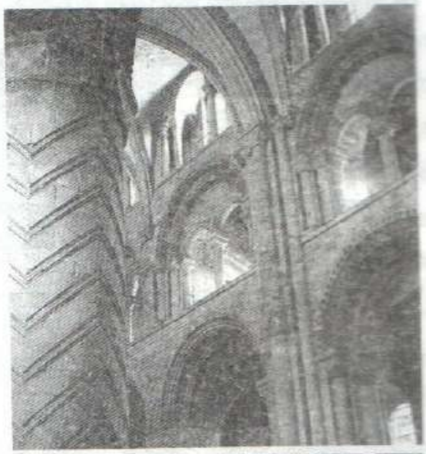

১৫৬ ডারহাম ক্যাসেল, অভ্যন্তর

নটর্ ডেম কাথিড্রাল (Notre Dame Cathedral) (১১৬৩-১২৫০)।

ইংল্যান্ডের ডারহাম ক্যাসেল (Durham Castle) (১০৯৩) এবং ইটালির বিখ্যাত লিনিং টাওয়ার অব্ পিসা (Leaning Tower of Pisa) ও সংলগ্ন গির্জা (১০৬৩-১৩১৪) রোমানেস্ক স্টাইলের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ডারহাম ক্যাসেলে অবশ্য পরবর্তী গথিক (Gothic) স্টাইলের কিছু বৈশিষ্ট্যের সংযোজন দেখা যায়।

গথিক (Gothic) স্টাইল

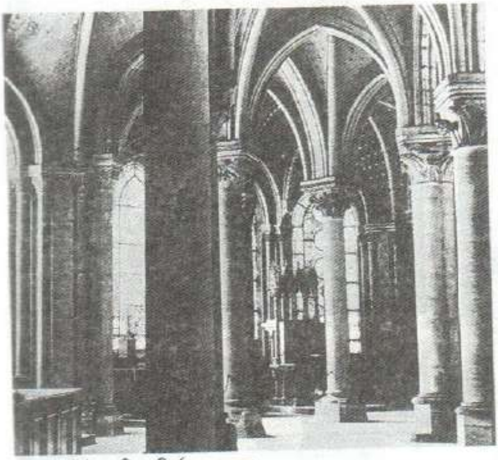

১৫৭ সেইন্ট ডেনি-র গির্জা : অভ্যন্তর

ইয়োরোপে রোমানেস্কের পরেই আসে নির্মাণ কৌশলে বিপ্লব সাধনকারী গথিক (Gothic) স্টাইল। প্যারিস হলো গথিক স্টাইলের জন্মস্থান। ফরাসি রাজধানীর অদূরে ১১৩৭ সালে সেইন্ট ডেনি (Saint Denis) নামক স্থানের ধর্মাশ্রম ও গির্জার পুনর্নির্মাণ শেষ করার মাধ্যমেই আবির্ভূত হয় বিশ্ব- নন্দিত গথিক স্টাইল।

মধ্যযুগীয় ফরাসিরা গথিক গির্জাকে স্বর্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে গণ্য করত, গির্জার সৌন্দর্যে খুঁজে পেতো ঐশ্বরিক সত্য, উপাসনালয়ের অলৌকিকতা প্রতিফলিত করত তাদের গভীর ধর্মীয় অনুভূতি।

সুচালো খিলান, দেয়ালের জন্য উড়ন্ত ঠেকনা বা ঠেস, শিরা সমেত ধনুকাকৃতির ছাদ ইত্যাদি রোমানেস্ক স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছ রঙ-মিশ্রিত জানালার কাচের সাথে সংযুক্ত করে গির্জার অভ্যন্তরে যে দিবালোকের নাচন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল সেই নতুন নন্দনতত্ত্বের নাম গথিক

১৫৮ গথিক খিলানসমূহ

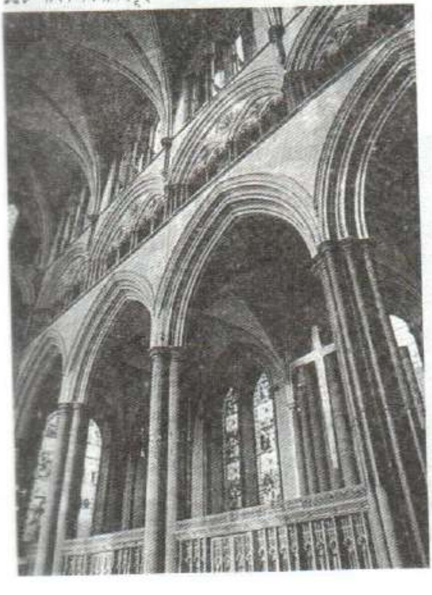

১৫৯ গথিক ভল্টসমূহ

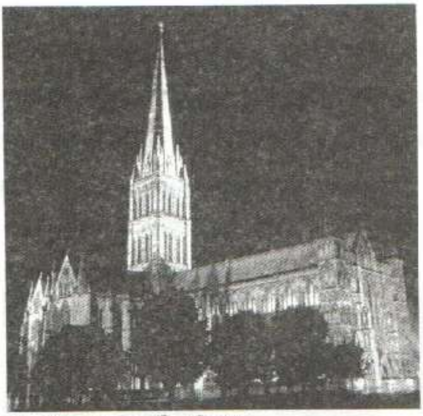

১৬০ *ইংল্যান্ডে সলস্‌ব্যারী কাথিড্র্যাল*

১৬১ *কেবল কলেজ, অক্সফোর্ড : পুনরুজ্জীবিত গথিক*

স্থাপত্য। এই স্থাপত্যরীতির জানালাগুলো ছিল সত্যিকার অর্থে দীর্ঘকায়।

১৬২ *মিলান ক্যাথিড্রাল*

সুচালো খিলান এবং উড়ন্ত ঠেস দ্বারা খোলামেলা উঁচু দালান নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল বলে মোটা, ভারী দেয়ালের প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। প্যারিসে নটর্ ডেম ক্যাথিড্রাল (Notre Dame Cathedral), ইংল্যান্ডে সলস্‌ব্যারী কাথিড্র্যাল (Salisbury Cathedral) (১২২০-৬০) এবং ইটালিতে মিলান ক্যাথিড্রাল (Milan Cathedral) (১৩৮৫-১৪৮৫) গথিক ধারায় নির্মিত গির্জাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সলস্‌ব্যারী কাথিড্রালের ৪০৬ ফুট উঁচু মোচাকার চূড়া বা স্পায়ার (spire) সমগ্র বিলেতে সবচেয়ে উঁচু।

নিত্যনতুনের এই যাত্রা হঠাৎ করে হোঁচট্ খেল ইটালীয় শহর ফ্লোরেন্সে (Florence)। অনুপ্রেরণার জন্য স্থাপত্য ফিরে গেলো প্রাচীন গ্রিসদেশীয় এবং রোমান সভ্যতায়। ১৫শ শতাব্দীর গোড়া হতে পরবর্তী দুইশত বছর যে স্টাইল দখল করল ইয়োরোপবাসীর মন মানসিকতা, তার নামকরণ করা হয়েছে রেনেসাঁ (Renaissance)।

১৬৩ ফ্লোরেন্স ক্যাথিড্রাল

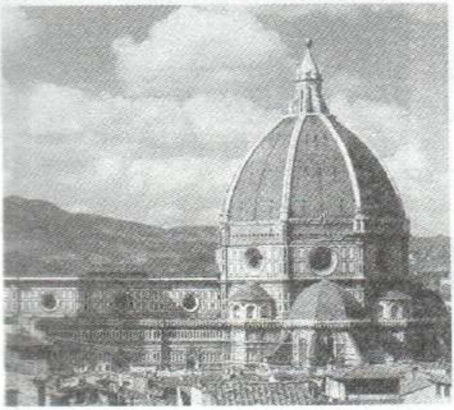

১৬৪ ব্রামান্তের ডিজাইনকৃত টেম্পিএটো

১৬৫ মানুষের শারীরিক গঠনের বিশ্লেষণ : লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি

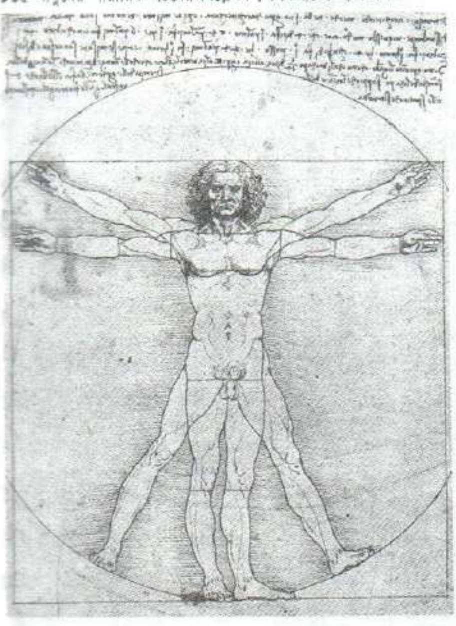

নবজাগরণের এই জোয়ার শুধু স্থাপত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সঙ্গীত এবং চিত্রকলাও সাম্প্রতিক ইতিহাসকে বিসর্জন দিয়ে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে লাগল প্রাচীনতম মূল্যবোধকে। চিত্রশিল্পী, শহর পরিকল্পনাবিদ, সাহিত্যিক, সঙ্গীতবিশারদ সবাই ছিলেন আদর্শের সন্ধানে মত্ত।

ভিট্রুভিয়াস (Vitruvius) নামে খ্যাত, রোমান স্থপতি ও প্রকৌশলী, মার্কাস ভিট্রুভিয়াস পোল্লিও (Marcus Vitruvius Pollio) (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ সাল) ডি আর্কিটেকটুরা (De Architectura) নামে একটি বই লিখেছিলেন।

তাঁর লেখা এবং শিক্ষা দ্বারা

ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয় এই আন্দোলন। মানুষের শারীরিক গঠন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবনের এক অংশের সাথে অপর অংশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ স্থানকে সুন্দর করে সাজানোর প্রতি রেনেসাঁ স্থপতিরা জোর দেন।

ফ্লোরেন্স শহরের ভিত্তি স্থাপনের পর রেনেসাঁ আন্দোলন রোমান ধর্মীয় যাজকদের পৃষ্টপোষকতা পায়। ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে রেনেসাঁর প্রভাব।

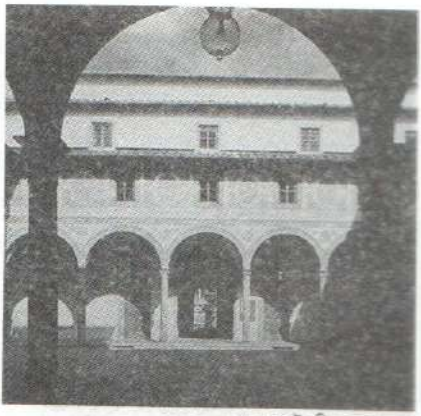

১৬৬ ফাউন্ডলিং হাসপাতাল

অনেকের মতে রেনেসাঁ স্থাপত্যের পথিকৃৎ ফিলিপ্পো ব্রুনেলেশ্চি (Filippo Brunelleschi) (১৩৭৭-১৪৪৬)। ফ্লোরেন্সে তাঁর ডিজাইনকৃত হাসপাতাল, অস্পেডাল ডেগলি ইন্নোসেন্টি (Ospedale degli Innocenti) (১৪১৯-৪৪) রেনেসাঁর সূচনাকালের একটি উল্লেখযোগ্য ভবন। রেনেসাঁ স্থাপত্যের অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে ফ্লোরেন্স শহরে ব্রুনেলেশ্চির ডিজাইনকৃত কাথিড্রালের গম্বুজ (১৪২০-৩৪) এবং লিওন বাত্তিস্টা অ্যালবার্টি (Leon Battista Alberti) (১৪০৪ -১৪৭২) ডিজাইনকৃত প্যালাজ্জো রুসেলাই (Palazzo Rucellai) (১৪৪৬-৫১)।

প্রথম দিকের রেনেসাঁ ভবনগুলো ছিল বিশাল, সাদামাটা, অনেকটা দুর্গের মতো দেখতে। অলঙ্করণ ছিল না বললেই চলে। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে পাথর দিয়ে ভবনের শোভা বৃদ্ধি করা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

১৬৭ লিওন বাত্তিস্টা অ্যালবার্টির রেনেসাঁ স্টাইলে সেইন্ট মারিয়া

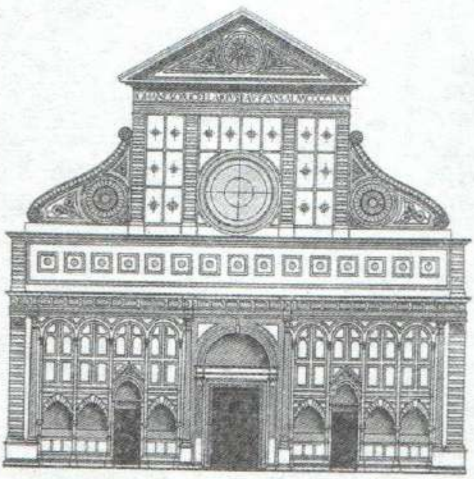

১৬৮ গ্র্যান্ড প্যালেস, ব্রাসেলস

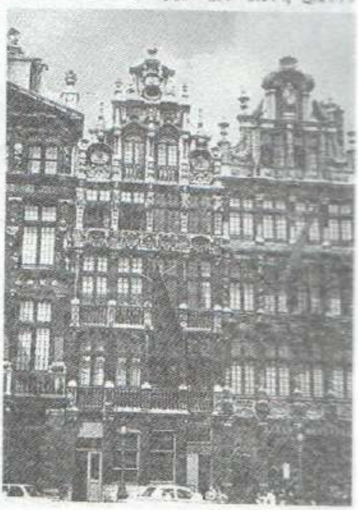

বারোখ (Baroque)

রেনেসাঁ স্টাইল ইটালিতে পূর্ণাঙ্গভাবে স্থাপিত হয়। ১৭শ শতাব্দীর অলঙ্কৃত এবং চমৎকার এই স্থাপত্যকর্মের নামকরণ করা হয় বারোখ (Baroque), ইটালির ভাষায় যার অর্থ কলঙ্কিত মুক্তা। বারোখের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইংরেজি "S" এবং "C" অক্ষরের মতো ভবনের অংশবিশেষ, যেন চলমান একটি বাঁকানো রেখা। তবে স্পেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সেও এই নাটকীয় স্টাইলের প্রভাব ছিল।

১৬৯ সান্তা মারিয়া ডেল্লা সালুট, ভেনিস

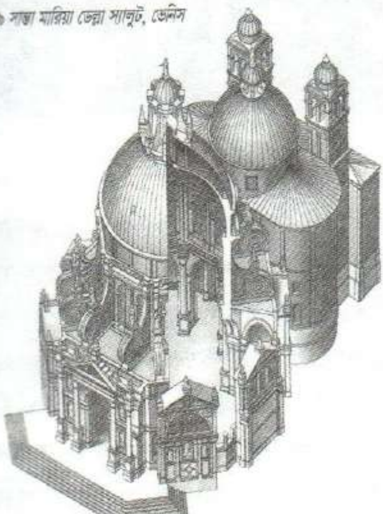

বারোখের মনোভাব বস্তুতপক্ষে কড়াকড়িভাবে প্রাচীনকে অনুসরণের বিপক্ষে ছিল। ভিট্রুভিয়াসের নিয়মানুবর্তীতার বিরুদ্ধে বারোখ্ ছিল একটি আন্দোলন। এমনকি প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের থামগুলো নতুন আকারে ব্যবহৃত হয়।

ডোনাটো ব্রামান্টে (Donato Bramante) (১৪৪৪-১৫১৪) দ্বারা ডিজাইন পরিকল্পনা শুরু হয় এবং প্রথমে মাইকেলেঞ্জেলো বুওনার্‌রটো (Michaelangelo Buonarroto) (১৪৭৫-১৫৬৪) ও পরবর্তীতে গিওভান্নি লরেঞ্জো বারনীনি (Giovani Lorenzo Bernini) (১৫৯৮-১৬৮০) কর্তৃক সম্পন্ন রোমের নতুন সেইন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল

১৭০ সেইন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল, রোম

১৭১ বারনীনির সান্তা আন্দ্রিয়া আল কিরিনাল, রোম

১৭২ ফরাসী বারোখ স্টাইল: লো ইনভালিডস-এর গির্জা

(Saint Peter's Cathedral) (১৫০৬-১৬২৬) রেনেসাঁ স্থাপত্যে তথা বারোখ স্টাইলের অন্যতম নিদর্শন। জেনে রাখা ভালো যে, মাইকেলেঞ্জেলো মূলত ক্যথিড্রালটির গম্বুজ এবং বারনীনি অভ্যন্তরের ও বিশাল গণ-চত্বরের পরিকল্পনা করেন।

বারোখ স্টাইলে নির্মাণ সামগ্রীতে নতুন কোনো উপাদান ছিল না। দুঃখজনক ঘটনা হল রোমে মার্বেল পাথরের অভাব না থাকা সত্ত্বেও রেনেসাঁ আমলে প্রাচীন রোমের স্থাপত্যকীর্তি ধ্বংস করে সেখান থেকে মার্বেল পাথর লুট করা হয়।

১৭৩ সেইন্ট পিটারস ক্যথিড্রাল : অভ্যন্তর

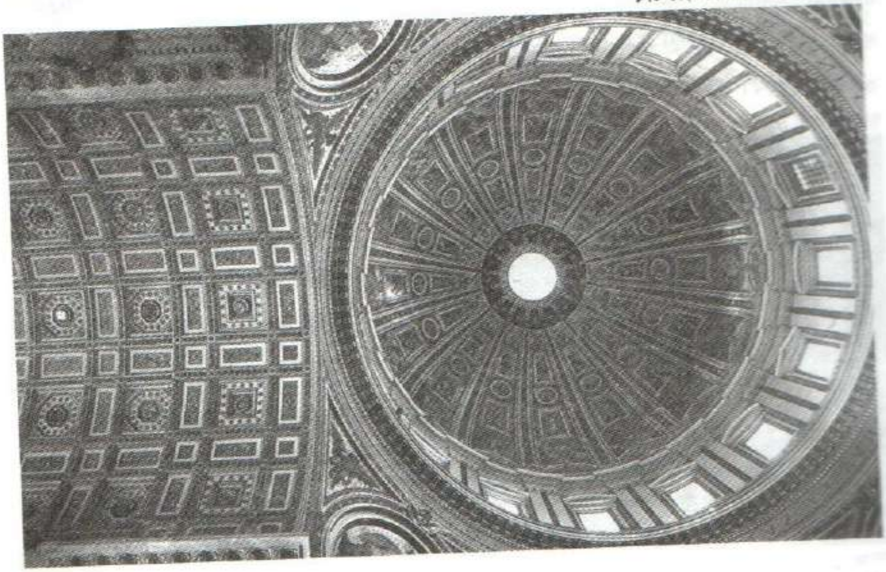

রোকোকো (Rococo)

রোমানদের বারোখ্ স্টাইলকে ফ্রান্সে রোকোকো (Rococo) নামকরণ করা হয়। ফরাসি ভাষায় রোকোকো মানে সামুদ্রিক পাথর ও খোল। ফরাসিদের বিচিত্র আকৃতির ইমারতের জন্য উদ্ভট এই ধরনের সমুদ্র সৈকতের অলঙ্করণ মানানসই ছিল। তবে দক্ষিণ জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার গির্জা পর্যন্ত এর প্রভাব ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ঢালু ছাদের ভিতর দিয়ে ডর্মার (dormer) নামক জানালা, অশ্বখুরাকৃতির (horseshoe) সিঁড়ি এবং প্রাসাদের সৌন্দর্যকে বাইরে প্রদর্শন করা ছিল রোকোকোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

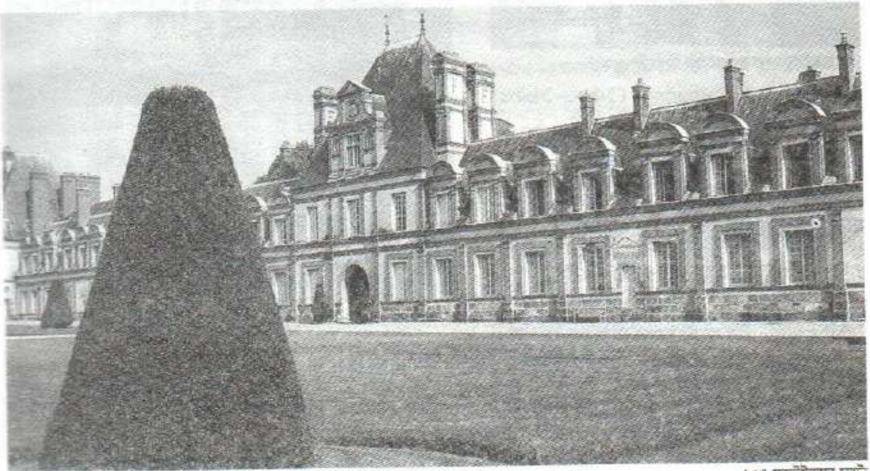

১৭৪ ফন্টেইনব্ল্যুর স্যাট্যু

ফন্টেইনব্ল্যুর স্যাট্যু (Chateau de Fontainebleau) বা রাজপ্রাসাদ (১৫২৮-৪০) এবং বিশ্বনন্দিত ভারসাই প্যালেস (Versailles Palace) বা রাজপ্রাসাদ (১৬৬৬-৭৪) রোকোকোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারসাই প্যালেস-এর মূল স্থপতি ছিলেন জুলস্ হার্ডউইন ম্যানসার্ট (Jules Hardouin Mansart)। তবে ২য় লু'ই লে ভ' (Louis II Le Vau) (১৬১২-৭০) বাগান সংলগ্ন ভবনটির উপর কাজ করেছিলেন। এছাড়া চার্লস লেবরুন (Charles Lebrun) (১৬১৯-৯০) গ্যালারির (gallery) নক্শায়, ক্লদ পেরো (Claude Perrault) (১৬১৩-৮৮) এবং বারো শত ঝর্নার বাগানের ডিজাইনে আঁদ্রে লে নথ (André Le Nôtre) (১৬১৩-১৭০০) কাজ করেছেন।

১৭৫ চিজউইক হাউস : রোকোকো স্টাইল

১৭৬ ভার্সাই প্রাসাদ

প্যারিসের নতুন শহর তৈরির সময় এবং ওয়াশিংটন নগর পরিকল্পনায় আঁদ্রে লে নথ ডিজাইনকৃত ভারসাই-এর বাগানের নক্‌শা অনুকরণ করা হয়।

প্যালাডিয়ানিজম (Palladianism)

প্রাচীন রোমের স্থাপত্য এবং রোমের রেঁনেসার আমলের কাজ ইটালির ভিসেন্‌জা (Vicenza) শহরবাসী আন্দ্রিয়া প্যালাডিও (Andrea Palladio) (১৫০৮-১৫৮০) নামক জনৈক স্থপতিকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। রেনেসাঁর বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীন রোমান স্থপতি ভিট্রুভিয়াসের (Vitruvius) (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ সাল) গাণিতিক তত্ত্বের সমন্বয়ে প্যালাডিও সৃষ্টি করলেন তাঁর নিজস্ব স্টাইলের স্থাপত্য। প্যালাডিয়ানিজম (Palladianism) নামে পরিচিত ভবন, সেতু, খিলান, ইত্যাদি কাজের বিবরণ তাঁর লেখা বইয়ে প্রকাশিত হয়।

১৭৭ প্যালাডিওর সেতু

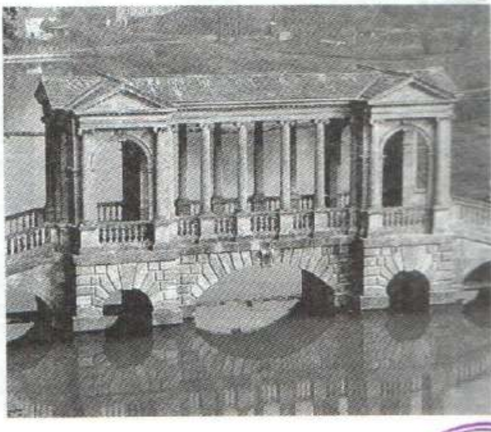

প্যালাডিওর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ সম্ভবত ভিসেন্‌জায় অবস্থিত ভিলা রটুন্ডা (Villa Rotunda) বা কাপরা (১৫৫০)। ইটের তৈরি

৮১

প্লাস্টারকৃত ভবনটি ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় ব্যাপকভাবে অনুকরণ করা হয়েছে। অনেকটা রটোন্ডার মতো করেই ইটালির রভিগো (Rovigo) শহরে প্যালাডিও ভিলা বাদো'র (Villa Badoer) (১৫৫৪) ডিজাইন করেন, তবে এখানকার সিঁড়িটা যেন আরো রাজকীয়। প্রবেশপথের দুই পাশের অনাড়ম্বর দেয়ালে সুষম জানালা আধুনিকত্বের ছাপ বহন করে।

১৭৮ প্যালাডিওর ভিলা কাপরা

১৬১৩ সালে রোম সফরকালে বৃটিশ স্থপতি ইনিগো জোন্স (Inigo Jones) (১৫৭৩-১৬৫২) প্যালাডিওর স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হন। জোন্স বৃটেনে প্যালাডিওর চিন্তাধারা প্রবর্তন করলেও আরো অনেক পরে ১৭২০ হতে ১৭৬০ সালের দিকে সত্যিকার অর্থে প্যালাডিয়ানিজম ঐ দেশের স্থাপত্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজ স্থপতি স্যার খ্রিস্টফার রেন (Sir Christopher Wren) (১৬৩২-১৭২৩) ইনিগো জোনেসের প্রবর্তিত স্টাইলের বৈশিষ্ট্যগুলো এবং রোকোকোর গুণাবলির

১৭৯ ইনিগো জোন্স : ব্যানকোয়েটিং হাউস, হোয়াইট হল, ইংল্যান্ড

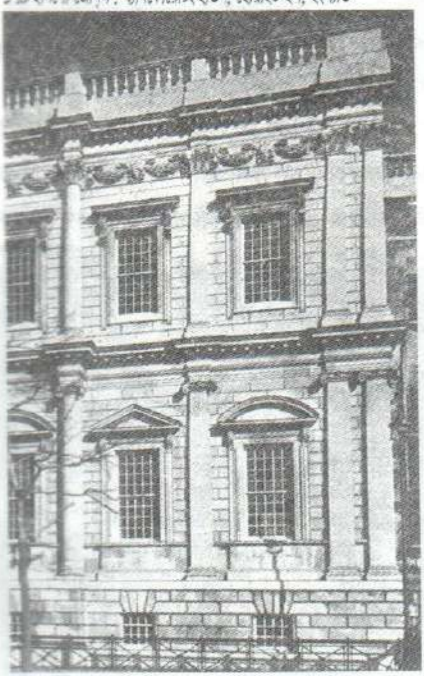

১৮০ খ্রিস্টফার রেন : হ্যাম্পটন কোর্ট

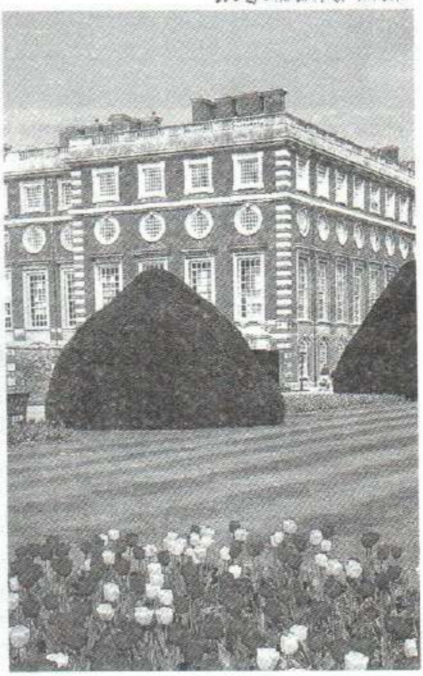

সমন্বয়ে লন্ডনে অসংখ্য ইমারত, বিশেষ করে গির্জা, নির্মাণ করেন; সেইন্ট পলস ক্যাথিড্রাল (Saint Paul's Cathedral) (১৬৭৫-১৭১০) সেগুলির মধ্যে অন্যতম।

১৮১ সেইন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, লন্ডন

ইকোলে দ্য বজ-আর্টস (Ecole de Beaux-Arts)

১৬৭১ সালে স্থাপিত প্যারিসের আকাদমি দ্য আর্কিটেকচার (Académie d'Architecture)-কে পুনর্গঠিত করে ১৮১৬ সালে ইকোলে দ্য বজ-আর্টস (Ecole de Beaux-Arts) নামে যে স্থাপত্যের স্কুল স্থাপন করা হয় তা ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে সমগ্র বিশ্বে স্থাপত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত ছিল। ১৯৬৮ সালে ছাত্রদের প্রতিবাদের আগ পর্যন্ত দেড় শত বছরের বেশি সময় প্রায় একই শিক্ষাপদ্ধতি এখানে প্রচলিত ছিল। যদিও বা বারোখ (Baroque) এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত রীতি তাদের চর্চার বিষয়, তথাপি ইকোলে-এর অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা নতুন ভাবে সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছিল।

মজার ব্যাপার হল স্থাপত্যের এই স্কুলে ডিজাইন শিক্ষা দেওয়া হতো না; ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত স্টুডিওতে ছাত্ররা ডিজাইন ও অঙ্কনের উপর শিক্ষা লাভ করত। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আনেকেই ইকোলে-এর শিক্ষক ছিলেন। তবে ইকোলে-এর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের মধ্যে ডিজাইন প্রতিযোগিতা হতো। আধুনিক আন্দোলনের স্থপতিরা ইকোল্‌কে কটাক্ষ করলেও বহু দিন যাবৎ এর প্রভাব

অব্যাহত ছিল। পরবর্তী আর্ট ডেকো (Art Deco) স্টাইলের সাথে ইকোলে-এর সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি লে কর্বুসিয়্যের (Le Corbusier) (১৮৮৭-১৯৬৫), লুই আই, কা'ন (Louis I. Kahn) (১৯০১-৭৪) এবং রবার্ট ভেন্চুরি (Robert Venturi) (১৯২৫-) ইকোলে-এর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শিল্প বিপ্লব

১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বৃটেনের মাটিতে এক অসাধারণ বিপ্লব ঘটে। একটার পর একটা যন্ত্র বা প্রযুক্তি আবিষ্কার হতে থাকে। যেমন ১৭১৩ সালে লোহা তৈরি করতে আব্রাহাম ডারবী (Abraham Darby) (১৭১১-৬৩) কর্তৃক কাঠের বদলে কয়লা ব্যবহার, ১৭৩৩ সালে জে. কেই'র (J. Kay) ফ্লাই শাটল্ (Fly Shuttle), ১৭৪০ সালে বেন্জামিন হান্টস্ম্যানের (Benjamin Huntsman) স্টিল তৈরির পদ্ধতি, ১৭৬৪ সালে হারগ্রিভজের্ (Hargreaves) স্পিনিং জেনি (Spinning Jenny), ১৭৬৫ সালে জেমস ওয়াটের (James Watt) স্টিম বয়লার (Steam Boiler), ১৭৬৯ সালে রিচার্ড আর্করাইটের

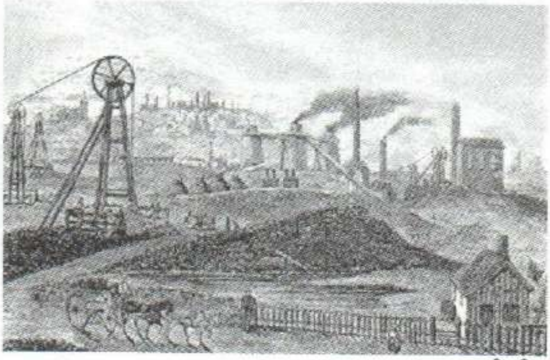

১৮২ শিল্প-বিপ্লব

(Richard Arkwright) স্পিনিং হুইল (Spinning wheel), ১৭৮৫ সালে পাওয়ার লুম (Power Loom), ১৮১০ সালে ব্লাস্ট ফারনেইস (Blast Furnace), ১৮২৫ সালে রেলওয়ে ইনজিন (Railway Engine), ১৮৫৬ সালে বেসিমার (Bessemer) কর্তৃক স্টিল (steel) বা ইস্পাত তৈরি ইত্যাদি।

১৮৩ ১৮শ শতাব্দীর বিলেতে বস্ত্র শিল্পের কারখানা

কল-কারখানার বদৌলতে লোহা এবং পরে ইস্পাত ব্যাপক পরিমাণে তৈরি করা সম্ভব হয়। নতুন এই নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা অভিনব কৌশলে তৈরি হলো ব্রিজ, কারখানা ইত্যাদি। এই জাগরণের নাম শিল্প-বিপ্লব, ইংরেজিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলুশন (Industrial Revolution)। ১৭৭৯ সালে বিলাতের সেভের্ন (Severn) নদীর উপরে কোলব্রুকডেইলে (Coalbrookdale) কাস্ট আয়রন (cast iron) দিয়ে তৈরি হয় আয়রন ব্রিজ (Iron Bridge)। একশত ফুট দীর্ঘ

এই সেতু প্রযুক্তির জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একই সময়ে বস্ত্র শিল্পের কারখানায় পানি প্রবাহ দ্বারা চালিত যন্ত্রের শক্তি বিতরণ করার সুবিধার্থে যে বহুতল ভবন প্রয়োজন হয়ে পড়ল সেগুলো লোহার থাম ও বিমের মাধ্যমে সম্ভবপর হয়। এই সকল বহুতল কারখানাকে বিংশ শতাব্দীর গগনচুম্বী ইমারতের পূর্বসূচনা হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৮৪ ক্রিস্টাল প্যালেস

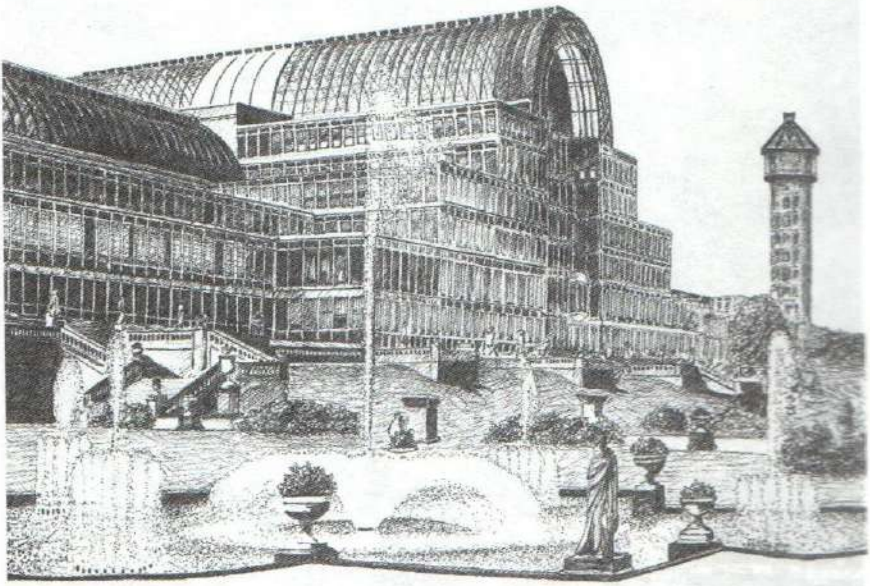

শিল্প-বিপ্লবের দালানগুলো ব্যবহারিক দিকে অধিক জোর দিত; সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেবার সুযোগ ছিল না। লোহা ও ইস্পাতের কারণে এক থাম হতে আরেক থামের দূরত্ব বাড়তে থাকে। জানালার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবনের অভ্যন্তরে দিনের আলো সহজেই প্রবেশ করে।

১৮৫ আয়রন ব্রীজ

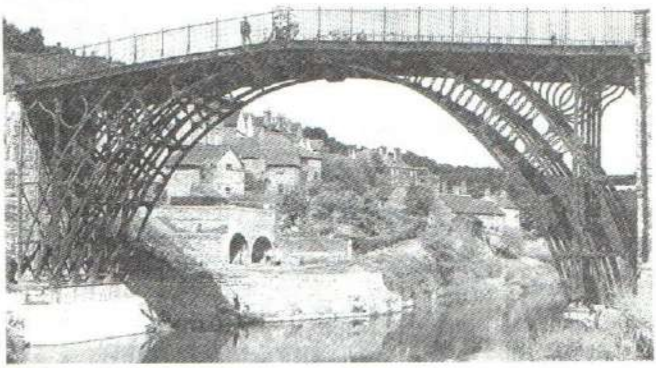

স্যার জোসেফ প্যাক্সটন(Sir Joseph Paxton) ডিজাইনকৃত লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেস (Crystal Palace) (১৮৫১) এবং আলেক্জান্ডার গুস্টাভ (Alexander Gustav) ডিজাইন-

কৃত প্যারিসের আইফেল টাওয়ার (Eiffel Tower) (১৮৮৯) শিল্প-বিপ্লবে অর্জিত প্রযুক্তির স্বাভাবিক প্রয়োগ ও সফল পরিণতি।

১৮৬ প্যারিসের আইফেল টাওয়ার

পুরানো সেই দিন

এতসব অগ্রগতির ভিড়ে মাঝে-মধ্যেই আবার পুরোনোতে ফিরে যাবার প্রবণতা স্থাপত্যের ইতিহাসে সব সময়ই ছিল।

জন ন্যাশ (John Nash) (১৭৫২-১৮৩৫) তথাকথিত ভারতীয় গথিক স্টাইলে বিলেতের রাজ পরিবারের জন্য ডিজাইন করেন ব্রাইটন প্যাভিলিয়ন (Brighton Pavilion) (১৮১৫)। এর অভ্যন্তরে চীনা স্থাপত্যের আভাস পাওয়া যায়। ন্যাশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ব্রিস্টলের নিকট রোমাঞ্চকর গ্রামীণ বাড়ি ব্লেইজ হ্যামলেট (Blaise Hamlet), যেখানে প্রকাশ পায় গ্রামের শান্ত পরিবেশ, দারিদ্র নয়।

শুধুমাত্র গথিক স্থাপত্যই খ্রিষ্টান ধর্মের প্রকৃত স্থাপত্য, ধার্মিক অগাস্টাস পিউজিন

১৮৭ বৃটিশ পার্লামেন্ট হাউজ

(Augustus Pugin) (১৮১২-১৮৫২) এই বিশ্বাসে গথিক মূল্যবোধ সফলতার সাথে পুনরায় স্থাপন করেন। স্যার চার্লস ব্যারির (Charles Barry) (১৭৯৫-১৮৬০) সাথে জোট বেঁধে পিউজিন লন্ডনে বৃটিশ পার্লামেন্ট হাউজ (Parliament House) (১৮৩৯-৫২) ডিজাইন করে গথিক স্থাপত্যের পুনর্প্রচলন করেন।

১৮৮ ব্রাইটন প্যাভিলিয়ন

অন্যদিকে স্যার উইলিয়াম চেম্বার্স (Sir William Chambers) লন্ডনের কিউ গার্ডেন্স (Kew Gardens) (১৮৪৫-৪৭)-এ এক প্যাগোডা নির্মাণ করে বসেন।

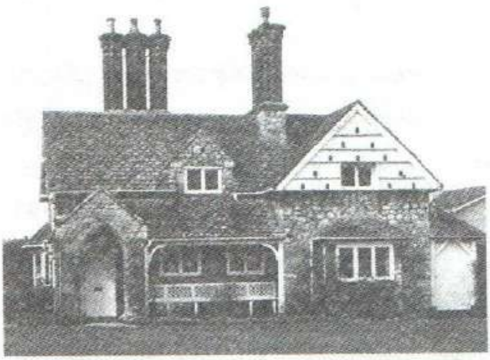

১৮৯ ব্রিস্টলের নিকট ব্লেইজ হ্যামলেট

এই সকল স্থপতি বিদেশী স্টাইল অনুকরণ করে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেও তাঁদের কোনো কর্মই কোনো স্টাইলের সত্যিকার অর্থে পুনর্প্রচলন নয়; পুরানো নিয়ে রহস্য করা মাত্র।

দি আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ মুভমেন্ট
(The Arts and Crafts Movement)

শিল্প-বিপ্লবের যান্ত্রিক যুগের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে দি আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ মুভমেন্ট (The Arts and Crafts Movement)। উইলিয়াম মরিস (William Morris) (১৮৩৪-১৮৯৬) ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবর্তক। তিনি মূলত কোনো স্থপতি ছিলেন না। অলঙ্করণ, অভ্যন্তরীণ নক্শা এবং প্রাচীন ইমারত সংরক্ষণে মরিসের ভূমিকা প্রশংসনীয়। হস্তশিল্পের মাধ্যমে আসবাবপত্র, স্বচ্ছ রঙমিশ্রিত কাচ বা স্টেইন্ড

গ্লাস (stained glass), দেয়ালপত্র, শোভা - বর্ধনকারী বস্ত্র, ইত্যাদি তৈরি করে এই আন্দোলন সরাসরি যন্ত্রাদির সাহায্যে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। মেশিন ছিল এদের শত্রু। মরিস ব্যক্তিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল শিল্পকর্ম এবং চারুকলা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এবং তা মানুষের জন্য। তবে এই আন্দোলন বসবাস উপযোগী সাধারণ ঘর-বাড়ির মধ্যে সীমিত ছিল। কারণ বিপণনের ক্ষেত্রে হস্তশিল্প শিল্প-বিপ্লবের ফসল যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি দ্রব্যের সাথে কিছুতেই পেরে উঠছিল না।

১৯০ উইলিয়াম মরিস-এর রেড হাউস

শিকাগো স্কুল

আমেরিকার শিকাগো মহানগরীতে ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে ইট-পাথরের গুরুত্ব কমিয়ে অদাহ্য লোহার থামের কাঠামো দ্বারা বেশ কিছু অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়। লোহার থামগুলোকে কংক্রিট কিংবা পোড়ামাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। দালানের কাঠামো পরিষ্কারভাবে বোঝা যেত। সর্বত্র একই ধরনের

১৯১ শিকাগো স্কুলের ধারায় ডিজাইনকৃত ভবন

জানালার পুনরাবৃত্তি কাঠামোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটিয়ে তুলত। সেই আমলে নির্মিত অলঙ্কারবিহীন এবং ইতিহাসের সাথে সম্পর্কহীন ভবনগুলোকে শিকাগো স্কুলের (Chicago School) অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। এই ধারায় সেইন্ট

লুই'তে (Saint Louis) স্থপতি লু'ই সুলিভান (Louis Sullivan) (১৮৫৬-১৯২৪) ডিজাইনকৃত ভাইনরাইট বিল্ডিং (Wainwright Building) (১৮৯০-৯১) আধুনিক স্থাপত্যের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

১৯২ ভাইনরাইট বিল্ডিং

আর্ট নূভ্য (Art Nouveau)

১৯৩ আর্ট নূভ্য : প্যারিসে পাতাল রেলের প্রবেশ পথ

১৮৯৫ সালে প্যারিসের আর্ট নূভ্য (Art Nouveau) নামক দোকানে গৃহকার্যের আধুনিক সব সামগ্রী বিক্রি হতো। সেই দোকানের নামেই নামকরণ করা হয়েছে স্থাপত্যের ইতিহাসে আরো একটি উল্লেখযোগ্য শৈলী "আর্ট নূভ্য"। এই আন্দোলনের প্রধান নির্মাণ সামগ্রী ছিল লোহা এবং কাচ, যা প্রথমদিকে অলঙ্করণের জন্য প্রয়োগ হলেও পরবর্তীকালে কাঠামো তৈরিতে ব্যবহার হয়। ইতিহাসের প্রতি মাত্রাধিক্য নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে, গাছপালা ও সামুদ্রিক জীবজন্তুর আকার-

১৯৪ অটো ওয়াগনার : মাজোলিকাহস, ভিয়েনা

১৯৫ লুই সুলিভান এর কাজ

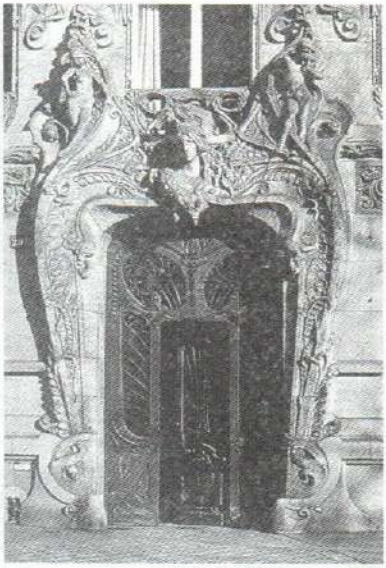

১৯৬ ফরাসি আর্ট নূভ্য : জেমস্ ল্যাভিরটি

আকৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে "আর্ট নূভ্য" আবির্ভূত হয়। বাঁকানো রেখা একে অপরকে ছেদ করে যে অভিনব নক্‌শা সৃষ্টি করছে সেটাই হচ্ছে "আর্ট নূভ্যর" অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

"আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস" আন্দোলনও এই স্টাইলকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। মরিসের আন্দোলনের মতো এই স্থাপত্য শৈলী ও গার্হস্থ্য স্থাপত্যের মধ্যে কতকটা সীমিত।

স্পেনবাসী স্থপতি অ্যান্টনি গ'ডির (Antoni Gaudi) (১৮৫২-১৯২৬) সাগ্‌রাদা ফ্যামিলিয়া (Sagrada Familia) (১৯৩০) নামক গির্জা, এবং কাসা মিলা (Casa Mila) (১৯০৫) ও কাসা বাট্‌লো (Casa Batllo)

১৯৭ অ্যান্টনি গ'ডির কাসা বাট্‌লো

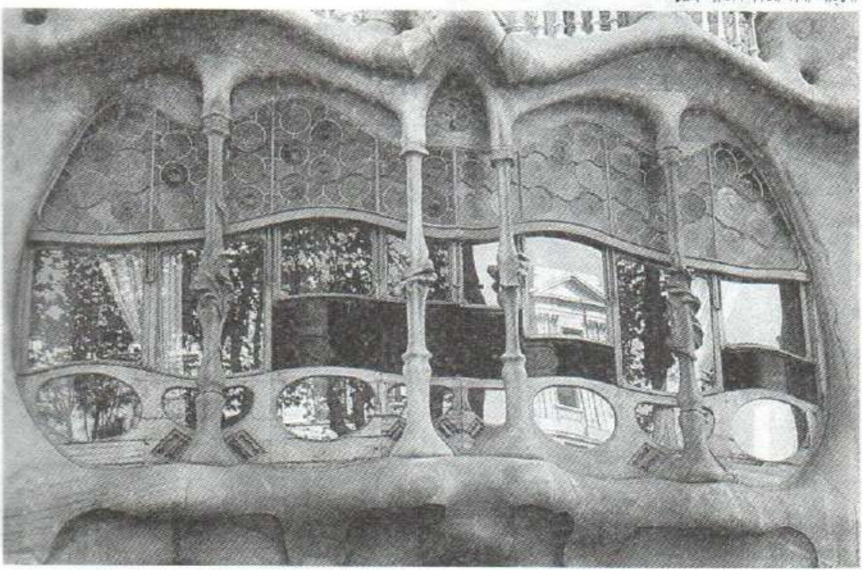

(১৯০৫) নামধারী বিলাসবহুল বহুতল বাসভবন ইত্যাদি উদ্ভট ভবন বার্সেলোনার দিগন্তে আর্ট নূভ্যর স্বাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯৮ গির্জার নাম সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়া

১৯৯ অ্যান্টনি গডির কাসা মিলা

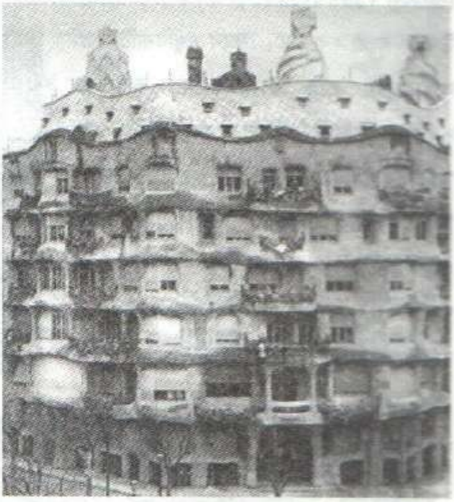

খুব অল্প সময়ের জন্য এসেছিল আর্ট নূভ্য; ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অর্গানিক স্থাপত্য (Organic Architecture)

আমেরিকান স্থপতি লু'ই সুলিভান (Louis Sullivan) (১৮৫৬-১৯২৪) পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করে এই মতে উপনীত হয়েছিলেন যে, জীবন স্বীকৃতি পায় তার প্রকাশে এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্য থেকেই আকার সৃষ্টি। ঐ দর্শনের উপর ভিত্তি করে সুলিভান এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, সমস্যার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে এর সমাধান। তাই জ্যামিতি বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বস্তুর আকার নির্ধারণ হবে না; কারণ সমস্যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রয়োজনীয় আকার। সুলিভানের মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমেরিকার বরেণ্য স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট (Frank Lloyd Wright) (১৮৬৭-১৯৫৯) ঘোষণা করেন যে, ব্যবহারের উদ্দেশ্য এবং আকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটি বোঝাবার জন্য তিনি "অর্গানিক আর্কিটেক্চার" (Organic Architecture) প্রবচনটির প্রচলন করেন।

রাইটের মতে - একটি স্থানকে বিভিন্ন বস্তু বা খোলা জায়গা সমেত সাজাবার সাথে জীবন্ত অগ্রগতি ও উদ্দেশ্য হাসিল করার সম্পর্ক আছে। তাই বস্তুর আকার খুঁজতে হলে তা পরিবেশের সাথে

সামঞ্জস্য রেখেই করতে হবে।

জার্মান স্থপতি হুগো হ্যারিং (Hugo Häring) (১৮৮২-১৯৫৮) একই চিন্তাধারার উপর কাজ করেন। তবে খুঁটিনাটি ও অলঙ্করণের প্রতি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের দুর্বলতার তিনি বিরোধিতা করেন। হ্যারিং-এর মতে ভবন হলো মানুষের হাতিয়ার যার আকার নির্ভর করবে ভবনের উদ্দেশ্যের উপর। পরবর্তীকালে ফিনল্যান্ডের স্থপতি আলভার আলটো (Alvar Aalto) (১৮৯৮-১৯৭৬), আমেরিকার লু'ই আই. কা'ন (Louis I. Kahn) (১৯০১-৭৪) এবং অন্যান্য স্থপতি হ্যারিং-এর মতবাদ অনুসরণ ও সমর্থন করেন।

এই স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী সমগ্র বস্তুর সাথে এর অংশগুলোর সম্পর্ক থাকবে, তবে অংশগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও থাকবে। সর্বোপরি পরিবেশের সাথে সৃষ্ট বস্তুর সামঞ্জস্য থাকতে হবে। বিগত দিনে তো বটেই, বর্তমান প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, পরিবেশে রয়েছে শিক্ষামূলক অনেক কিছু। পরিবেশ হতে প্রাপ্ত আকার দিয়ে সৃষ্ট স্থাপত্যের জন্য অতি সম্প্রতি জার্মানীর ফ্রাই অটো (Frei Otto) (১৯২৫-) বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন।

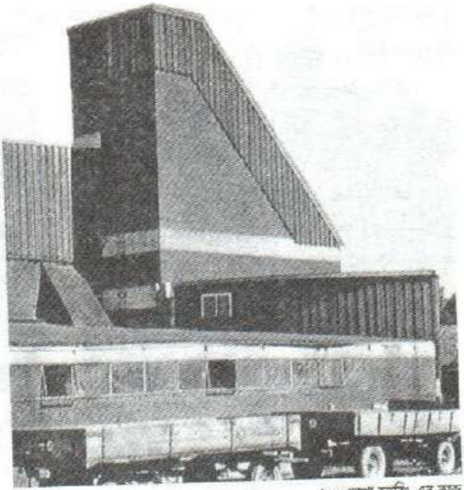

২০০ হুগো হ্যারিং-এর কাজ

২০১ আলভার আলটোর কাজ

ফাংশনালিজ্‌ম (Functionalism)

ভবনের ব্যবহার বা উদ্দেশ্য হতে ভবনের আকার নির্ধারণ হওয়ার নামই ফাংশনালিজ্‌ম (Functionalism)। যদিও বা আদিকাল হতে এটাই ছিল নির্মাণ শিল্পের ধর্ম তথাপি অলঙ্করণের দাপটে এই নীতি অনেকটা হারিয়ে গিয়েছিল। ভিট্রুভিয়াস (Vitruvius) বলেছিলেন ভবনের উদ্দেশ্য হতেই এর কাঠামো বেরিয়ে আসবে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে ফাংশনালিজ্‌মের পক্ষে কয়েকজন স্থপতি মতামত ব্যক্ত করেছেন।

তবে লু'ই সুলিভানকে (Louis Sullivan) (১৮৫৬-১৯২৪) আধুনিক ফাংশনালিজ্‌মের প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুলিভান, ১৮৯৬ সালে লেখা এক রচনার মাধ্যমে, "ফর্ম ফলোজ ফাংশন" (Form follows Function) উক্তিটি জনপ্রিয় করেছিলেন; অর্থাৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হতেই ভবনের আকার সৃষ্ট। বিংশ শতাব্দীর পরস্পরবিরোধী একাধিক রীতি ফাংশনালিজ্‌মের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়েছে। এর কারণ, উদ্দেশ্য ব্যতীত ভবন হতে পারে না। তবে দেখা যাবে প্রায় সব ক্ষেত্রে সরাসরি শুধুমাত্র উদ্দেশ্য হতে ভবনের সম্পূর্ণ আকার নির্ধারণ হয়নি। এখানেই ফাংশনালিজ্‌ম এবং বিংশ শতাব্দীর অন্য এক রীতি র‍্যাশনালিজ্‌মের (Rationalism) মধ্য পার্থক্য; যদিও বা একটা আর একটার প্রতিশব্দ হিসেবে ভুল করে হলেও ব্যবহৃত হয়েছে।

২০২ লু'ই সুলিভান : গ্যারান্টি ভবন, নিউ ইয়র্ক ⇧ ভবনের অলঙ্করণ ⇨

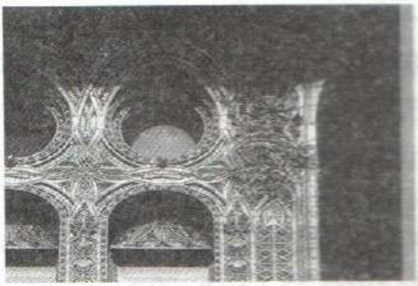

র‍্যাশনালিজ্‌ম (Rationalism) *বা যুক্তিবাদ এবং মডার্ন ম্যুভমেন্ট* (Modern Movement)

যুক্তির মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব এমন বিশ্বাস স্থাপত্যের সূচনা হতেই বিদ্যমান। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যুক্তিবাদ বা র‍্যাশনালিজ্‌ম (Rationalism) গুরুত্ব লাভ করে। ব্যবহারের উপযোগিতাসহ দর্শন, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং অর্থবহ প্রতীক ব্যবহার এই রীতির আওতাধীন ছিল।

র‍্যাশনালিজ্‌মের বাহকগণ উপলব্ধি করেন যে, উন্নত সমাজ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন উন্নত স্থাপত্য। তাঁদের মতে স্থাপত্য কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়; বরং তা সমষ্টিগত ও সামাজিক একটি ব্যবস্থা। স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য শুধু কয়েকটি ভবনে সীমাবদ্ধ নয়; সমগ্র নগরীর উপর নির্ভরশীল। স্থাপত্য জাতিভিত্তিক নয়, আন্তর্জাতিক। নগর পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও শিল্পভিত্তিক ডিজাইনের সমন্বয়ে সামাজিক অগ্রগতি অর্জন এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, মিতব্যয়িতা, নগর পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং যুক্তির মাধ্যমে ভবনের আকার নির্ধারণ র‍্যাশনালিজ্‌মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২০৩ ভিক্টর হোরতা ডিজাইনকৃত ভবন, ব্রাসেল্‌স

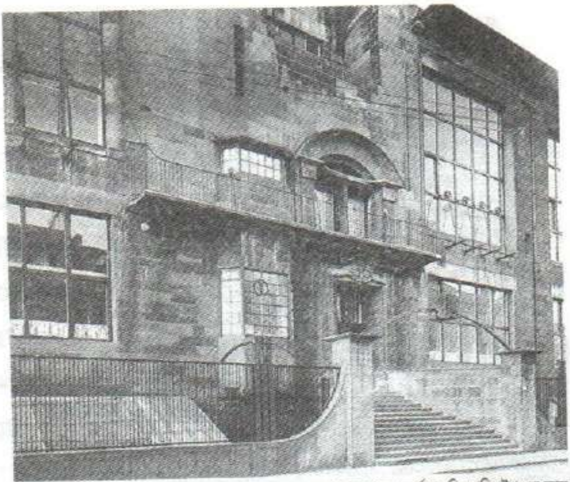

২০৪ গ্লাসগোতে চার্লস রেনি ম্যাকিন্‌টশ এর কাজ

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইয়োরোপীয়রা নতুন প্রযুক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মডার্ন ম্যুভমেন্ট (Modern Movement) প্রবর্তন করে। আর্ট নূভ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্রাসেল্‌সে (Brussels) ভিক্‌টর হোরতা (Victor Horta) (১৮৬১-১৯৪৭), গ্লাসগোতে (Glasgow) চার্লস রেনি ম্যাকিন্‌টশ (Charles Rennie Mackintosh) (১৮৬৮-১৯২৮) এবং সমসাময়িক স্থপতিদের কল্পনাপূর্ণ সৃজনশীলতা ক্রমশ মডার্ন ম্যুভমেন্টের জন্য জায়গা করে দেয়।

আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত মডার্ন স্টাইলের যুগে ভবনের রঙ সাধারণত সাদা হতো। এজন্য ইস্পাত দ্বারা নির্মিত অনেক ভবনই কংক্রিট দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। সামগ্রীর সত্য রূপ প্রকাশ করাটাই যেহেতু এই স্টাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অতএব স্থপতি লুডভিগ মিজ্‌ ভ্যান্‌ ডার রোহ্‌ (Ludwig Mies van der Rohe)

২০৫ মিজ্‌ ভ্যান ডার রোহ্‌ : জার্মান প্যাভিলিয়ন, বার্সেলোনা

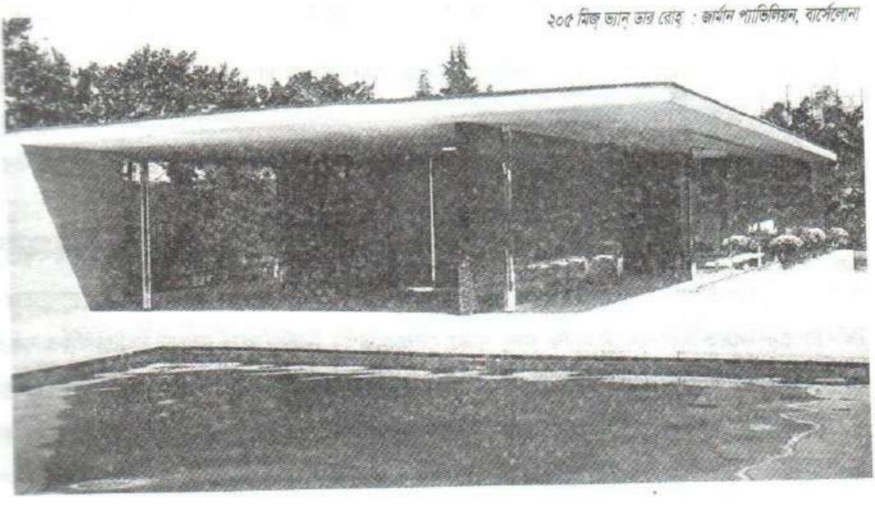

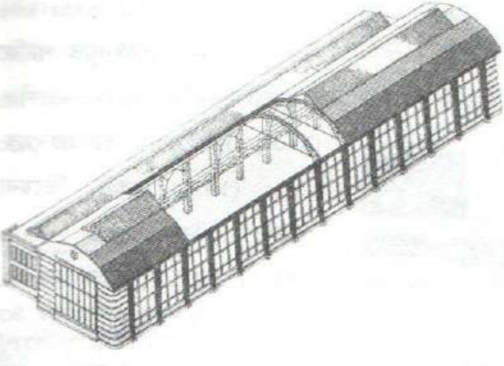

(১৮৮৫-১৯৬৯) তখন সেদিকেই নজর দিলেন। ক্রোমিয়ামের আবরণ দেওয়া বা ক্রোমিয়াম প্লেটেড (chromium plated) ইস্পাতের থামগুলোকে কোনো রকম না ঢেকেই মিজ্ বার্সেলোনা প্যাভিলিয়নের (Barcelona Pavilion) (১৯২৯) নক্‌শা প্রণয়ন করলেন। অবশ্য এই প্যাভিলিয়নে মেঝে, থাম ও ছাদকে

২০৬ এ,ই,জি, টার্বাইন হাউস : পিটার বেহেরেন্স

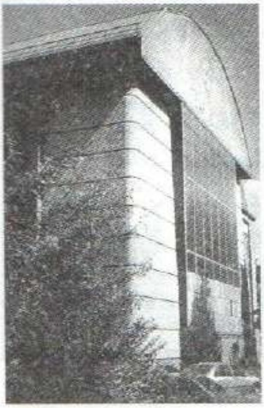

সম্পূর্ণ আলাদা করে স্থানের আয়োজনে যে চলমানতা প্রকাশ পেয়েছে তা আধুনিক স্থাপত্যের আর এক গুণ।

বা'হাউস (Bahaus) নামে জার্মানির এক ডিজাইন স্কুল (১৯১৯-৩৩) যুক্তিবাদী স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে। নির্মাণ সামগ্রী এবং ব্যবহার প্রণালী পরিষ্কারভাবে দালানের দেয়ালে, ছাদে, সর্বত্র প্রদর্শিত হয়। বার্লিনে অবস্থিত পিটার বেহেরেন্স (Peter Behrens) (১৮৬৮-১৯৪০) ডিজাইনকৃত ইস্পাত প্রধান এ,ই,জি, টার্বাইন হাউস (A.E.G. Turbine House) (১৯০৯) মডার্ন স্টাইলের সূত্রধর বললে ভুল হবে না। আর্ট নূভ্যর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বেহেরেন্স টার্বাইন হাউসের ডিজাইনে অলঙ্করণবিহীন ইস্পাত ও কংক্রিট ব্যবহার করেন। বেহেরেন্সের শিষ্য ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস (Walter Gropius) (১৮৮৩-১৯৬৯) অলফেল্ড এন্ ডার লাইনে (Alfeld en der Laine) ফ্যাগাস সুলাস্ট (Fagus Shoelast) ফ্যাক্টরিতে (১৯১১) ভবনের কোণায় কাচ ব্যবহার করে স্থাপত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেন।

২০৭ ফ্যাগাস সুলাস্ট ফ্যাক্টরি: ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস

BAMSDOC Dhaka

২০৮ মিস্ ভ্যান্ ডার রোহ্‌র টুগেনধ্যাট হাউজ

এছাড়া অগাস্টে পেরে (Auguste Perret) (১৮৭৪-১৯৫৪) ডিজাইনকৃত প্যারিসে রু ফ্র্যাঙ্কলিন ফ্লাট্‌স (Rue Franklin Flats) (১৯০২-৩), অ্যাডোল্ফ লুজ-এর (Adolf Loos) (১৮৭০-১৯৩৩) ভিয়েনার স্টাইনার হাউজ (Steiner House) (১৯১০), লে কর্বুসিয়্যের-এর (Le Corbusier) (১৮৮৭-১৯৬৫) সিত্‌রোহা হাউজ (Citrohan House) (১৯২০-২২), স্টাইন হাউজ (Stein House) (১৯২৭) ও ভিলা স্যাভয় (Villa Savoye) (১৯২৯-৩১), জে.জে.পি. উদ-এর (J.J.P. Oud) (১৮৯০-১৯৬৩) হুক অব্ হল্যান্ড (Hook of Holland) গৃহায়ণ প্রকল্প (১৯২৪-২৭),

২০৯ এডোল্ফ লুজ-এর স্টাইনার হাউজ, ভিয়েনা

২১০ কর্বুসিয়্যের-এর ভিলা স্যাভয়, পয়সি, ফ্রান্স

মিজ্ ভ্যান্ ডার রোহ্র (Mies van der Rohe) (১৮৮৬-১৯৬৯) বার্সেলোনা (Barcelona) প্রদর্শনীর জন্য জার্মান প্যাভিলিয়ন (German Pavilion) (১৯২৯) ও টুগেনঢ্যাট হাউজ (Tugendhat House) (১৯৩০) সহ রাশিয়ার কনস্ট্রাক্টিভিজ্ম (Constructivism) এবং হল্যান্ডের "ডি স্টিল" (De Stijl) রীতি যুক্তিবাদী তথা মডার্ন স্থাপত্যের অন্তর্গত।

ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল (International Style)

ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস (Walter Gropius) ১৯২৫ সালে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত ইন্টারনাৎসিওনেল আর্কিটেক্টুর (Internationale Architektur) বইয়ে স্থাপত্যকে আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে বিশ্লেষণ করেন। মেশিন যেহেতু আন্তর্জাতিক তাই মেশিনের যুগের স্থাপত্যকে আন্তর্জাতিক নামকরণ করাটা তখনকার স্থপতিরা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন।

১৯২০-এর দশকে আমেরিকার হেনরি-রাসেল হিচ্কক্ (Henry-Russel Hitchcock) ইয়োরোপিয়ান যুক্তিবাদী স্থাপত্য, তথা আধুনিক স্থাপত্যকে, ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল (International Style) আখ্যা দেন। পরবর্তীকালে আরো ব্যাপক অর্থে নামটি ব্যবহৃত হয়।

২১১ লেক শোর ড্রাইভ এপার্টমেন্টস্

হিচ্ককের মতে কিউবিজ্ম (Cubism) দ্বারা অনুপ্রাণিত ইন্টারন্যাশনাল স্টাইলের অনুসারীরা ইতিহাসের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন, ভবনের আকারের (mass) বদলে অভ্যন্তরীণ পরিসর (volume) ও প্লেইনকে (plane) অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, অলঙ্করণ বর্জন করেছেন এবং মেশিনকে শিল্পের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন।

১৯৩২ সালে প্রকাশিত এক বইয়ে হিচ্কক্ ও ফিলিপ কর্টেলইউ জন্সন্ (Philip Cortelyou Johnson) (১৯০৬-) যখন ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল-এর ব্যাখ্যা করেন তখন এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে ভবনের আকারের বদলে অভ্যন্তরীণ পরিসর, পূর্ণসাদৃশ্যের স্থানে নিয়মানুগতা (regularity), সুদৃশ্য

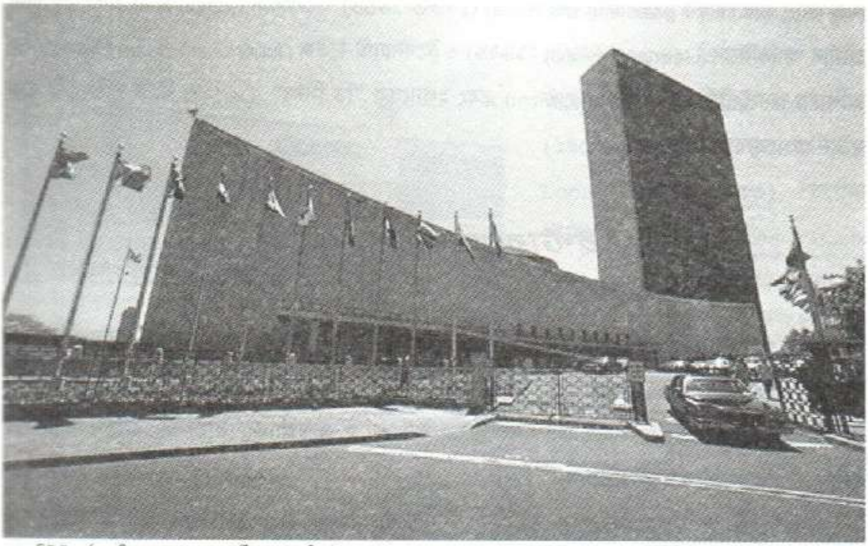

২১২ নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ ভবন: মূলত কর্বুসিয়ের-এর ডিজাইন

নির্মাণ সামগ্রী, সঠিক প্রযুক্তি অলঙ্করণ-বিহীনতা এবং খোলামেলা প্ল্যানের কথা উল্লেখ করেন।

ইয়োরোপের অনেক পরে, ১৯৩০-এর দশকে, আমেরিকায় ইন্টারন্যাশনাল স্টাইলের স্থাপত্য দেখা যায়। ইয়োরোপীয়রা যুক্তিবাদী স্থাপত্যে সমাজ ও প্রযুক্তিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিল, তবে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল স্টাইলে তেমনটি দেখা যায় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরে নাৎসি জার্মানি ও ইয়োরোপ থেকে আগত স্থপতিরা আমেরিকায় শিক্ষকতা ও স্থাপত্যচর্চা শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকায় ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল নতুন মর্যাদা লাভ করে। ১৯৫০-৬০ এর দিকে ইন্টারন্যাশনাল স্টাইলকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিজ্ ভ্যান্ ডার রোহ্ (Mies van der Rohe) বলেন: কাঠামোতে সততা, ভবনের বিভিন্ন অংশের পুনরাবৃত্তি, কাচ ব্যবহারের

২১৩ নিউ ইয়র্কে মিজ্ ও ফিলিপ জনসন-এর সিগ্রাম ভবন

২১৪ লিভার বিল্ডিং : গর্ডন বানশ্যাফট

মাধ্যমে স্পষ্টতা, সমতল ছাদ, বাক্সের মতো সীমিত এবং কোনো অলঙ্করণ নয়।

মিজ্ ১৯৪৮-৫১ সালে শিকাগো শহরে তাঁর ডিজাইনকৃত লেক শোর ড্রাইভ অ্যাপার্টমেন্টস্-এ (Lake Shore Drive Apartments) ইন্টারন্যাশনাল স্টাইলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে নিউ ইয়র্ক শহরে একাধিক স্থপতির (মূলত কর্বুসিয়েরের) ডিজাইন করা জাতিসংঘ ভবন (১৯৪৭-৫০); স্কিডমোর, ওয়িংজ্ এন্ড মেরিল (Skidmore, Owings and Merrill)-এর স্থপতি গর্ডন বানশ্যাফ্ট এর লিভার (Lever) হাউজ (১৯৫১-৫২); এবং মিজ্ ও ফিলিপ কর্টেলইউ জনসন্ (Philip Cortelyou Johnson)-এর সিগ্রাম (Seagram) ভবন (১৯৫৪-৫৮)।

কিউবিজ্‌ম (Cubism) ও *ডি স্টিল* (De Stijl)

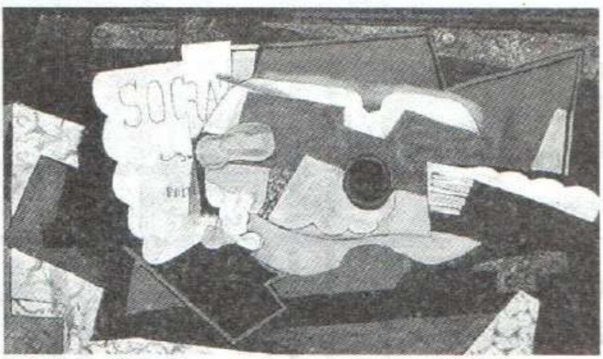

২১৫ জর্জেস্ ব্রাখ্ ও কিউবিজ্ম

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী পাবলো রুইজ (Pablo Ruiz) (১৮৮১-১৯৭৩), যিনি সর্বত্র পিকাসো (Picasso) নামে পরিচিত, স্পেনে জন্মগ্রহণ করলেও প্যারিসে বসবাস করতেন। পিকাসো এবং অন্যান্য ফরাসি শিল্পী, বিশেষ করে জর্জেস্ ব্রাখ্ (Georges Braque) (১৮৮২-১৯৬৩) বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়তক্ষেত্রাকার ব্যবহার করে এক নতুন ধারার চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেন। যেহেতু চিত্রগুলোতে ঘনক্ষেত্র বা কিউব

২১৬ পিকাসো ও কিউবিজ্ম

BANSDOC Library
Accession No. 18374

(cube) প্রকাশ পায় তাই এই রীতির নামকরণ করা হলো কিউবিজ্‌ম (Cubism)।

২১৭ "ডি স্টিল" রীতি

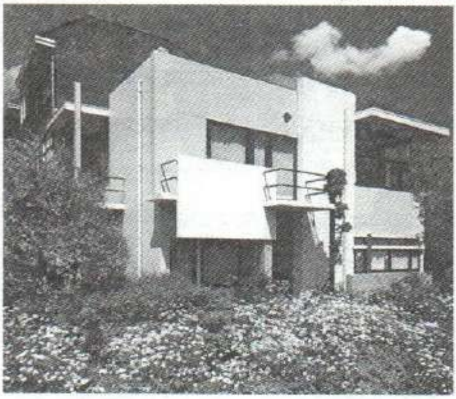

চিত্রশিল্পের প্রভাব স্থাপত্যের উপর সবসময়ই ছিল। যে সকল স্থাপত্যকর্মে সরলরেখা এবং আয়তক্ষেত্র ও ঘনক্ষেত্রের আকার প্রকাশ পেল সেগুলো কিউবিজ্‌ম রীতির অন্তর্ভুক্ত হল। সে সময়কার এবং পরবর্তীকালের অনেক ভবনে এইরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা গেল।

ধব্‌ধবে সাদা অবয়ব ও জ্যামিতিক গঠনের স্থাপত্যকর্ম বিশিষ্ট কিউবিজ্‌ম (Cubism)-এর সূচনা ১৯০০ সালে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায়। পরবর্তীকালে "ডি স্টিল" (De Stijl) নামে এই রীতি হল্যান্ডে আত্মপ্রকাশ করে। "ডি স্টিল" এর অর্থ "দি স্টাইল" (The Style)। ১৯১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত "ডি স্টিল" নামক ম্যাগাজিন এমন সব চিত্রশিল্পী, ভাস্কর এবং স্থপতিদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে যাঁরা সকলেই জ্যামিতিক আকার-আকৃতি নিয়ে কাজ করতেন।

২১৮ পিয়েট মন্‌ড্রিয়ান-এর চিত্রকলা

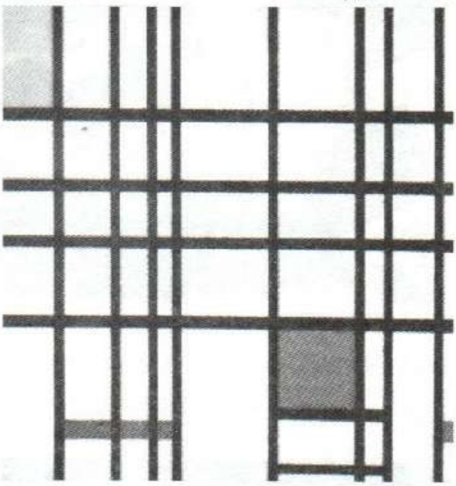

পিয়েট মন্‌ড্রিয়ান (Piet Mondrian) (১৮৭২-১৯৪৪) এই অগ্রযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম যিনি রঙ এবং আকৃতির সমন্বয়ে "ডি

২১৯ জে, জে, পি, উ'দ-এর কাজ

স্টিল" ধারায় চিত্র অঙ্কন করেন। জে.জে.পি. উ'ড-এর (J.J.P.Oud) (১৮৯০-১৯৬৩) ডিজাইন-কৃতভবন সমূহ, যেমন হুক অব্ হল্যান্ড (Hook of Holland) গৃহায়ন স্থাপত্য (১৯২৪-১৯২৭), মনড্রিয়ানের চিত্রকর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইমারত এবং তার অংশবিশেষের নির্মাণ সামগ্রী, কৌশল, আকার, আয়তন ইত্যাদি নির্ভর করত ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর। এতে অতীতকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়। ঐতিহ্য ও অলঙ্করণ হয়ে পড়ে মূল্যহীন।

বা'হাউস (Bahaus) *(১৯১৯-৩৩)*

ডিজাইনকর্ম দ্বারা শিল্প-কারখানায় উৎপাদিত বস্তুর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস (Walter Gropius) বা'হাউস (Bahaus) নামে জার্মানিতে এক ডিজাইন স্কুল চালু করেন। ১৯১৯ হতে ১৯২৮ পর্যন্ত এই স্কুলের প্রথম পরিচালক হিসেবে গ্রোপিয়াস-এর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। প্রথমে ভাইমার (Weimar) শহরে এবং ১৯২৫ সাল হতে শিল্প শহর ডেসাউ-তে (Dessau) এই স্কুল অবস্থিত ছিল। ১৯২৫-২৬ সালে গ্রোপিয়াস ডেসাউ-তে বা'হাউসের যে নিজস্ব ভবন তৈরি করেন তাতে কোনো অলঙ্করণ ছিল না; ছিল প্রায়োগিকতার দিকে নজর এবং কারখানায় প্রস্তুতকৃত দ্রব্যের সরাসরি প্রভাব।

২২০ জার্মানির ডিজাইন স্কুল বা'হাউস (মডেল)

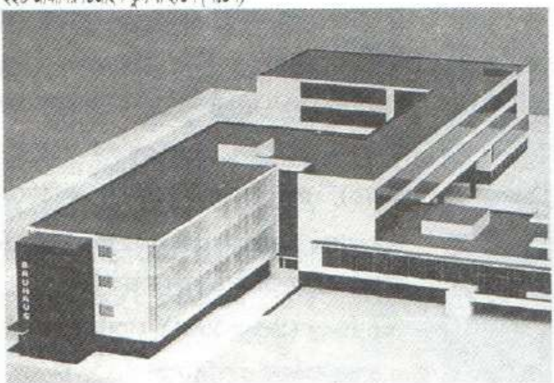

২২১ জার্মানির ডিজাইন স্কুল বা'হাউস

২২২ পল ক্লী : সেনেসিও, ১৯২২

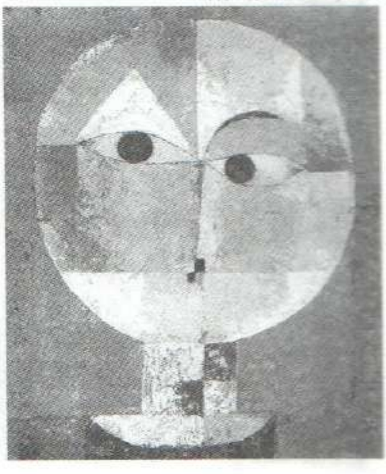

কারিগরি দক্ষতা এবং চিত্রকলার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সার্থক স্থাপত্যকর্ম সৃষ্টি করা ছিল বা'হাউসের অন্যতম উদ্দেশ্য। "ব্যবহারের উদ্দেশ্য হতেই ভবনের আকার সৃষ্ট" (Form follows Function) লু'ই সুলিভানের এই মতবাদে বা'হাউসের সকল ছাত্র ও শিক্ষক বিশ্বাস করত।

২২৩ ওয়াসিলি কান্ডিনিস্কী : কোম্যাকস্, ১৯১০-১১

বৃটেনের আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্‌টস্ (Arts and Crafts) আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত বা'হাউস ছিল সেই যুগের নামকরা বেশ কয়েকজন স্থপতি এবং চিত্রশিল্পীর মিলনস্থান। যেমন, সুইট্‌জারল্যান্ডের চিত্রশিল্পী জোহানেস ইটেন (Johannes Itten) (১৮৮৮-১৯৬৭), জার্মানি-সুইট্‌জারল্যান্ডের চিত্রশিল্পী পল ক্লী (Paul Klee) (১৮৭৯-১৯৪০), রুশ চিত্রশিল্পী ভ্যাসিলি কান্ডিনিস্কী (Vassily Kandinsky) (১৮৬৬-১৯৪৪), হল্যান্ডের চিত্রশিল্পী থিও ভ্যান ডাজবার্গ (Theo van Doesberg) (১৮৮৩-১৯৩১), হাঙ্গেরির চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর লাজলো মোহলি-নাগি (Laszlo Moholy-

২২৪ চিত্রশিল্পী থিও ভ্যান ডাজবার্গ : এ্যারিথম্যাটিক কম্পোজিশন, ১৯৩০
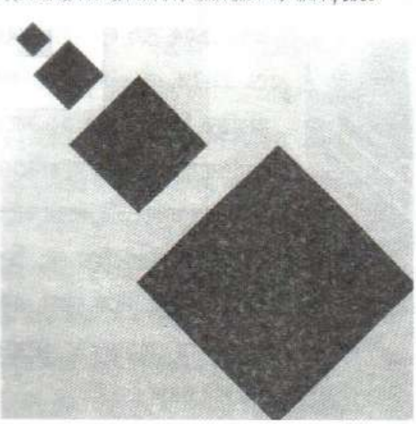

২২৫ মার্সেল ব্রুয়ার এর কাজ
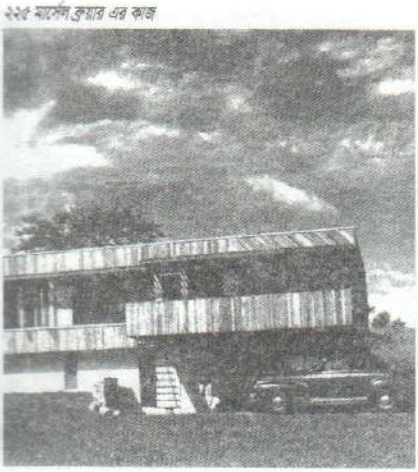

২২৬ অ্যাডলফ মেইয়ার ও গ্রোপিয়াস : ওয়ার্কবান্ড প্রদর্শনী, কলোন, ১৯১৪
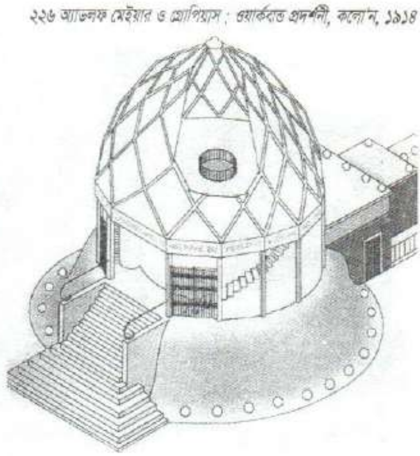

২২৭ হানেস মেইয়ার এর কাজ

Nagy) (১৮৯৫-১৯৪৬), জার্মানির স্থপতি অ্যাডলফ মেইয়ার (Adolf Meyer) (১৮৮১-১৯২৯), হাঙ্গেরির স্থপতি মার্সেল ব্রুয়ার (Marcel Breuer) (১৯০২-৮১), জার্মানির স্থপতি হানেস মেইয়ার (Hannes Meyer) (১৮৮৯-১৯৫৪) এবং স্থপতি লুড্‌ভিগ মিজ্ ভ্যান্ ডার রোহ্ (Ludwig Mies van der Rohe) (১৮৮৬-১৯৬৯)।

আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ থেকে সরে গিয়ে বা'হাউস ভাইমারে থাকতেই প্রযুক্তি ও যন্ত্রাদির দিকে ঝুঁকে পড়ে। সমতল ছাদ, বিরাটাকার কাচ ব্যবহার, প্রি-ফ্যাবরিকেশন (pre-fabrication) বা ভবন স্থাপন বা ভবন তৈরি করার আগে ভবনের অংশসমূহ যন্ত্রাদির সাহায্যে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন, আধুনিক রান্নাঘর, প্লাইউডের (plywood) সুলভ আসবাবপত্র, ইত্যাদি বা'হাউসের অবদান।

২২৮ মোহোলি নাগি : CHX ১৯২৩

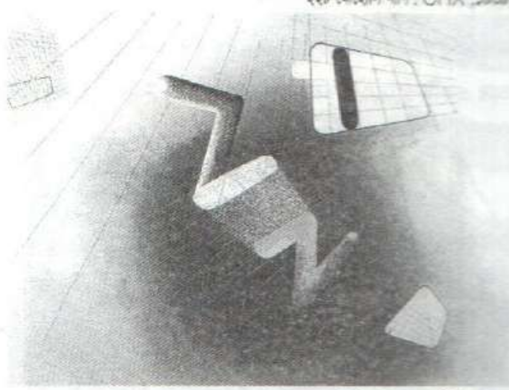

মন্ট্রিয়েল এক্সপো '৬৭ (Expo '67, Montreal)-এ মোশে সাফদি (Moshe Safdie) (১৯৩৮) ডিজাইনকৃত হ্যাবিটাট (১৯৬৭) গৃহায়ণ প্রকল্পটি ছিল কারখানায় তৈরি ঘরগুলোর সংযোজন।

২২৯ মোশে সাফদি ডিজাইনকৃত হ্যাবিটাট গৃহায়ণ

ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট (Frank Lloyd Wright)

২৩০ শিকাগোর প্রেইরি হাউস

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট (Frank Lloyd Wright) (১৮৬৭-১৯৫৯)। পরিবেশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, ভবনের অভ্যন্তরের সাথে বাইরের এবং দালানের সাথে জমিনের নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ভবনের অভ্যন্তরকে একাধিক কামরায় বিভক্ত করা রাইট পছন্দ করতেন না ; বরং বিনা বাধায় দেয়ালের অবর্তমানে এক স্থান যেন আর একটি স্থানের ভিতর মিশে যেতে পারে সেদিকেই ছিল রাইটের মনোযোগ। পরিবেশগত কারণেই রাইট ভবনকে মাটির খুব কাছে রাখতেন। এই নিয়মনীতিতে রাইট কর্তৃক ডিজাইনকৃত আবাসিক বাড়িগুলো সমষ্টিগতভাবে প্রেইরি হাউস (Prairie House) নামে পরিচিত। ১৯০৮ সালে নির্মিত শিকাগোর রবি হাউস (Robie House) প্রেইরি হাউসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত।

২৩১ ফলিং ওয়াটার

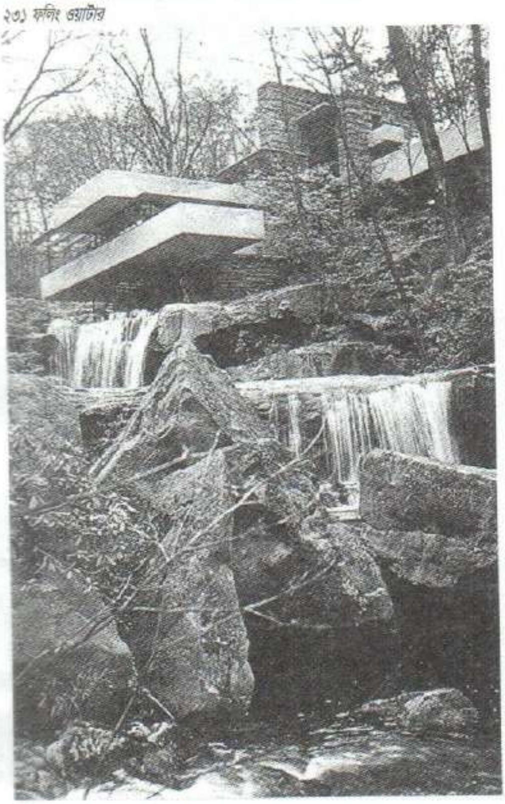

আন্তর্জাতিক আধুনিকতার অন্তর্ভুক্ত রীতিতে রাইট সৃষ্টি করলেন পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার বেয়ার রান (Bear Run) স্থানে কফম্যানের (Kaufmann) জন্য শতাব্দীর সাড়া জাগানো বাড়ি, ফলিং ওয়াটার (Falling Water) (১৯৩৭-৩৯)। কংক্রিট ও পাথর দিয়ে তৈরি এই বাড়িটি বনভূমিতে ঝর্নার উপর অবস্থিত। একাজে ইয়োরোপে কর্মরত ইন্টারন্যাশন্যাল (International) স্টাইলের প্রবর্তকরা ভীষণভাবে আলোড়িত হন। তবে রাইট

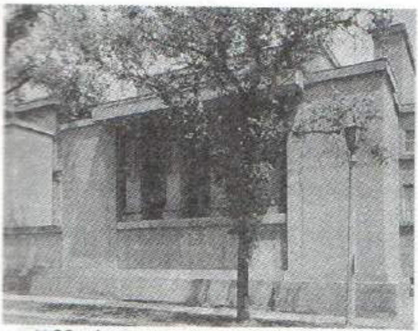

২৩২ ইউনিটি চার্চ

২৩৩ জনসন ওয়াক্স ফ্যাক্টরি

নিজে খুব কমই চলতি ধারার সাথে চলেছেন। ব্যতিক্রমধর্মী পথে চলতে রাইট পছন্দ করতেন।

রাইটের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে শিকাগোর উইস্‌কনসিনে (Wisconsin) জন্‌সন ওয়াক্স ফ্যাক্টরি (Johnson Wax Factory) (১৯৩৬-৯) এবং ইউনিটি চার্চ (Unity Church) (১৯৩৬), টোকিওর ইম্‌পেরিয়াল হোটেল (Imperial Hotel) (১৯১৬-২০), যার অস্তিত্ব আজ আর নেই। রাইটের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ নিউ ইয়র্ক শহরে গুগেনহাইম মিউজিয়াম (Guggenheim Museum) (১৯৪৫-৫৯)। সেখানে জাদুঘরের প্রচলিত নিয়মকানুন ভঙ্গ করে গোলাকার দেয়ালে চিত্রকর্ম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাইট তাঁর শেষের দিকের ডিজাইনে তীক্ষ্ণ কোণ দিয়ে কাজ করেছেন যা সেকালের নতুন স্থাপত্যের সূচনা করে।

২৩৪ গুগেনহাইম মিউজিয়ামের অভ্যন্তর

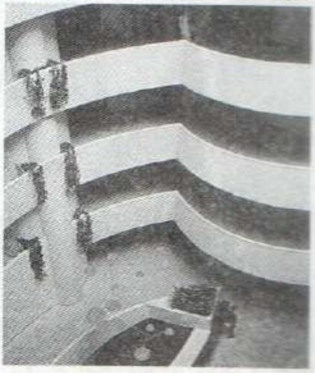

২৩৫ গুগেনহাইম মিউজিয়াম, নিউ ইয়র্ক

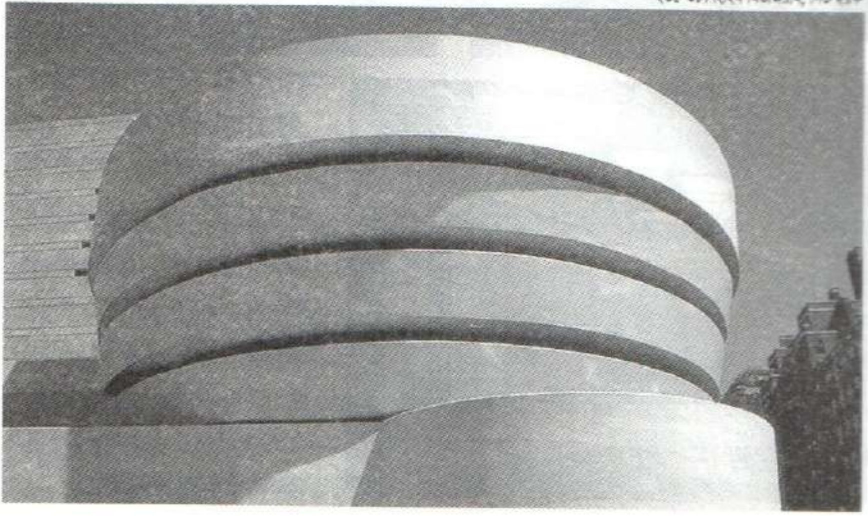

আর্ট ডেকো (Art Deco)

১৯২৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনেইল দ্য আর্টস ডেকোরাটিফ্স এট্ ইন্ডাস্ট্রিয়েল্স মডার্নেস (Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes) মেলার উপর ভিত্তি করে ১৯২০-৪০ সময়কালের ভবনগুলোর অলঙ্করণযুক্ত স্টাইলটির নামকরণ করা হয় ১৯৬০ সালে "আর্ট ডেকো" (Art Deco)। প্রাণোদ্দীপ্ত হবার কারণে এই স্টাইলকে কখনো কখনো জ্যাজ মডার্নে (Jazz Moderne) বলা হয়ে থাকে। জ্যামিতিক গঠন, তীক্ষ্ণ আকার এবং চমক লাগানো রঙ আর্ট ডেকোর বৈশিষ্ট্য। ভীষণ পিছুটান ছিল এই রীতির। মিশর, গ্রিস এবং রোমান চিন্তাধারার সহজসাধ্য সংস্করণ বললেও ভুল হবে না।

২৩৬ আর্ট ডেকো : ওয়ালিস গিলবার্টের হুভার বিল্ডিং

২৩৭ আর্ট ডেকো ধারায় ইন্টেরিয়র ডিজাইন

আধুনিক সামগ্রী ব্যবহার করলেও আর্ট ডেকোর সময় ক্রোমিয়াম (chromium) অতিমাত্রায় জনপ্রিয় ছিল। পাশাপাশি সনাতন সামগ্রী, যথা স্বচ্ছ রঙমিশ্রিত কাচ, রঙ-বেরঙের টালি, আস্তর ইত্যাদি জমকালো প্যাটার্নে (pattern) ব্যবহৃত হতে থাকে। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী (১৯১৮-১৯৩৯) সময়ে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ভবন এই রীতিতে নির্মিত হয়। এমনিতে আর্ট ডেকো হোটেল, সিনেমা, দোকানপাট ইত্যাদির জন্য উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়।

উইলিয়াম ভ্যান এলেন (William van Ellen) ডিজাইনকৃত নিউ ইয়র্কের ক্রাইস্‌লার (Chrysler) ভবন (১৯২৮-৩০) এবং শ্রিভ্ (Shreve), ল্যাম্ব (Lamb) ও হারমন (Harmon) নকশাকৃত নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং (Empire State Building) (১৯৩০-৩১) আর্ট ডেকো স্টাইলের অন্তর্ভুক্ত।

২৩৮ নিউ ইয়র্কের ক্রাইস্লার ভবন; উইলিয়াম ভ্যান এলেন

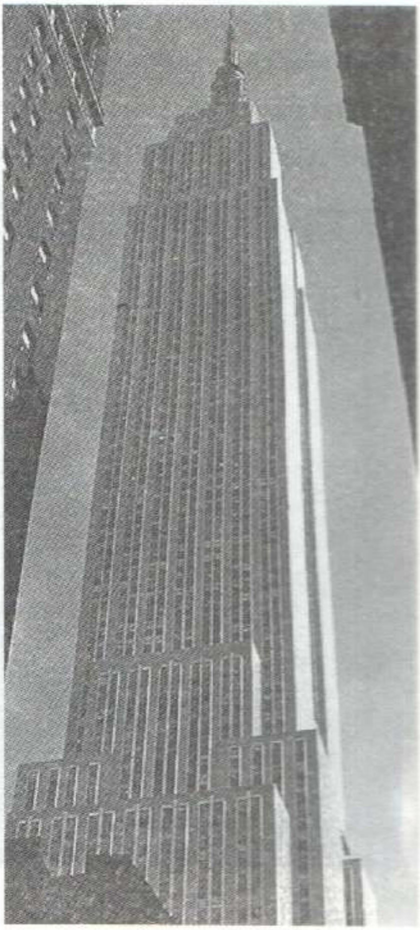

২৩৯ এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং : শ্রাভ ও হারমন

একস্প্রেশনিজ্ম (Expressionism)

১৯০৫ হতে ১৯২৫ পর্যন্ত উত্তর ইয়োরোপে, বিশেষ করে জার্মানি এবং হল্যান্ডে, স্বল্পস্থায়ী এক স্টাইল বিরাজমান ছিল। আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রতীক হিসেবে ভবনের আকারে, সামগ্রীর ব্যবহারে, নির্মাণ কৌশলে প্রকাশ পেতো। এর নাম দেওয়া হয়েছে এক্সপ্রেশনিজ্ম (Expressionism)। এই ধারার অনুগামীরা মনে করতেন যে, ভবন শুধু কাজের হলেই চলবে না, ভাস্কর্যসম আকার দ্বারা অনুভূতিকেও ছুঁয়ে যাবে। আর্ট নুভ্যর ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত হয়ে পরবর্তী ব্রুটালিজম্ (Brutalism)-এর মাঝে বেঁচে থাকে এই ধারা। বাঁধনহারা কল্পনার রূপ দিতে কংক্রিটের নমনীয়তা সাহায্য করত। নির্মিত হতো গোলাকৃতি ছাদ, উড়ন্ত কোনো বাঁক, মনে হতো শিল্পীর ছোঁয়ায় ভবন যেন ভাস্কর্যের আকার ধারণ করেছে।

অ্যান্টনি গ'ডির (Antoni Gaudi) পরের দিকের কাজ প্রমাণিত করে যে তিনি এক্সপ্রেশনিজমের সবচেয়ে সফল স্থপতি। ওয়াল্টার গ্রোপিয়াসের (Walter Gropius) "মার্চ গোলযোগ"-এ নিহতদের জন্য কংক্রিটের তৈরি স্মৃতিসৌধ (১৯২১) এবং লুডভিগ মিজ্ ভ্যান্ ডার রোহ্'র (Ludwig Mies van der Rohe) (১৮৮৬-১৯৬৯) ইস্পাত ও কাচের বহুতল ভবনগুলো (১৯১৯-২১) এই রীতির বাহক।

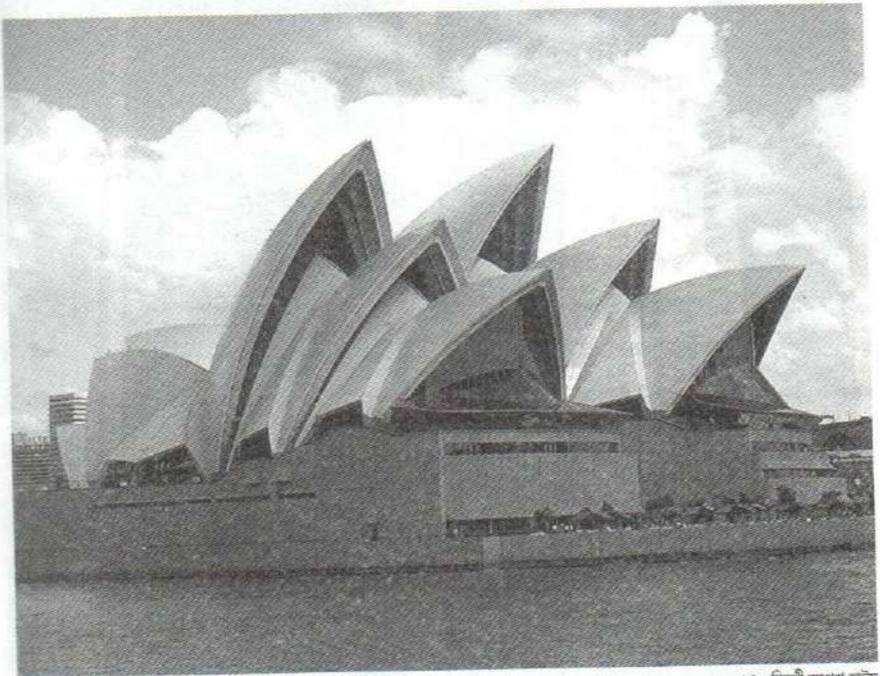

২৪০ সিডনী অপেরা হাউস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পর উন্নত দেশগুলো ব্যাপক পুনর্নির্মাণ কর্মে আধুনিক স্থাপত্যের ধারাকেই কাজে লাগায়। কারণ এতে করে কম খরচে এবং কম সময়ে দালান তৈরি করা সম্ভব ছিল। তাড়াহুড়া করে নির্মাণ করতে গিয়ে বেশ কিছু আজেবাজে কাজও, বিশেষ করে গৃহায়ণের ক্ষেত্রে এই সময়ে লক্ষণীয়। সরবরাহ ও চাহিদার হিসাব মিলাতে গিয়ে নির্মাণশিল্পে মানবিক মূল্যবোধের অভাব অনুভূত হয়। খরচ কমাতে গিয়ে ভবনের গুণগত মানও এই সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দালানের নির্মাণ সামগ্রী, কাঠামো এবং ব্যবহারযোগ্য স্থানসমূহকে প্রকাশ করা বিংশ শতাব্দীর স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইস্পাত দ্বারা দৃঢ়ীকৃত কংক্রিট, উন্নত ইস্পাত এবং কাচ এই মনোভাবের সহায়ক হিসেবে ঠিক সময়ে আবির্ভূত হয়।

জার্মান নাগরিক লুড্‌ভিগ মিজ্ ভ্যান্ ডার রোহ্ (Ludwig Mies van der Rohe) (১৮৮৬-১৯৬৯) এবং ফরাসি লে কর্বুসিয়্যের (Le Corbusier), যাঁর আসল নাম চার্লস-এডুয়ার্ড জহ্‌নাখে (Charles-Edouard Jeanneret), (১৮৮৭-১৯৬৬) আধুনিক স্থাপত্যের মহান গুরু। মিজ্ এবং লে কর্বুসিয়্যেরকে সমগ্র বিশ্বের স্থপতিরা অন্ধের মতো অনুকরণ করেন। মিজ্-এর "স্বল্পতাই হলো বেশি" (Less is More) এই বিখ্যাত মন্তব্যেই সেই সময়ের অলঙ্করণবিহীন এবং স্বচ্ছ কাঠামো সমেত স্থাপত্যের রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত। যান্ত্রিক যুগের মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত লে কর্বুসিয়্যের মনে করতেন যে বাসা বসবাস করার যন্ত্র বৈ আর কিছু নয়।

২৪১ বহুতল ভবনের সমস্যা: লন্ডনের অল্টন এস্টেট

মিজ্ ভ্যান্ ডার রোহ্ (Mies van der Rohe) (১৮৮৬-১৯৬৯)

মিজ্ ইস্পাত ও কাচের দেয়ালের সাহায্যে ভবন নির্মাণ করার সুবাদে আধুনিক স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। ১৯১৯-২১ সময়কালে মিজ্ আকাশচুম্বী কাচের বাণিজ্যিক ভবন ডিজাইন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তবে এই স্থপতিগুরুর প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় ১৯২৯ সালে বার্সেলোনায় (Barcelona) অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর জন্য জার্মানীর প্যাভিলিয়নে (German Pavilion)। খোলামেলা পরিকল্পনা, বিভিন্ন স্থানের মাঝে বিরাজমান সম্পর্ক, উন্নতমানের সামগ্রীর ব্যবহার বার্সেলোনা প্যাভিলিয়নের বৈশিষ্ট্য। পরে ঐ প্যাভিলিয়নের নিয়ম-নীতি বসতবাড়ির ডিজাইনে মিজ্ সফলতার সাথে প্রয়োগ করেন। এগুলোর মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার (Czechoslovakia) ব্রনতে (Brono) ১৯৩০ সালের টুগেনধ্যাট হাউস (Tugendhat House) উল্লেখযোগ্য।

বা'হাউস-এ শিক্ষক (১৯৩০-৩৩) এবং পরে আর্মর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (Armour Institute of Technology), বর্তমানে ইলিনয় ইনস্টিটিউট (Illinois Institute), প্রফেসর হিসেবে মিজ্ কাজ করেছেন। ১৯৩৮ সালে মিজ ইনস্টিটিউটের জন্য সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী

এক নতুন মাস্টার প্ল্যান (Master Plan) তৈরি করেন। ইলিনয়ের (Illinois) ফক্স রিভারে (Fox River) ফার্ন্সওয়ার্থ হাউসের (Farnsworth House) (১৯৫০) ডিজাইনে এই মহান স্থপতির সকল চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়।

নিউইয়র্কের সিগ্র্যাম বিল্ডিং-এ (Seagram Building) (১৯৫৬-৯) মিজ্ এবং ফিলিপ কর্টেলইউ জন্সন্ (Philip Cortelyou Johnson) (১৯০৬-) অফিস ভবনের জন্য যে স্থাপত্য চরিত্র সৃষ্টি করেন তা বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অসংখ্যবার অনুকরণ করা হয়েছে।

২৪২ ফার্ন্সওয়ার্থ হাউস, ফক্স রিভার, ইলিনয়

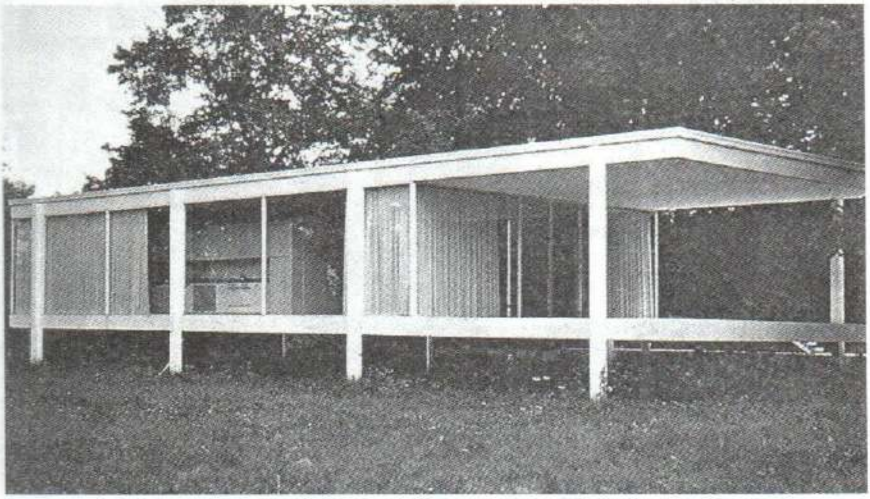

লে কর্বুসিয়েয়র (Le Corbusier) (১৮৮৭-১৯৬৬)

লে কর্বুসিয়েরের গৃহায়ণ, যেমন ১৯২০-২২ সালের সিত্রোহা হাউজ (Citrohan House) এবং শহর পরিকল্পনার উপরই কাজ করেছেন সবচেয়ে বেশি। তিনি সবুজ পার্কের মাঝে আকাশচুম্বী ভবন ও বিভিন্ন উচ্চতায় মোটরযান চলাচলের জন্য উড়াল রাস্তার নকশা তৈরি করেন। লে কর্বুসিয়ের-এর স্থাপত্যের

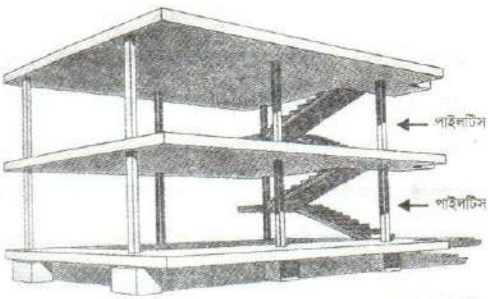

২৪৩ থাম বা পাইলটিস

বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ছিল কংক্রিটের জ্যামিতিক ব্লক, ব্লককে মাটি থেকে আলাদা করার জন্য থাম বা পাইলটিস (pilotis), সমতল ছাদ ও অসংখ্য জানালার ব্যবহার; দেয়াল ও ভবনের কাঠামোকে

আলাদা করা; উন্মুক্ত মেঝের পরিকল্পনা এবং খোলামেলা সম্মুখভাগ ইত্যাদি। লে কর্বুসিয়েরের প্রচুর লেখালেখি ও স্থাপত্য কর্মের মাধ্যমে ভবনকে ভাস্কর্যের রূপ দেবার তত্ত্ব প্রচার করেন।

২৪৪ সিত্রোহান হাউজ

দুই পাশে জানালাবিহীন দেয়াল এবং অন্য দুই দিকে শুধু কাচ দিয়ে মোড়া নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনে (United Nations Building) (১৯৪৭-৫০) বেশ কয়েকজন স্থপতি কাজ

২৪৫ স্টাইন হাউস

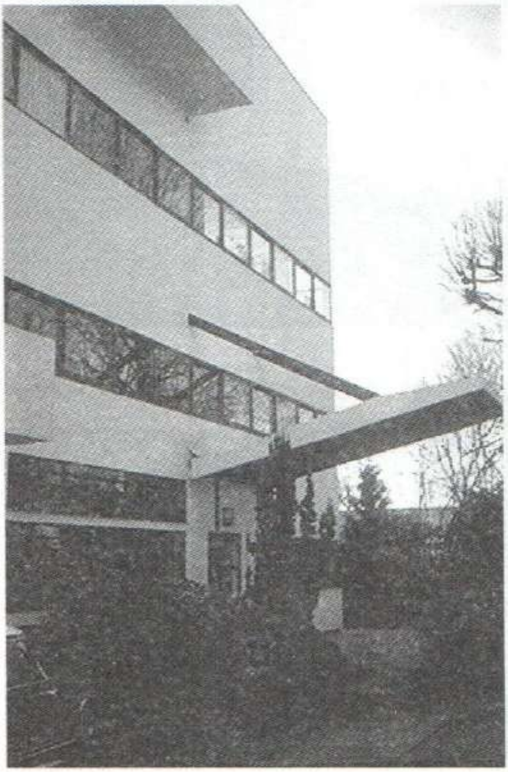

২৪৬ ইউনিটি দ্য হ্যাবিটেশন

করলেও মূলত তা ছিল লে কর্বুসিয়েরের-এর ডিজাইন পদ্ধতির প্রতিফলন।

লে কর্বুসিয়েরের দৃঢ়ীকৃত বা জমাটবদ্ধ কংক্রিটের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতেন। কংক্রিট, এমনকি স্টিলের, কাঠামোকে ভাস্কর্যের ন্যায় প্রকাশ করার এই রীতির নাম দেওয়া হয় "ব্রুটালিজম" (Brutalism) অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা।

ফ্রান্সের মার্সাইতে (Marseilles) ইউনিট দ্য'হ্যাবিটেশন (Unite d'Habitation) (১৯৪৭-৫২) ভবন ডিজাইনের মাধ্যমে এই রীতির যাত্রা শুরু হয়। বিশেষ করে ঐ ভবনের ছাদের পরিকল্পনা স্থাপত্যে নতুন মাত্রা যোগ করে। নির্মাণকার্যে একক পরিমাণ বা সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট মাপের ব্যবহার ইউনিট দ্য'হ্যাবিটেশনের নক্শায় প্রথম প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতির ইংরেজি নাম মডিউলার সিস্টেম (Modular system)।

২৪৭ র'স্যাম্পে নটর ডেম দ্যা হট

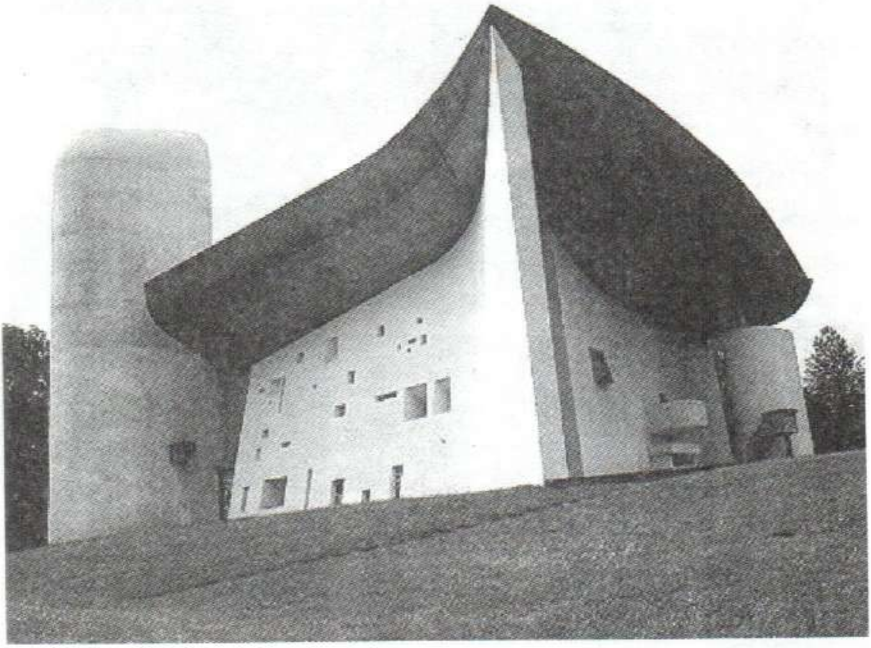

২৪৮ র'স্যাম্পে নটর ডেম দ্যা হট : অভ্যন্তর

একাধিক নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন সত্ত্বেও লে কর্বুসিয়্যের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন। তাঁর গৃহায়ন প্রকল্প, যেমন মার্সাইর ইউনিট দ্য'হ্যাবিটেশন, যদিওবা বহুতল হবার কারণে কম জমি ব্যবহার করে আশেপাশে বাগানের ব্যবস্থা রাখতে সুযোগ করে দিয়েছে, তথাপি প্রকল্পের বিশালতা ও জনমানবশূন্য টানা বারান্দাগুলো সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে উৎসাহিত করেছে।

ফ্রান্সের রঁ'স্যাম্পে (Ronchamp) নটর ডেম দ্য হট (Notre Dame du Haut) (১৯৫০-৫০) নির্মাণে লে কর্বুসিয়েের দৃঢ়ীকৃত কংক্রিটের কাঠামোগত শক্তি এবং নমনীয়তা উভয় চরিত্রের সদ্ব্যবহার করেন। সাদা দেয়াল, বাদামি রঙ-এর ছাদ, আপাতদৃষ্টিতে নিয়ম বহির্ভূত কতকগুলো ছোট ছোট জানালা ইত্যাদি রঁ'স্যাম্পের খ্রিষ্টীয় উপাসনালয়কে দিয়েছে ভাস্কর্যের অপরূপতা।

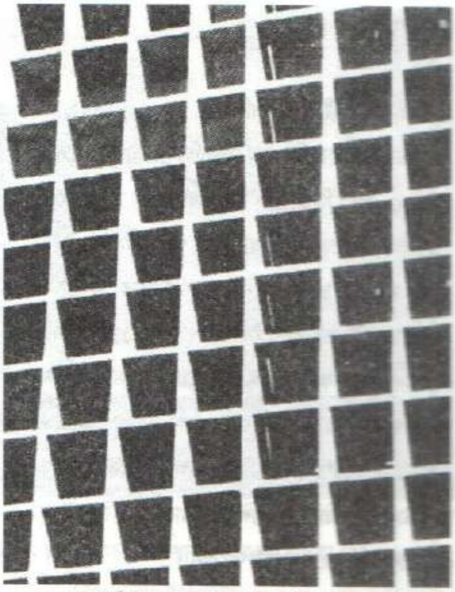

২৪৯ সূর্যের আলোকে বাধা দেয়া: ঢাকার বানিজ্যিক ভবনে ব্রাইস সোলেইল

লে কর্বুসিয়ের-এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ভারতে পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড় (Chandigarh) শহরের মহাপরিকল্পনাসহ সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট এবং সেক্রেটারিয়েট ভবনসমূহ (১৯৫১-৫৬)। রঁ'স্যাম্পের রীতিতে তৈরি জউল হাউসেস (Jaoul Houses) (১৯৫৪-৫৬); টোকিওতে মিউজিয়াম অব্ মডার্ন আর্ট (Museum of Modern Art) (১৯৫৭) এবং হার্ভার্ডের আর্ট সেন্টার (Harvard Art Centre) (১৯৬০)।

চণ্ডীগড়ের আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সূর্যের আলোকে বাধা দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা বা "ব্রাইস সোলেইল" (brise soleil) এবং বৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়তি ঝুলন্ত ছাদ স্থাপত্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

২৫০ সংসদ ভবন, চণ্ডীগড়, ১৯৫৫-৬০

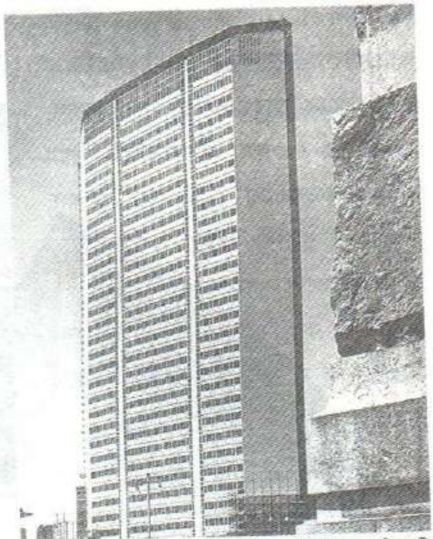

২৫১ মিলানের পিরেলি ভবন : জিও পন্টি

স্থপতি-চিত্রশিল্পী জিও পন্টি (Gio Ponti) (১৮৯১-১৯৭৯) ইটালীর মিলানে পিরেলি (Pirelli) ভবনের (১৯৫৫-৫৮) ডিজাইনে মিজ্-এর মূল তত্ত্ব থেকে ভিন্ন চিন্তা করতে সক্ষম হন। দুই পাশ ক্রমাগত সরু হয়ে যাওয়া ছাড়াও নির্মাণে দৃঢ়ীকৃত কংক্রিট ব্যবহার এই ভবনটির বৈশিষ্ট্য। তবে ১৯৬০ এর পর হতে অনেক স্থপতিই ভাব প্রকাশের নতুন ধরন অনুসন্ধান করতে থাকেন। সে ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। স্থপতিরা এখন সর্বদা নিজস্ব একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁদের ডিজাইনে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট থাকেন।

ইয়েরো সা'রিনেনের (Eero Saarinen) (১৯১০-৬১) নিউ ইয়র্কস্থ এয়ারপোর্টের টি,ডবলইউ এ টার্মিনাল (TWA Terminal) (১৯৬০), এবং রাইটের ক্যালিফোর্নিয়াস্থ মার্টিন কাউন্টি সিভিক সেন্টার (Martin County Civic Centre) (১৯৫৯-৬২) ব্যতিক্রমধর্মী দালানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

২৫২ ইয়েরো সা'রিনেনের নিউ ইয়র্কস্থ এয়ারপোর্টের টি,ডবলইউ,এ টার্মিনাল

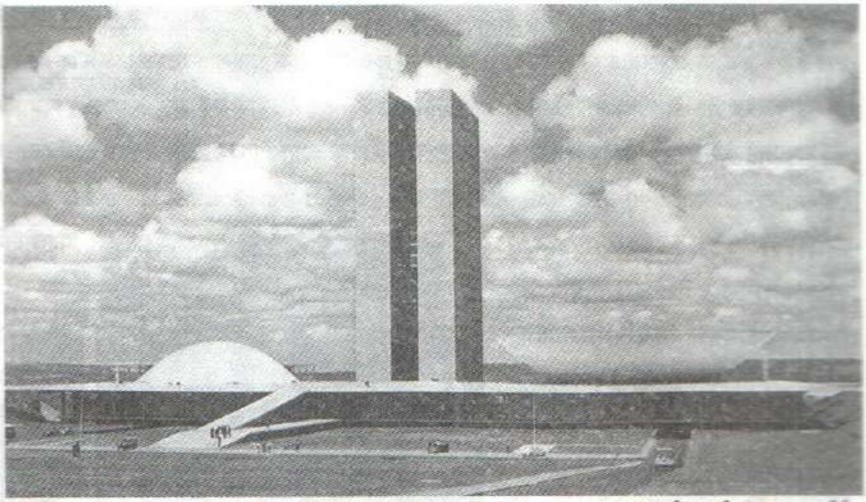

২৫৩ অস্কার নিমেয়ের ডিজাইনকৃত শহর ব্রাসিলিয়া

অস্কার নিমেয়েরের (Oscar Niemeyer) (১৯০৭-) ব্রাজিলের রাজধানী শহর ব্রাসিলিয়া (১৯৬২-৭০), লুই আই. কা'নের (Louis I. Kahn) (১৯০১-৭৪) ক্যালিফোর্নিয়াস্থ সল্ক ইন্সিটিউট (Salk Institute) (১৯৬৩-৬৫), এবং পল রুডল্‌ফের (Paul Rudolph) (১৯১৮-) ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়স্থ স্কুল অব আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার (School of Art and Architecture) (১৯৬৩) ও ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ভবনসমূহ ও ছাত্রাবাস সহ অন্যান্য বেশ কিছু ভবনের ডিজাইনে স্থপতিদের নতুন চিন্তার বিকাশ ঘটলেও লে কর্বুসিয়ের-এর কাজ দ্বারা এঁরা সকলেই দারুণ ভাবে প্রভাবিত।

২৫৪ লুই আই. কা'নের সল্ক ইন্সিটিউট

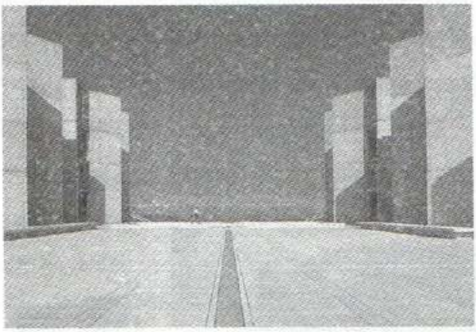

২৫৫ পল রুডল্‌ফের স্কুল অব আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়

ওদিকে উন্নত দেশগুলোতে ১৯৬০ এর পর কিছু ভবনে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহের এবং টেলিফোন, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির পাইপ দালানের বহিরাংশে স্থান পায়। এই স্টাইলের নামকরণ করা হয় "নিউ ব্রুটালিজম্‌" (New Brutalism)। পরবর্তীকালে ঐ ধারার উন্নত পর্যায়কে "হাই টেক" (High Tech) স্থাপত্য বলা হয়।

লুই আই. কা'ন (Louis I. Kahn) (১৯০১-৭৪)

২৫৬ রিচার্ডস্ মেডিক্যাল রিসার্চ বিল্ডিং

লুই আই. কা'ন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরুবার পর যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল (Yale) বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট গ্যালারি (Art Gallery) (১৯৫১-৫৩) এবং ফিলেডেল্‌ফিয়ায় (Philadelphia) পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Pennsylvania) রিচার্ডস্ মেডিক্যাল রিসার্চ বিল্ডিং (Richards Medical Research Building) (১৯৫৭-৬০) ডিজাইনের মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ব্রুটালিজম্-এর (Brutalism) দৃঢ়তা, আগ্রাসন, সামগ্রীর

২৫৭ ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবন

বিন্যাস, ইত্যাদি কা'নের কাজে দেখা যায়। জ্যামিতিক আকার-আয়তন এবং যথাযোগ্য সামগ্রীর ব্যবহারের মাধ্যমে কা'ন তাঁর ভবনে একাধারে কঠোরতা এবং নমনীয়তা প্রকাশ করেন। তাঁর কাজে সর্বত্র রাজকীয় ছাপ বিদ্যমান। জোনাস সক্ক ইনস্টিটিউট (Jonas Salk Institute) ল্যাবরেটরি ভবনসহ এই মহান স্থপতির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে ভারতের আহমেদাবাদে ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্ট (Indian Institute of Management) (১৯৬৩) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট ওয়ার্থে (Fort Worth) কিম্বল আর্ট মিউজিয়াম (Kimble Art Museum) (১৯৬৭-৭২)।

কা'নের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ঢাকায় অবস্থিত, শের-এ-বাংলা নগরে জাতীয় সংসদ ভবন (১৯৬২-১৯৮৩)। প্রতীকের সাহায্যে ভাবকে অভিব্যক্ত করা কা'নের ধর্ম। মানুষের সাথে ক্ষমতাশীলদের দ্বন্দ্বই যেন বোঝানো হয়েছে ঢাকার সংসদ ভবনে।

যুক্তিসঙ্গত বা র‍্যাশনাল (Rational) স্থাপত্য

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নগর পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ডিজাইন সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান দিতে চেষ্টা করা হয় যে স্থাপত্যেকর্মের সাহায্যে তার নাম দেওয়া হয়েছে "র‍্যাশনাল" (Rational) বা যুক্তিসঙ্গত স্থাপত্য। ইতালির স্থপতি আলদো রসি (Aldo Rossi) (১৯৩১-) এই ধারার মূল প্রবক্তা। রেনেসাঁর যুক্তিসঙ্গত স্থাপত্যের সাথে ১৯২০ দশকের চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয় র‍্যাশনাল স্থাপত্য। এই রীতির মতে স্থাপত্য একটি স্বাতন্ত্র্য বৈজ্ঞানিক বিষয় যার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে এর চিরাচরিত প্রথা। ভবন এবং নগরীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পায় এই রীতি; ভবনের বারান্দাকে মনে করা হয় শহরের কোনো রাস্তা, উঠানকে নগরীর মুক্তাঙ্গন, প্রতিটি ভবনে বারবার সৃষ্টি হয় নগরীর বিভিন্ন স্থান। রসির ডিজাইন করা মিলান শহরে মন্টে আমাটায় (Monte Amata) গৃহায়ন প্রকল্পের এপার্টমেন্ট ব্লক (Apartment Block) (১৯৬৯-৭৩) র‍্যাশনাল স্থাপত্য-ধারার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

২৫৮ আলদো রসির ডিজাইন করা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক

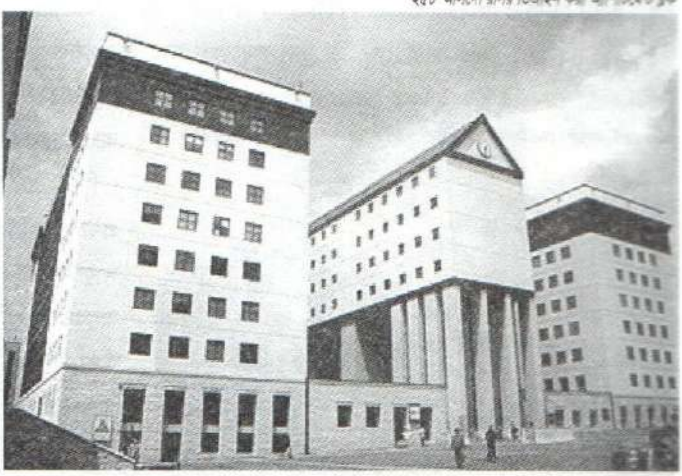

পোস্ট-মডার্ন (Post-Modern) স্থাপত্য

লক্ষ্য করা গেছে যে, কোনো একটি স্টাইলের বিরুদ্ধে, সেই স্টাইলের ব্যর্থতার কারণে আবির্ভূত হয়েছে নতুন এক ধারা। আধুনিক বা মডার্ন আন্দোলন, যা দিয়ে সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পোস্ট-মডার্ন (Post-Modern) স্থাপত্য হাজির হয়। ইতিহাসের সাথে সম্পর্কহীন কংক্রিটের বড় বড় চৌকোণের একঘেয়েমিতে মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, তখন বৈচিত্র্য আনার জন্য আবার নতুন করে সেই প্রাচীন স্থাপত্যের উপকরণগুলোর আমদানি শুরু হয়। নতুনভাবে, নানা রঙে এবং বর্ধিত আকারে পুরাতন বৈশিষ্ট্যগুলো আবার দালানে শোভা পেতে লাগল। গাম্ভীর্যের পরিবর্তে ভবনগুলোর মাঝে অধিক মাত্রায় কৌতুকপ্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২৫৯ পোর্ট গ্রিমড : পোস্ট -মডার্ন

রবার্ট ভেন্চুরি (Robert Venturi) (১৯২৫-) ফিলাডেল্ফিয়ায় (Philadelphia) তাঁর মায়ের জন্য যে বাড়ি (১৯৬২-৬৪) তৈরি করেছিলেন তা ছিল সমকোণ এবং জ্যামিতিক গঠনের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়া। ভেন্চুরি ডিজাইনকৃত ডেলাওয়্যার (Delaware)-এর বাড়িতে (১৯৭৮) প্রাচীন স্তম্ভ ব্যবহার আরো দুঃসাহসিক কাজ।

২৬০ রবার্ট ভেন্চুরি : পেনসিলভ্যানিয়ার চেস্টনাট হিলে মায়ের জন্য বাড়ি, ভান্না ভেন্চুরি হাউস

নিউ ইয়র্কে এ.টি. অ্যান্ড টি (AT&T) প্রধান কার্যালয়ের (১৯৭৮-৮৪) সম্মুখের চূড়ায় গ্রিক স্থাপত্যের অনুকরণে ত্রিকোণাকৃতির গঠনের উপরের কোণার একটি বিশাল বৃত্তাকার অংশ স্থপতি ফিলিপ কর্টেলইউ জনসন (Philip

Cortelyou Johnson) (১৯০৬-) যেন কৌতুকবশত কেটে বাদ দেন। উপরন্তু এই ভবনে গথিক, রেনেসাঁ, নব্য-ক্ল্যাসিকাল, এবং আর্ট ডেকো স্থাপত্যের উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

জ্যামিতিক গঠনকে ভেঙ্গে ত্রিকোণাকৃতির জমিতে ইয়োহ্ মিং পেই (Ieoh Ming Pei) (১৯১৭-) ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গ্যালারির (National Gallery) (১৯৭৮) জন্য এক চিত্তাকর্ষক নক্‌শা উপহার দেন।

২৬১ নিউ ইয়র্কে এ.টি. অ্যান্ড টি ভবন : ফিলিপ জনসন

পোস্ট-মডার্ন স্থাপত্যের অনুসরণকারীরা ক্ল্যাসিকাল বা প্রাচীন গ্রিক ও রোমান শিল্পের কারুকার্যের মতো স্তম্ভ, ঝর্ণা, রেলিং (railing) ইত্যাদি নতুন আঙ্গিকে, নতুন সামগ্রী (প্লাস্টিক্স (plastics), নিওন (neon) বাতি, অ্যালুমিনিয়াম (aluminium) ইত্যাদি), নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে নির্মাণ করেছে। সবাই মিলে যেন স্থাপত্য নিয়ে আনন্দফূর্তিতে মেতে উঠেছে। অনেকের মতে আধুনিক স্থাপত্যের ব্যর্থতাই পোস্ট-মডার্নকে এই সুযোগ করে দিয়েছে।

সমকালীন ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থপতির কাজেও প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৬০ সালের পরের ধারা অনুযায়ী স্থপতি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর সৃষ্ট স্থাপত্যেই প্রকাশ করতে থাকলেন।

২৬২ আই. এম. পেই ডিজাইনকৃত ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গ্যালারি

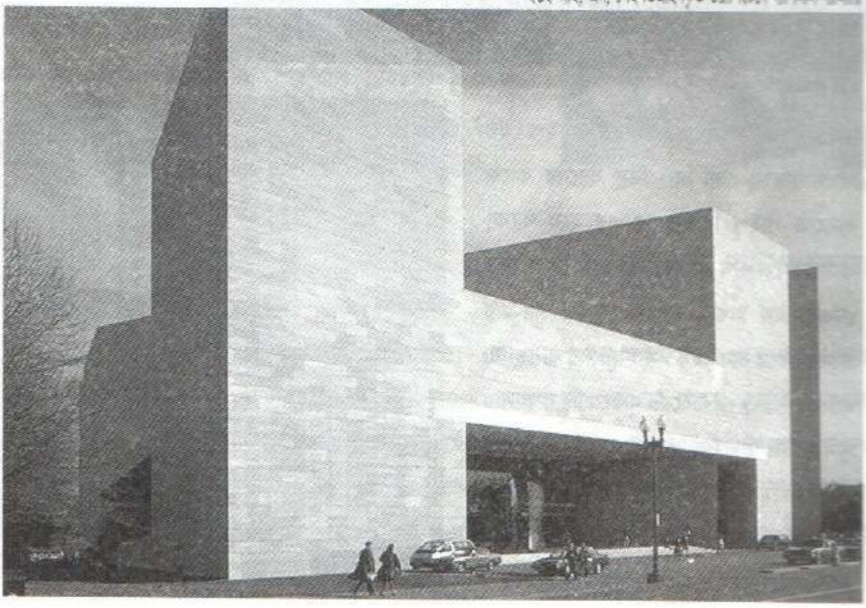

"হাই টেক" (High Tech) স্থাপত্যরীতি

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দ্রুত-উন্নত নির্মাণ শিল্পের সাহায্যে হাই টেকনলজি (High Technology) বা উঁচু মানের প্রযুক্তির স্থাপত্য রীতি চলমান "হাই টেক" জীবনধারণের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। উন্নত দেশে মেশিনের উপর মানুষ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। মেশিনের প্রভাব কম-বেশি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মেশিন এবং উন্নত প্রযুক্তির সৌন্দর্যতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আবির্ভূত হয়েছে "হাই টেক" স্থাপত্য। মেশিনের সৌন্দর্য ও গঠন প্রদর্শনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের স্থাপত্য।

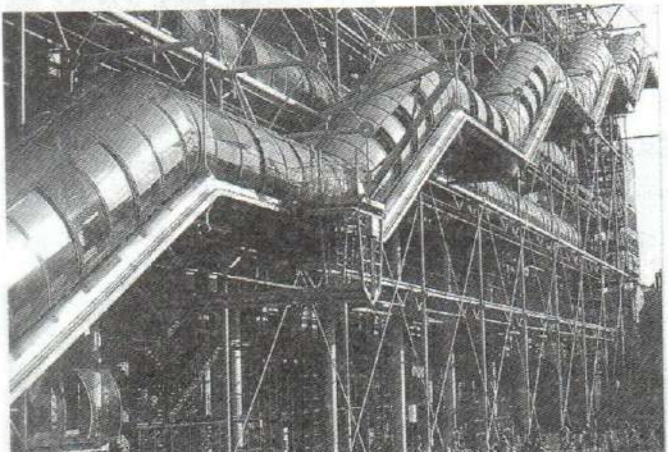

২৬৩ প্যারিসে পম্‌পিদ্যু ন্যাশনাল সেন্টার: রিচার্ড রজার্স এবং রেন্‌জো পিয়ানো

বহুতল ভবনে ওঠানামা করার জন্য ব্যবহৃত লিফ্‌টের প্রকোষ্ঠ কাচ দিয়ে ঘিরে দেয়া হয় এবং ভবনের বাইরে তা ওঠানামা করে। চলমান গতিশীল সিঁড়ি কাঠামো হতে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ও পানি সরবরাহের পাইপ হয় পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত। ভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহৃত পাইপ বিভিন্ন রঙ-এর হয়ে থাকে; কাঠামোগত থাম বা দেয়াল স্টীল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয় অথবা উজ্জ্বল কোনো রঙ-এর প্রলেপ দিয়ে ঢাকা হয়। সব ধরনের ব্যবস্থা বা সার্ভিস (service) ভবনের বাইরে নিয়ে আসার সুবিধা হল ভবনের অভ্যন্তরে বাড়তি জায়গা পাওয়া যায়। অফিস, কারখানা, মিলনায়তন, আর্ট গ্যালারি (Art Gallery) ইত্যাদির জন্য এই প্রযুক্তি বিশেষভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

২৬৪ হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংক : নরমান ফস্টার

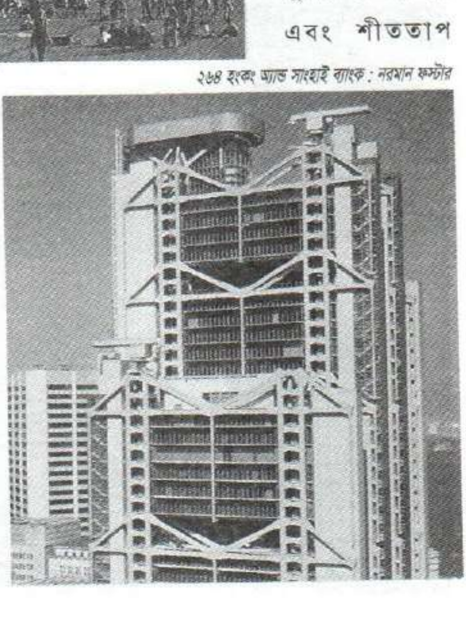

২৬৫ লন্ডনে লয়েড্স বিল্ডিং : রিচার্ড রজার্স

এ সময়কার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে প্যারিসে রিচার্ড রজার্স (Richard Rogers) (১৯৩৩-) এবং রেন্জো পিয়ানো (Renzo Piano) (১৯৩৭-) ডিজাইনকৃত জর্জ পম্‌পিদ্যু ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্ট অ্যান্ড কাল্‌চার (Georges Pompidou National Centre for Art and Culture) (১৯৭১-৭৭), হংকং-এ নরমান ফস্টার (Norman Foster) (১৯৩৫-) ডিজাইনকৃত হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংক (Hongkong and Shanghai Bank) (১৯৭৯-৮৬) এবং লন্ডনে রিচার্ড রজার্স কর্তৃক ডিজাইনকৃত লয়েড্স বিল্ডিং (Lloyd's Building) (১৯৭৮-৮৬)।

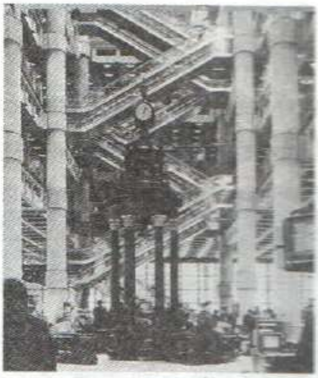

২৬৬ হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংক এর অভ্যন্তর

পম্‌পিদ্যু সেন্টার এবং লয়েড্স ব্যাংকে স্থপতিরা সিঁড়ি, লিফট্ এবং বিদ্যুৎ, পানি, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদির পাইপসমূহ (যা চিরাচরিতভাবে চোখের আড়ালে রাখা হতো) প্রযুক্তির স্বাক্ষর হিসেবে ভবনের বাইরের দিকে স্থাপন করেন।

বিপ্লবের অপেক্ষায়

সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবেই হোক কিংবা প্রাচীনত্বের কারণেই হোক, স্থাপত্যের শুরু কোথায় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। আর স্থাপত্যের শেষ বলতে কিছু নেই। মানুষ, জীবন যাপন, সমাজ, প্রযুক্তি, ইত্যাদি সর্বদা পরিবর্তনশীল। কখনও এই পরিবর্তনগুলো বৈপ্লবিক, অন্যান্য সময় গতি তার অতি মন্থর। যে সব উপাদানের উপর স্থাপত্য নির্ভরশীল তা সবই যখন কোনো না কোনোভাবে পরিবর্তনশীল তখন স্থাপত্য সর্বদা নতুন আঙ্গিকে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে এটাই স্বাভাবিক, হচ্ছেও তাই। আমরা শুধু পরবর্তী স্টাইল, স্থাপত্যের কোনো বৈচিত্র্যময় রীতি, কোনো বিপ্লবের অপেক্ষায় আছি।

হিন্দুদের মন্দির স্থাপত্য

হিন্দু স্থাপত্য মূলত ভারতে দেখা যায়। হিন্দুরা পাহাড়-কাটা এবং কাঠামোগত মন্দির নির্মাণে সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে। তবে মন্দিরের সর্বত্র ভাস্কর্যের ব্যবহার এবং পাথরের অলঙ্করণের মাত্রা, ধরন ও ব্যাপকতা ঈর্ষণীয় তো বটেই, তুলনামূলক শিল্পকর্ম সমগ্র বিশ্বে বিরল।

হিন্দু ধর্মে পাহাড়-কাটা স্থাপত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটে মহাযানী বৌদ্ধদের শত শত বছর পরে; কার্যত সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীতে। বলা বাহুল্য প্রারম্ভিক হিন্দু মন্দিরগুলোতে প্রায়শই বৌদ্ধ কারিগরি ও শিল্পকর্মের ছাপ দেখা যায়।

২৬৭ হিন্দু মন্দিরের অংশবিশেষ

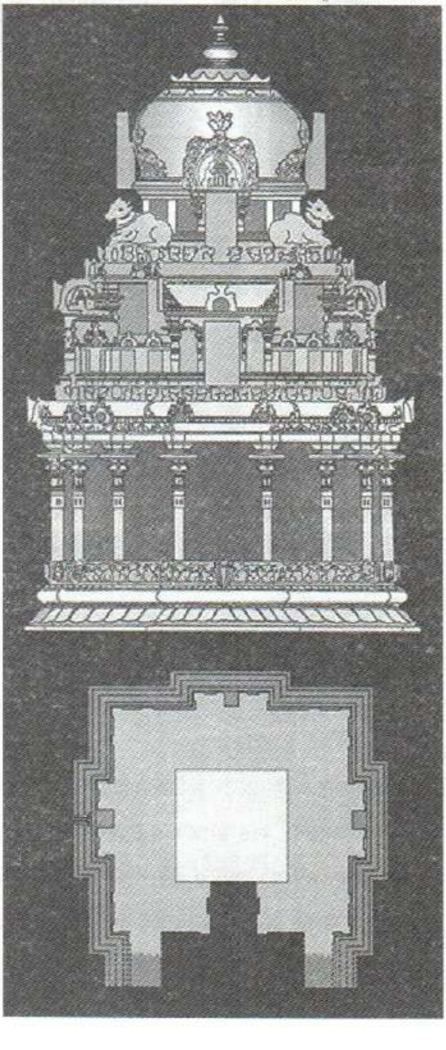

ইলোরায় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর হিন্দু এবং অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর জৈন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির রয়েছে। ইলোরায় হিন্দু কৈলাস মন্দির (৭৬০ সাল) বিরাট আকার এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য সর্বজন সমাদৃত। আবার ঐ ইলোরার পাহাড়ে হিন্দু কৈলাস মন্দিরের ছোট প্রতিকৃতি তৈরি করেছে পরবর্তীকালে জৈন ধর্মাবলম্বীরা। এভাবেই স্থাপত্যের ধারা এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্ম, এক জনগোষ্ঠী হতে আরেক জনগোষ্ঠীতে হস্তান্তর হয়ে আসছে।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দু মন্দিরের কাঠামোগত আকৃতি পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ এবং হিন্দু ভবনে একটার উপর আর একটা পাথর বসানো হতো; পানির সাথে সুরকি বা বালি মিশ্রিত কোনো মশলা (mortar) ব্যবহার হতো না।

ঐশ্বরিক প্রতীক রাখার জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহ (garbagriha), ভক্তদের সমবেত হবার জন্য থাম-বিশিষ্ট হলঘর বা মণ্ডপ (mandapa), এবং অন্যান্য ভবন যে জমিতে অবস্থান করত তা দেয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত। বড় প্রবেশদ্বার ও শোভনীয় প্রবেশপথ দিয়ে মন্দির এলাকায় প্রবেশ করা হতো।

হিন্দু মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সুচারু মূর্তি দিয়ে এর সর্বত্র সাজানো। দেয়ালের গায়ে নানা ভঙ্গিমায় পাথরে বা পোড়ামাটিতে খোদাই করা অসংখ্য মূর্তি মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করত। অলঙ্করণ এবং ভাস্কর্যের কাজ দালানের গায়ে করা হতো। অভ্যন্তরের তুলনায় মন্দিরের বাইরের দিকটাকে হিন্দুরা অধিক প্রাধান্য দিত। মন্দিরের সর্বত্র এত অত্যধিক মাত্রায় অলঙ্করণ করা হতো যে হিন্দু মন্দিরকে স্থাপত্য কীর্তির চেয়ে ভাস্কর্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

স্থাপত্যের বিশ্লেষণে হিন্দু মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

(ক) বিমান (vimana) বা দেউল (deul), অর্থাৎ পবিত্র স্থান;

(খ) শিখর (shikhara), অর্থাৎ চোঙ্গা জাতীয় বিমানের ছাদ;

(গ) গর্ভগৃহ (garbagriha), অর্থাৎ বিমানের অভ্যন্তরে যে কক্ষে ঐশ্বরিক প্রতীক রাখা হয়;

(ঘ) মণ্ডপ (mandapa) বা জগমোহন (jagmohon), অর্থাৎ থামবিশিষ্ট হলঘর, যেখানে ভক্তরা সমবেত হয়।

পুরাতন কিছু মন্দিরে মণ্ডপ এবং বিমান আলাদা ভবন হিসেবে তৈরি করা হয়েছে; যেমন মাদ্রাজের নিকট মামাল্লাপুরমের (Mamallapuram) শো'র মন্দির (Shore Temple) (৭০০ সাল)। পরবর্তীতে ঐ দুটি আলাদা ভবন যখন সংযোগ করা হয় তখন মধ্যবর্তী যে ঘরটা আবির্ভূত হয় তাকে বলা হয় অন্তরাল (antarala)। মণ্ডপের সম্মুখভাগে একটি বারান্দার মতো স্থান রয়েছে যার নাম অর্ধ-মণ্ডপ। এছাড়া মণ্ডপের দুই পাশে মহামণ্ডপ থাকতে পারে। সকল বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ মন্দিরের মধ্যে দশম শতাব্দীর খাজুরাহোর (Khajuraho) মন্দিরগুলো অন্যতম।

২৬ মমল্লাপুরম পুরাতন মন্দির

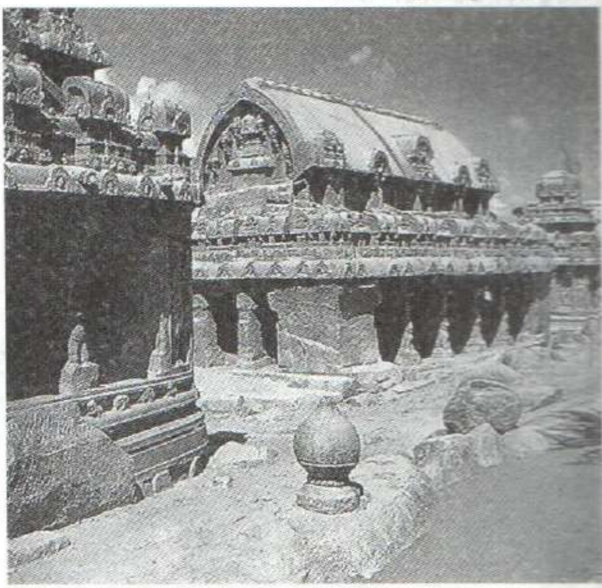

কোনো কোনো এলাকায় মন্দির চত্বরের সীমানায় সারিবদ্ধ ছোট ছোট কক্ষ বা উপাসনালয় প্রধান মন্দিরের দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়। বিগত দিনে এমন প্রথা বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেও প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ (Jagannath) (১১০০-১৮) মন্দির এই বৈশিষ্ট্যের সুন্দর উদাহরণ। সীমানার দেয়ালে

২৬৯ খাজুরাহোর মন্দির

সারিবদ্ধ কক্ষবিশিষ্ট এবং মন্দিরের সকল বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ প্রাচীনতম মন্দিরের মধ্যে কাঞ্চিপুরমের (Conjeeveram) বৈকুণ্ঠনাথ পেরুমাল (Vaikuntha Perumal) (৭১০-২০ সাল) অন্যতম। এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশকে দেখতে আলাদা মনে হয় না; বরং একটি অংশ আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত।

অধিক কারুকার্য, নিখুঁত কারিগরি দক্ষতা, অবিশ্বাস্য অলঙ্করণ দিয়ে পাথরের তৈরি মন্দিরগুলো চারুশিল্পের অহংকার রূপে প্রকাশ পায়। তবে নান্দনিক সৌন্দর্যের আগে মন্দির নির্মাণে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ও ধর্মীয় বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

২৭০ কাঞ্চিপুরমের বৈকুণ্ঠনাথ পেরুমাল মন্দির

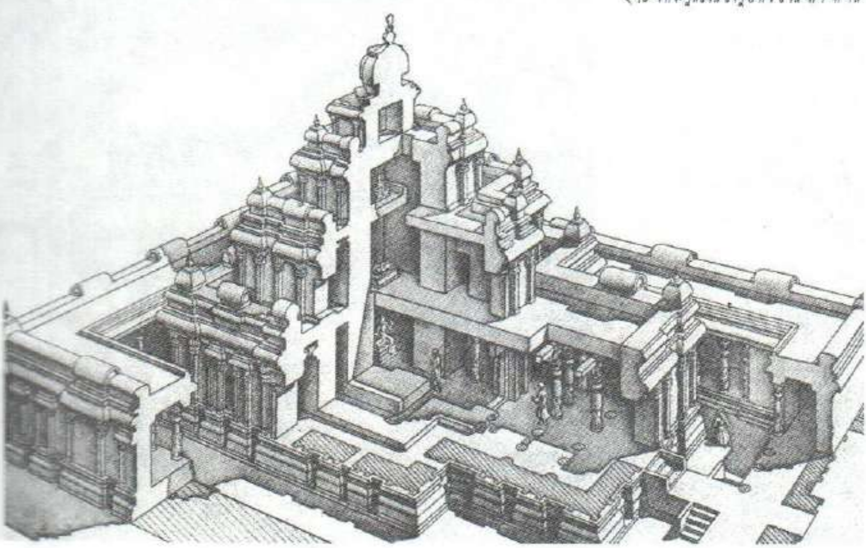

প্রধানত চার ধরনের মন্দির দেখা যায়; যথা ঃ

(ক) পাহাড় খোদাই করে এমন ভাবে মন্দির তৈরি যে মন্দির পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকত (৬০০-৯০০সাল)।

(খ) দ্রাবিড়ীয় স্টাইল, যেখানে পাহাড়-কাটা ও কাঠামোগত উভয় পদ্ধতিতেই মন্দির তৈরি হতো (৬০০ সাল হতে ১৭শ শতাব্দী)।

(গ) উত্তর ভারতীয় স্টাইল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উড়িষ্যা বা কলিঙ্গ (৭৫০-১২৫০), রাজপুতানা এবং মধ্য-ভারত (৭০০-১০০০) এবং খাজুরাহোর (৭৫০-১০৫০) মন্দিরগুলো। মন্দিরের ছাদ মোচাকৃতির হতো, অর্থাৎ দেখতে চোঙ্গার মতো। এই ছাদ অবশ্য মূর্তি, নক্শা, কারুকার্য দিয়ে অলঙ্করণ করা হতো।

(ঘ) চালুক্য (Chalukya) স্টাইল (৪৫০ সাল হতে ১৪শ শতাব্দী), যেখানে একটি প্রধান চোঙ্গার চারপাশে একাধিক ছোট ছোট চোঙ্গা দিয়ে মন্দিরের ছাদ ঢাকা থাকত।

পাহাড়-কাটা স্থাপত্যের চূড়ান্ত রূপ

মহাযানী বৌদ্ধদের (৪৫০-৬৪২ সাল) অবলুপ্তির অনেক পরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সক্রিয়তায় তিনটি স্থানে পাহাড়-কাটা স্থাপত্য চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ঃ যথা-

(ক) ইলোরায় (Ellora) পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে আধা মাইল ধরে একাধিক মন্দির (হিন্দু ও জৈন ধর্মের

২৭) মন্দিরে-আবৃত ইলোরার পাহাড়

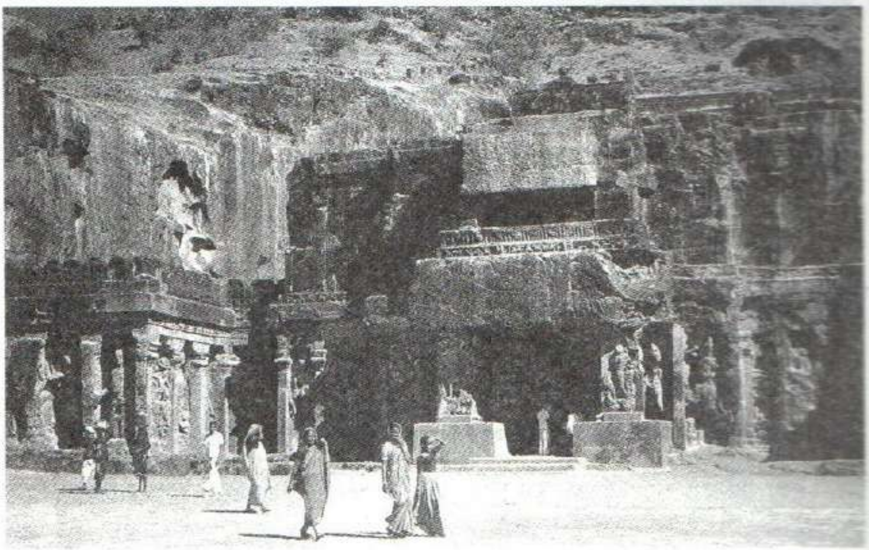

মন্দির);

(খ) মুম্বাই শহরের অদূরে সমুদ্র কোলে এলিফ্যান্টা (Elephanta) (মধ্য অষ্টম শতাব্দী) ও সালসেট্ (Salsette) দ্বীপে যোগেশ্বর (Jogeshwara) মন্দিরে (৮০০ সাল) একাধিক প্রবেশদ্বার-বিশিষ্ট হল ঘরের মাঝে হিন্দুদের পূজার বেদী; এবং

(গ) মাদ্রাজের নিকট পহলভ সাম্রাজ্যের কিছু গুহা, যা দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের সূচনা চিহ্ন হিসেবে বর্তমান।

২৭২ এলিফ্যান্টা

হিন্দুদের পাহাড়-কাটা মন্দির

ইলোরায় চার ধরনের ষোলটি হিন্দু মন্দির দেখা যায় ঃ

১. *পাহাড় কেটে থাম-বিশিষ্ট বারান্দা সমেত এক ঘরের মন্দির;*
২. *গর্ভগৃহের চারপাশে চলার পথ সমেত মন্দির;*
৩. *ক্রুশাকৃতিতে সাজানো কতকগুলো হলঘরের মধ্যখানে আলাদা গর্ভগৃহের মন্দির;*
৪. *পাহাড় হতে সম্পূর্ণ আলাদা মন্দির।*

প্রথম ধরনের উদাহরণ হিসেবে দশ অবতার (Das Avatar) (সপ্তম শতাব্দী) দোতলা হবার কারণে, দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে রামেশ্বর (Rameswara) (সপ্তম শতাব্দী), তৃতীয় পদের মধ্যে দুমার লেনা (Dumar Lena) (সপ্তম শতাব্দী) এবং চতুর্থ পদে একখানি পাথরের তৈরি কৈলাস (Kailasa) (অষ্টম শতাব্দী) মন্দির উল্লেখ্য।

দুমার লেনা মন্দির বিশাল আকার এবং স্থাপত্যের গুণাবলির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানকার থামবিশিষ্ট প্রধান হলঘরটি দৈর্ঘ্যে দেড়শত এবং প্রস্থে পঞ্চাশ ফুট; মাঝখানে রয়েছে গর্ভগৃহ। হলঘর থেকে গর্ভগৃহে চারদিক থেকে প্রবেশ করা যায়। তবে চারটি প্রবেশপথের সিঁড়ির উভয় পাশে রয়েছে বিরাট আকারের জীবজন্তুর মূর্তি। পরবর্তীকালের খোদাইকৃত এলিফ্যান্টা (Elephanta) (মধ্য অষ্টম শতাব্দী) ও সালসেট্ (Salsette) দ্বীপের যোগেশ্বর মন্দিরের (অষ্টম শতাব্দী) সাথে দুমার লেনার সাদৃশ্য রয়েছে।

কৈলাস মন্দির বা শিবের (Siva) স্বর্গ (অষ্টম শতাব্দী) পাহাড় কেটে এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে মনে হয় ভবনটি কাঠামোগতভাবে আদি পাহাড় হতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। প্রধান মন্দির দৈর্ঘ্যে দেড়শত এবং প্রস্থে একশত ফুট। একশত বছর ধরে অসংখ্য শিল্পী ও কারিগর অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পাথর কেটে যা সৃষ্টি করেছে তা ভবন তো নয়, যেন ভাস্কর্য। মন্দির ছাড়া এখানে প্রধান ফটক, মধ্যবর্তী একটি তীর্থস্থান এবং থামবিশিষ্ট বারান্দা রয়েছে।

জৈন পাথর-কাটা মন্দির

ইলোরায় পাঁচটি জৈন মন্দিরও আছে। হিন্দু মন্দিরগুলো থেকে খানিকটা দূরে কিন্তু তার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত। এগুলো অষ্টম-নবম শতাব্দীতে তৈরি। এখানকার ছোট কৈলাস মূলত হিন্দু কৈলাসের ছোট সংস্করণ।

দ্রাবিড় স্টাইল

এদিকে দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় স্টাইল নামে ভিন্ন এক স্থাপত্য রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পহলব (Pallava) (৬০০-৯০০ সাল), চোল (Chola) (৯০০-১১৫০), পাণ্ড্য (Panda) (১১০০-১৩৫০), বিজয়নগর (Vijaynagar) (১৩৫০-১৫৬৫) এবং মাদুরা (Madura) (১৬০০ সাল হতে) এই পাঁচ সাম্রাজ্যে দ্রাবিড় স্টাইলের বিকাশ ঘটে।

পহ্লবদের মন্দির ও রথ স্থাপত্য

২৭৩ সপ্তরথ বা সেভেন প্যাগোডা, মামাল্লাপুরাম

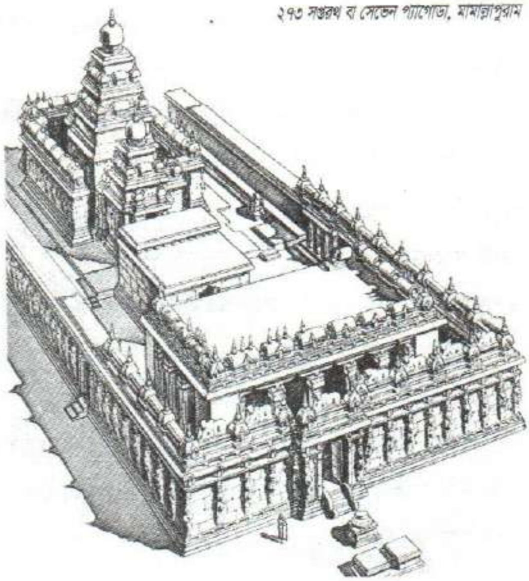

পহ্লব আমলের প্রথম শত বছর পাহাড়-কাটা মণ্ডপ এবং রথ প্রাধান্য পায়। পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ মন্দিরগুলো কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।

পহ্লবদের প্রধান স্থাপত্য নিদর্শনগুলো মাদ্রাজের দক্ষিণে মামাল্লাপুরমে অবস্থিত। সেখানে ৬৪০-৬৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে দুই ধরনের মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে: মণ্ডপ (mandapa) এবং রথ (ratha)।

দুই ঘর-বিশিষ্ট মণ্ডপগুলো কতকটা গুহার মতো এবং কখনো পাহাড় হতে বিচ্যুত হতো না। অন্যদিকে পহ্লবদের পাহাড়-কাটা রথ-মন্দিরের বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কাটা সম্পন্ন হবার পর এর কোনো পাশ আর পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকত না; মনে হয় যেন মন্দিরটি আলাদাভাবে থাম, বীম, ইত্যাদি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

২৭৪ মামাল্লাপুরমের শো'র মন্দির

গ্রানাইট (granite) পাথরের পাহাড় কেটে দশটা মণ্ডপ বা হলঘর তৈরি করা হয়েছিল যার প্রতিটির মোটামুটি আয়তন প্রস্থে ও গভীরতায় ২৫ ফুট এবং উচ্চতায় ১৫ থেকে ২০ ফুট। মণ্ডপের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহ পাঁচ থেকে দশ ফুট মাপের আয়তক্ষেত্র। এক থেকে দেড় ফুট ব্যাসার্ধের থামের উচ্চতা নয় ফুট। তবে মন্দিরের কারিগর যে একজন ভাস্কর ছিলেন স্থাপত্যের গুণাবলিতে তা স্পষ্টত ফুটে উঠেছে।

মণ্ডপের পাশাপাশি মামাল্লাপুরমে রথ নামে আর এক ধরনের পাথর-কাটা মন্দির রয়েছে। একক পাথর হতে খোদাই করা প্রতিটি রথ-মন্দির একা দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের সৈকতে। অষ্টম শতাব্দীর রথ-মন্দিরগুলো, সংখ্যায় আটটি, সম্মিলিতভাবে সপ্তরথ বা সেভেন প্যাগোডা (Seven Pagodas) (৬৫০সাল) নামে বহুল পরিচিত। মূলত পহ্লব কারিগরগণ পাথর কেটে সেভেন প্যাগোডা খ্যাত মন্দিরগুলোতে সেই আমলের কাঠের তৈরি রথের হুবহু প্রতিকৃতির স্থায়ী আকার দেন। যে আটটি রথ রয়েছে সেগুলো আকৃতিতে খুব একটা বড় নয়; সবচেয়ে বড় রথটি ৪২ ফুট লম্বা। মামাল্লাপুরমে একক পাথরের রথ ছাড়া অন্যান্য প্রকারের রথও রয়েছে।

সুদক্ষ কারিগরের তৈরি মূর্তি ও ভাস্কর্য পহ্লবের মণ্ডপ এবং রথ স্থাপত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পহ্লবের এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে এলিফ্যান্টায় দেখা যায়। তবে মামাল্লাপুরমের পাথরের স্থাপত্য রহস্যজনক কারণে অসম্পন্ন থেকে যায়; রথ-মন্দিরগুলো কোনোদিন ব্যবহারও হয়নি।

পহ্লবদের শেষের দিকের স্থাপত্য ছিল প্রধানত কাঠামোগত, তন্মধ্যে শো'র (Shore) মন্দির (৭০০ সাল) উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র সৈকতে সূর্যোদয়ের প্রথম কিরণগ্রহণ করতে পারে এমন পরিকল্পনা করে মন্দিরটি স্থাপন করা হয়েছে। আজ হাজার বছরের উপরে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ শো'র মন্দিরের গায়ে আঘাত হানছে; তবুও সেটা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেকালের কারিগরি দক্ষতার সাক্ষী হয়ে। যদিও বা পূর্ববর্তী রথ স্থাপত্যের সাথে খানিকটা মিল রয়েছে, তবু একখানি মাত্র পাথরের স্থাপত্যের তুলনায় কাঠামোগত শো'র মন্দির অধিক ছন্দময়; দেখতে তুলনামূলকভাবে অধিকতর হালকা।

চোলদের স্থাপত্যের নিদর্শন

চোলদের আমলেও দ্রাবিড় স্টাইল গঠনাত্মক পর্যায়ে ছিল। গ্রানাইটের চৌকোণ (granite block) একটার সাথে আরেকটি সংযুক্ত করে দেয়াল তৈরি করা হচ্ছিল। চোলদের ছোট ছোট স্থাপত্যের নিদর্শনেও সজীবতা এবং উচ্ছ্বাস লক্ষণীয়।

ত্রিচিনোপলিতে (Trichinopoly) কোরাঙ্গনাথ (Koranganath) মন্দির (৯৪০ সাল) চোল রীতির গোড়ার দিকের বিশিষ্ট নমুনা। ভাস্কর্যসম অলঙ্করণের বিলুপ্তি ঘটে; সাদামাটা খালি দেয়াল

BANSDOC Library Dhaka

ছিল তখনকার রীতি। পূর্বে ব্যবহৃত সিংহ এবং অলৌকিক জীবজন্তুর পরিবর্তে চোলমন্দিরগুলোতে দেখা যায় অদ্ভুত এক কাল্পনিক জীব; যার মাথা ও ডানা ঈগল পাখির মতো এবং দেহ সিংহের।

চোলদের অর্জিত শক্তি প্রকাশ পায় একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বিরাটাকার ও চমকপ্রদ দুটি মন্দিরে। লম্বায় ও উচ্চতায় ১৯০ ফুট, তানজোরের শিব মন্দির (১০০০) তৎকালীন সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ মন্দির তো বটেই,কারুকাজ এবং স্থাপত্যের বিচারেও অত্যন্ত উঁচু মাপের শৈল্পিক সৃষ্টি।

চোলদের অন্য বড় ধরনের মন্দির হলো ১০২৫ সালে তৈরি গঙ্গাইকোণ্ডা চোলাপুরম (Gangaikonda Cholapuram) মন্দির। ততদিনে চোল সাম্রাজ্য পূর্ণতা লাভ করেছে। লম্বায় ৩৪০ ফুট হলেও উচ্চতায় ১৫০ ফুট এই মন্দিরে দেড়শত থাম বিশিষ্ট একটি হলঘর রয়েছে।

২৭৫ তানজোর-এ মন্দির

পাণ্ড্য সাম্রাজ্য

২৭৬ মাদুরার মন্দিরে গোপুরম

বিশাল প্রবেশদ্বার বা তোরণ ব্যতীত পাণ্ড্য সাম্রাজ্যকালে বড় ধরনের স্থাপত্যের কোনো কাজ হয়নি। গোপুরম (gopuram) নামে পরিচিত এই সদর দরজার ইতিহাস শুরু হয় গ্রামের গোয়াল ঘরে; পরে রূপান্তরিত হয় শহরের গেটে এবং সর্বশেষে মন্দিরের প্রধান ফটকে।

সাধারণত গোপুরাম লম্বাটে ধরনের একটি দালানের মতো ছিল যার লম্বা দিকের

মাঝখান দিয়ে প্রবেশপথ রাখা হতো। উপরের দিকে ক্রমাগত সরু হয়ে গোপুরম অস্বাভাবিক উচ্চতা অর্জন করত। দেড়শত ফুট উঁচু মাদুরার গোপুরম আজও মানুষকে বিস্মিত করে।

বিজয়নগরের স্থাপত্য

দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজ্যকে তৎকালীন সর্বজয়ী মুসলমানদের দখল হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিজয়নগরে স্থাপিত হয় এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের রাজধানী। চোলদের মতো বিরাটাকার ভবন তৈরি না করেও সংযত আকারের দালান দলবদ্ধ করে দালানের গায়ে ব্যয়বহুল অলঙ্করণ ব্যবহার ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। অপরূপ সুন্দর অলঙ্করণের জন্যই বিজয়নগরের ভিথ্থালা (Vitthala) মন্দির (১৫১৩-৪২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি এত বিশাল কাজ ছিল যে ভিথ্থালা শেষ পর্যন্ত কোনোদিনই সম্পূর্ণ হয়নি।

২৭৭ বিজয়নগরের ভিথ্থালা মন্দির

মাদুরা রীতি

মধ্য ১৬শ শতাব্দীতে মুসলমানদের আগ্রাসনের ফলে তামিল দেশে হিন্দুদের রাজধানী আরো দক্ষিণে মাদুরায় স্থানান্তর করতে হয়। দ্রাবিড় স্টাইলের সর্বশেষ এই পর্যায় আধুনিককাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

মাদুরা রীতির আমলে পুরাতন মন্দির উন্নয়ন ও বর্ধন করে মন্দিরশিল্পকে আরো চমকপ্রদ করার চেষ্টা করা হয়। গোপুরম এই মাদুরা আমলেই পূর্ণতা লাভ করে। গোপুরমের গায়ে সেঁটে দেওয়া অসংখ্য মূর্তি দ্বারা হিন্দু পুরাণতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেওয়া হতো। মাদুরা স্টাইলে মাদুরা মন্দির (১৬শ-১৭শ শতাব্দী) এবং ত্রিচিনোপলিতে (Trichinopoly) এই রীতির বিশালতম উপাসনালয় শ্রীরঙ্গম (Srirangam) মন্দির (১৩শ-১৮শ শতাব্দী) উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন।

যদিও বা মাদুরা রীতিতে মন্দির প্রসার করা হতো, মাদুরা মন্দির কিন্তু একবারেই নির্মাণ করা

হয়েছিল। মূলত দুটি মন্দির, একটি শিব এবং অন্যটি মীনাক্ষীর প্রতি উৎসর্গিত। এটি ১৭শ শতাব্দীর স্থাপত্যের গর্বিত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় পনেরো একর জমির উপর দেয়াল দিয়ে ঘেরা মন্দির এলাকায় প্রবেশ করতে হয় চারটি বিরাট গোপুরম দিয়ে। তারপর আরো চারটি ছোট গোপুরম দিয়ে প্রবেশ করতে হয় আরো গভীরে অন্য এক সীমানার ভিতর। প্রধান তীর্থস্থান আরো অভ্যন্তরে অবস্থিত।

শ্রীরঙ্গম (Srirangam) মন্দির দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় ভবন। এই মন্দির শত শত বছর ধরে, ১৩শ থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত, নির্মিত হয়েছে। প্রায় পাঁচ শত বিঘা জমির উপর অবস্থিত মন্দির এলাকায় ছোট-বড় মিলে একুশটি গোপুরম রয়েছে। সাতটি এককেন্দ্রিক বেষ্টনীর মধ্যখানে রয়েছে তীর্থস্থান। গোপুরমগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে যেন ভিতর থেকে বাইরে যেতে ক্রমান্বয়ে উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বাইরের দুটি গোপুরম অসমাপ্ত রয়েছে; তবে সম্পন্ন হলে এদের এক একটির উচ্চতা হতো প্রায় ৩০০ ফুট।

২৭৮ শ্রীরঙ্গম মন্দির

উত্তর ভারতীয় উড়িষ্যা স্টাইল

উত্তর ভারতীয় স্টাইল ব্যাপক এলাকা জুড়ে সমৃদ্ধি লাভ করে। তাই ভৌগোলিক ভিত্তিতে এর আলোচনা শ্রেয়। উড়িষ্যার মন্দিরগুলো ভুবনেশ্বর (Bhubenswar) শহরে কেন্দ্রীভূত হলেও এর কিছু দূরে পুরীতে (Puri) জগন্নাথ (Jagannath) মন্দির (১১০০) এবং কোনারক (Konarak)-এ সূর্য মন্দির বা সান টেম্পল (Sun Temple) (১২৫০) এই স্টাইলের অন্যতম বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

উড়িষ্যার মন্দিরে মূলত দুটি অংশ ঃ তীর্থস্থান বা দেউল (deul) এবং সম্মুখের হলঘর বা জগমোহন (Jagmohon), যা দ্রাবিড় স্টাইলে মণ্ডপ নামে পরিচিত। সমাজের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ক্রমে আরো ভবনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন পরবর্তীকালে যোগ হয় নাচঘর বা নট-মন্দির এবং এর সম্মুখে উৎসর্গ করার ঘর বা ভোগ (bhog) মন্দির। সব ভবনই একটি কাল্পনিক রেখা বা অক্ষের (axis) উপর অবস্থিত ছিল। ছাদ সাধারণত চোঙ্গার মত দেখতে হতো। দেউলের ছাদ

ছাপড়া এবং জগমোহনের ছাদ পিড়া (pida) নামে পরিচিত। মন্দিরের বাইরে অলঙ্করণ ব্যাপক আকার ধারণ করলেও অভ্যন্তর রাখা হতো সাদামাটা।

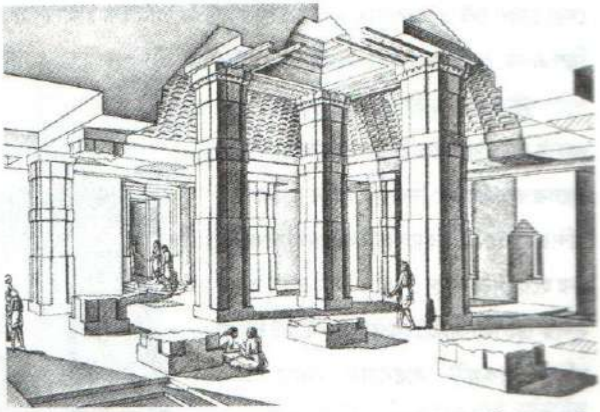
২৭৯ পুরীতে জগন্নাথ মন্দির

ভুবনেশ্বরের লিঙগরাজ (Lingaraj) মন্দির (১০০০) উড়িষ্যা স্টাইলের তো বটেই সামগ্রিকভাবে ভারতের অন্যতম স্থাপত্যকীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। উচুঁ পুরু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ষোল একর জমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লিঙগরাজ। প্রধান মন্দিরের চারিপাশে রয়েছে অনেকগুলো ছোট ছোট মন্দির।

দেউল (লিঙগরাজ-এ শ্রীমন্দির নামে পরিচিত) এবং জগমোহন বা মণ্ডপ নির্মিত হবার প্রায় একশত বছর পর নট- মন্দির এবং ভোগ-মন্দির যোগ হয়েছে। শ্রীমন্দির দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ৫৬ ফুট, উচ্চতায় প্রায় দেড়শত ফুট। উঁচু স্তম্ভাকৃতির ভবনের গায়ে লাগানো রয়েছে ক্ষুদ্রাকার অসংখ্য দেউলের প্রতিকৃতি। প্রতি পাশে রয়েছে সিংহ কর্তৃক হাতি নিধনের ভাস্কর্য, যা উড়িষ্যা স্থাপত্যে বহুল ব্যবহৃত একটি ধর্মীয় প্রতীক। কারুকার্য, উচ্চতা, দৃঢ়তা, ইত্যাদির জন্য লিঙগরাজ মন্দির আজও উড়িষ্যা স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করে।

২৮০ উড়িষ্যার মন্দিরের অংশবিশেষ

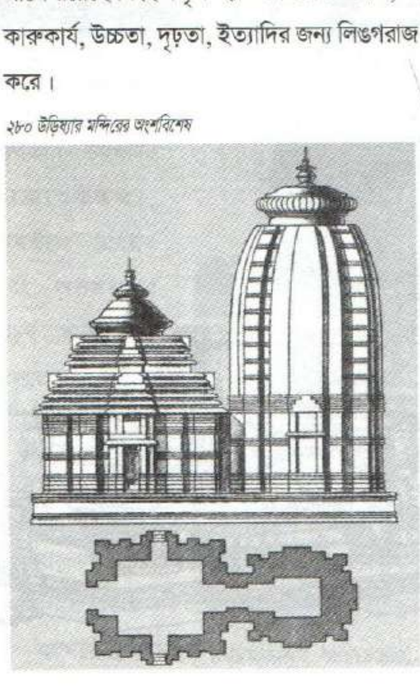

লিঙ্গরাজের একশত বছর পর একই ধারায় তবে বৃহৎ আকারে প্রায় ত্রিশ বিঘা জমিতে তৈরি হয়েছে বর্তমান পুরী শহরে জগন্নাথ মন্দির (১১০০)। এখানেও নট-মন্দির এবং ভোগ-মন্দির পরে, অর্থাৎ ১৪শ কিংবা ১৫শ শতাব্দীতে, যোগ করা হয়েছে। দেউলের উপর ২০০ ফুট উঁচু চোঙ্গা বা ছাপড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকার বহুদূর থেকে দেখা যায়।

জগন্নাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ষোলটি থাম-বিশিষ্ট নট- মন্দির। উড়িষ্যা স্থাপত্যে থামের ব্যবহার নেই বললেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধ পরিকল্পনার ন্যায় এখানেও মূল মন্দিরের চতুর্দিকে সাজানো রয়েছে ছোট ছোট প্রায় চল্লিশটি মন্দির। সমগ্র এলাকা তিনটি এক-কেন্দ্রীক দেয়াল দিয়ে

ঘেরা। বিশ ফুট উঁচু সবচেয়ে বাইরের দেয়ালটি পরে নির্মিত হয়েছে; ফলে মন্দিরের জমির মাপ দাঁড়িয়েছে ত্রিশ একর, দৈর্ঘ্যে ৬৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৬৪০ ফুট।

পুরীর বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে, অনেকটা একাই দাঁড়িয়ে আছে উড়িষ্যা স্টাইলের পরের দিকের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন কোনারকের সূর্য মন্দির (১২৫০)। কালের বিবর্তনে অনেকটাই ক্ষয় হয়ে গেছে সমুদ্র সৈকতে নির্মিত এই অপূর্ব সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি। অত্যধিক উচ্চাভিলাষী মন্দির প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য সেকালের নির্মাণ কৌশল যথেষ্ট ছিল না, তাই মন্দিরটি কখনো সম্পন্ন হয়নি। পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করার আগেই এর ভিত ধসে পড়ে। সূর্য মন্দিরের বিভিন্ন ভবন বা অংশ আলাদা প্রতীয়মান হয় না। বরং উড়িষ্যা স্টাইলের শেষের ভাগে এসে এই মন্দিরের সকল অংশ মিলে স্থাপত্যের ঐক্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। পাথরের নিখুঁত ভাস্কর্য এবং নিপুণ

২৮১ ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির

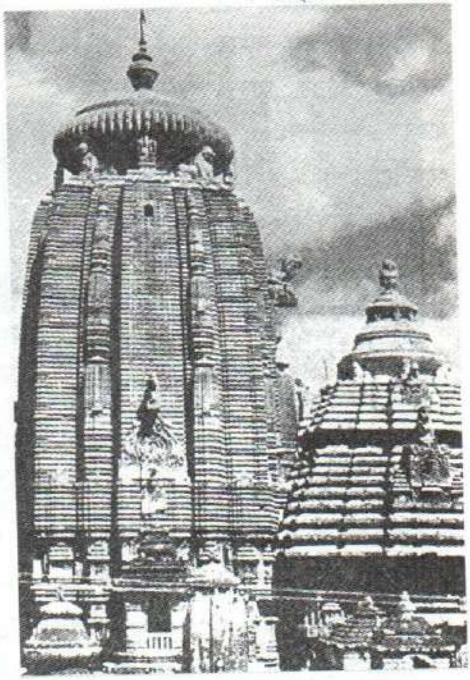

২৮২ কোনারক-এ সূর্য মন্দির

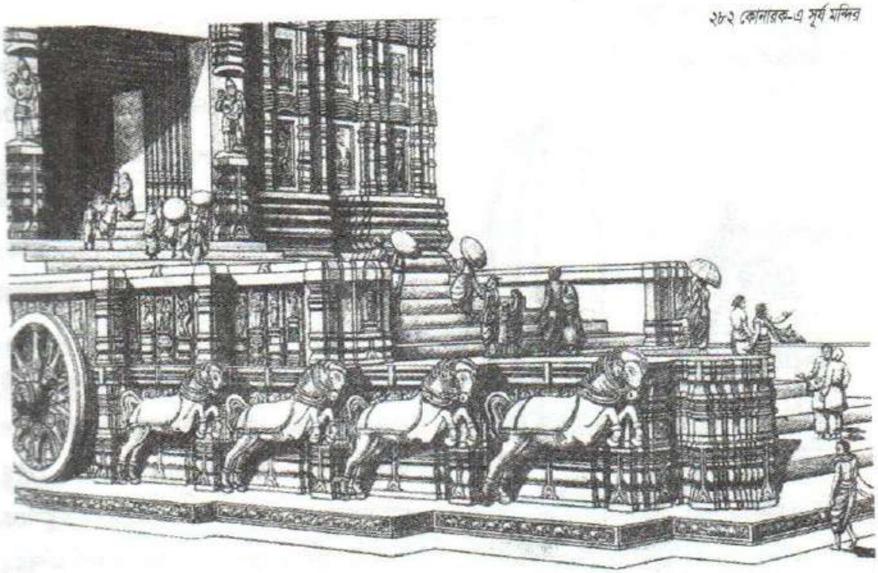

কারুকার্য দিয়ে দালানের বহিরাংশের সকল দেয়াল ঢাকা। তবে কিছু ভাস্কর্য নির্লজ্জতার ছাপ বহন করে।

রথের আকারে তৈরি সূর্য মন্দিরে বারটি দশ ফুট উঁচু বিশাল চাকা রয়েছে। পিরামিডের (pyramid) মতো জগমোহনের চূড়া বা পিডা উচ্চতায় ১০০ ফুট এবং দেউলের ছাপড়া ২২৫ ফুট। রথের দুই পাশে অলঙ্কৃত ঘোড়া যেন সর্বশক্তি দিয়ে এই বিশাল বোঝাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রথের সম্মুখে একটি নট-মন্দির এবং আশেপাশে বেশ কয়েকটি সুরুচিসম্পন্ন কীর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। দেয়াল দিয়ে ঘেরা এলাকার মাপ ছিল লম্বায় ৮৬৫ ফুট এবং প্রস্থে ৫৪০ ফুট। সর্বমোট তিনটি প্রবেশপথ ছিল।

উত্তর ভারতীয় খাজুরাহো স্টাইল

ঝাঁসি (Jhansi) শহরের একশত মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলো। প্রায় এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রায় যত্রতত্রভাবে ছড়িয়ে আছে পঁয়ত্রিশটি মন্দির। ৯৫০-১০৫০ সালে মধ্য-ভারতে বিরাজমান শিল্পীসুলভ প্রতিভা যে ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল খাজুরাজো তারই উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

২৮৩ খাজুরাহে কান্দারিয়া মহাদেও শিব মন্দির

খাজুরাহোর মন্দিরগুলো দেয়াল দিয়ে ঘেরা নয়; বরং উঁচু বেদীর উপর ভবনের সকল অংশ একীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে অপরূপ স্থাপত্য। চমৎকার আকারশুদ্ধতা, সাবলীল অবয়ব এবং অলঙ্করণের প্রাচুর্য খাজুরাহোর স্থাপত্যের নিদর্শনকে দিয়েছে বিশ্বজোড়া পরিচয়।

ল্যাটিন ক্রসের (Latin cross) উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত এই মন্দিরগুলোতেও রয়েছে গর্ভগৃহ, মণ্ডপ এবং অর্ধ-মণ্ডপ। তবে পরের দিকের মন্দিরগুলোতে মহামণ্ডপও স্থান পেয়েছে। সকল কাঠামোই ভবনের অনুপাত, শিখর ইত্যাদি দিয়ে উচ্চতা লাভ করতে চেষ্টা করেছে। দেয়াল যেখানে শেষ এবং শিখরের যেখানে শুরু, খাজুরাহোর স্থপতিরা সরু জানালার সাহায্যে সেখান দিয়ে অভ্যন্তরে আলো বাতাস প্রবেশ করিয়েছে। সব মিলিয়ে ভিতরে সৃষ্টি হয়েছে আকাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক পরিবেশ।

কান্দারিয়া মহাদেও (Kandariya Mahadeo) শিব মন্দির (১০০০) খাজুরাহোতে সবচেয়ে বড়।

দৈর্ঘ্যপ্রস্থে যথাক্রমে ১০৯ ও ৬০ ফুট, উচ্চতায় এই মন্দির ১১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। সবগুলো মন্দিরে অসংখ্য মূর্তির মিছিল তৎকালীন ভাস্করদের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। মানুষের শারীরিক গঠন অতিরঞ্জিত করে দারুণ দক্ষতার সাথে মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছিল। এতটা কাল পার হবার পর, বহুদিন মন্দিরগুলো অব্যবহৃত থাকার পরও, মনে হয় এই তো সেদিন এখানে ছিল কোলাহলরত এক জনজীবন।

উত্তর ভারতীয় রাজপুতানা স্টাইল

মধ্যভারতের রাজপুতানায় (Rajputana) অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীতে শিকড় গেড়েছিল এক স্থাপত্য রীতি যার সূত্র ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্য (চতুর্থ-ষষ্ঠ শতাব্দী)। তবে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে রাজপুতানা স্টাইলে নির্মিত বহু মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। দিল্লীর কুওয়াত-উল-ইসলাম বা কুতুব (Qut'b) মসজিদ (১২০০) এবং আজমীরের "আড়াহাই দিন কা ঝোপড়া" (Arhai din ka Jhopra) (১২০৫) নামে খ্যাত মসজিদটি বেশ কয়েকটি মন্দিরের থাম দিয়ে নির্মিত। মসজিদের ভিতর থামের গায়ে মূর্তির গঠন আজও স্পষ্ট তবে মুখাকৃতি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তবুও থামের সৌন্দর্য থেকে প্রাক-গুপ্ত কালের স্থাপত্যের উৎকর্ষ কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়।

গুজরাটের বরোদায় ১০৫০ সালের সূর্য মন্দির, মাউন্ট আবুতে (Mount Abu) সম্পূর্ণ সাদা মার্বেলের তৈরি জৈনদের বিমলা সাহা'র (Vimala Saha) মন্দির (১০১৩), গোয়ালিয়রের (Gwalior) তেলি কা মন্দির (Teli ka Mandir) (১১শ শতাব্দী) এবং সাস্‌-বহু (Sas-Bahu) বা বৌ-শ্বাশুড়ির মন্দির (১০৯৩), বৃন্দাবনে গোবিন্দ দেবীর (Govinda Devi) মন্দির (১৫৯০) বৃহৎ উত্তর ভারতীয় স্টাইলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য উল্লেখযোগ্য।

'তেলি কা মন্দির' মূলত একটি উপাসনালয় ছিল। স্তম্ভাকৃতির গর্ভগৃহ ব্যতীত এখানে মণ্ডপ অথবা অন্য কোনো ঘর ছিল না। লম্বাটে ধরনের ভবনটির ছাদ পিরামিডের মতো শেষ হতে পারেনি।

২৮৪ গোয়ালিয়রের তেলি কা মন্দির

সাস-বহু মন্দিরের মণ্ডপ ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ক্রুশাকৃতির ভবনটি লম্বায় ১০০ ফুট, দৈর্ঘ্যে ৬৩ ফুট এবং উচ্চতায় ৮০ ফুট ছিল। বাহির থেকে দেখতে মনে হয় মন্দিরটির অনেকগুলো তলা আছে।

গোবিন্দ দেবীর মন্দির মোগল আমলে ভেঙ্গে ফেলা হয়। দেখতে কিছুটা সাস্-বহুর মতো। এখানে অলঙ্করণের জন্য মনুষ্য আকৃতির কোনো মূর্তি ব্যবহার করা হয়নি। সম্রাট আকবরের নিষেধাজ্ঞার কারণে এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুচালো খিলান দ্বারা গম্বুজ নির্মাণ এই মন্দিরের একক বৈশিষ্ট্য।

জৈনদের মন্দির

জৈনরা পাহাড়ের চূড়ায় তাদের মন্দির নির্মাণ করত। পবিত্র উঁচু স্থান জৈনদের কাছে ছিল পূজনীয়। পাহাড়ের উপরে একাধিক পবিত্র ভবন তৈরি করে তারা সৃষ্টি করত নয়নাভিরাম মন্দির শহর। এমন গুরুত্বপূর্ণ দুইটি শহর কাথিয়াওয়াড় (Kathiawar) পাহাড়ে অবস্থিত।

মাউন্ট আবুতে বেশ কয়েকটি মন্দিরের মাঝে বিমলা (১০১৩) অন্যতম। ১৪৫ X ৯৫ ফুট উঠানের চারপাশ ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ দিয়ে ঘেরা; প্রকোষ্ঠের ভিতরে রয়েছে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের মূর্তি। মন্দির ভবন লম্বায় ৯৮ফুট এবং চওড়ায় ৪২ ফুট। বাইরের দিকটা সাদামাটা, তবে অভ্যন্তর ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। সাদা মার্বেলের ভাস্কর্য দিয়ে ভিতরের দেয়াল ছিল ঢাকা। অষ্টভুজাকৃতির প্রধান উপাসনালয়ের উপরে রয়েছে গম্বুজ।

চালুক্য (Chalukya) স্থাপত্য

দক্ষিণ ভারতে বর্তমান বিজাপুর জেলায় আইহোল (Aihole) নামক গ্রামে এবং নিকটবর্তী কিছু এলাকায় ৪৫০ সাল হতে পরবর্তী দুইশত বছর চালুক্য সম্প্রদায় পাথর দিয়ে কিছু মন্দির তৈরি করে। প্রায় সত্তরটি মন্দিরের অর্ধেক একটি দেয়াল-ঘেরা জমিতে অবস্থিত। বাকি মন্দিরগুলো অবশ্য আশেপাশে নিকটেই রয়েছে। চালুক্য স্টাইল নামে পরিচিত স্থাপত্যরীতির এখানেই সূচনা।

তপতী (Tapati) নদীর দক্ষিণে, কিস্তনা (Kistna) নদীর উত্তরে এবং মুম্বাই এর পূর্বদিকের বিশাল এলাকা দাক্ষিণাত্য (Deccan) নামে পরিচিত। বিখ্যাত অজন্তা এবং ইলোরা এই ডেকানের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত এলাকায় ১৩০০ সাল পর্যন্ত শক্তিশালী চালুক্য সাম্রাজ্যর অধীনে উত্তর ভারতীয় এবং দ্রাবিড় রীতির মধ্যবর্তী পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় চালুক্য স্থাপত্যে। তবে উন্নত শিল্পকলার জন্য এই রীতিকে চারুশিল্পীর স্থাপত্যও বলা হয়।

আইহোলে মন্দিরগুলোর ছাদ প্রায় সমতল। তার উপরে পরে যোগ হয় ব্যতিক্রমধর্মী শিখর; যার চারপাশের ঢালুতে যোগ হয়েছে খাড়া ভাবে বসানো সরু দেয়াল। থাম এবং দেয়ালে আড়াআড়িভাবে বসানো চিকন সরলরেখা দাক্ষিণাত্য স্থাপত্যের আর এক বৈশিষ্ট্য। থামের উপরিভাগ দেখতে খানিকটা আয়োনিক (Ionic) স্তম্ভের মতো, তবে সেখানে ফুল জাতীয় অলঙ্করণ দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ থাম ভাস্কর্যে ঢাকা হতো না। থাম-বিশিষ্ট মূল মন্দিরের সম্মুখে ছিল অনুরূপ থাম-বিশিষ্ট মণ্ডপ বা মিলনায়তন।

২৮৫ চালুক্য সম্প্রদায়ের মন্দির

আইহোলে সবচেয়ে পুরাতন মন্দির লাধ খান (Ladh Khan) (৪৫০ সাল)। সম্মুখের দিক ব্যতীত অন্য তিন দিকের সবটাই দেয়াল, দুই দিকে ছিল পাথর দিয়ে তৈরি খিড়কি। লাধ খানেই পরবর্তী দ্রাবিড় স্টাইলের থামের জন্ম। গোড়ার চেয়ে উপরটা কিছুটা সরু থামের শীর্ষে রয়েছে ফুল আকৃতির অংশবিশেষ।

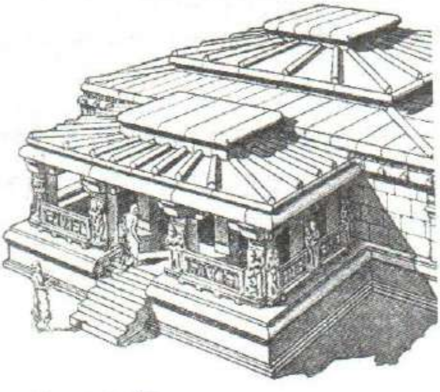

২৮৬ আইহোলে লাধ খান মন্দির

২৮৭ পাপানাথ মন্দির

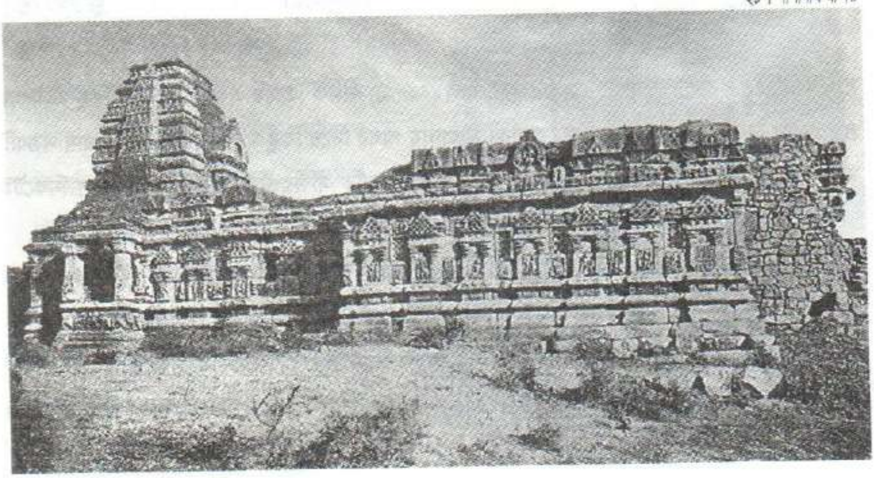

মধ্যযুগীয় মন্দিরের প্রবেশপথে যে অলঙ্কৃত আসন দেখা যায় তার শুরু এই পুরানো চালুক্য স্থাপত্যে। সমতল বা সামান্য ঢালু ছাদ নির্মাণে পাথরের বড় বড় অংশগুলোর সংযোগস্থলের খাঁজে লম্বা সরু পাথরের টুকরা বসানো হতো।

আইহোলের পনের মাইল দূরে বাদামীতে (Badami) ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যরা পাহাড় কেটে কিছু মন্দির তৈরি করে। মন্দিরগুলোতে চালুক্যদের উন্নত কারিগরি দক্ষতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

আইহোল হতে পনের মাইল এবং বাদামীর দশ মাইল দূরে অবস্থিত পাট্টাডাকল (Pattadakal) ছিল মধ্য-সপ্তম শতাব্দীতে চালুক্যদের রাজধানী। পাট্টাডাকলে উত্তর-

২৮৮ বিরূপাক্ষ মন্দির, চালুক্য রীতি

২৮৯ মহীশূরে চালুক্য হয়সালা পদ্ধতির মন্দির

ভারতীয় এবং দ্রাবিড় স্টাইলের মন্দির স্থাপত্য একই সময়ে প্রচলিত ছিল। উত্তর-ভারতীয় রীতি অনুযায়ী নির্মিত মন্দিরসমূহের মধ্যে পাপানাথ (Papanath) (৬৮০সাল) এবং দক্ষিণ ভারতীয় রীতির মধ্যে বিরূপাক্ষ (Virupaksha) (৭৪০ সাল) উল্লেখযোগ্য।

দ্বাদশ শতাব্দীতে চালুক্যরা হয়সালা (Hoysala) সম্প্রদায়ের অধীনে চলে যায়। হয়সালাদের বুদ্ধিদীপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চালুক্যদের চারুকলা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ১০৫০ হতে ১৩০০ সালের মধ্যে তৈরি চালুক্য রীতির মন্দিরসমূহ মূলত নিপুণ কারিগরদের রাজ্য মহীশূরে (Mysore) অবস্থিত। প্রাচীন চালুক্যরা বেলে পাথরে কাজ করলেও মহীশূরের কারিগররা সবুজ কিংবা নীলাভ কালো পাথর ব্যবহার করত।

চালুক্য হয়সালা রীতি

চালুক্য হয়সালা মন্দিরগুলোর স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারকাকৃতির প্ল্যান, দেয়ালের গায়ে লম্বালম্বিভাবে সেঁটে দেয়া বিভিন্ন কারুকার্য, মন্দিরের ক্ষুদ্রাকার প্রতিকৃতি ধাপে ধাপে সাজিয়ে তৈরি শিখর এবং যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ আকারে তৈরি থাম।

চালুক্য হয়সালা পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে মহীশুরের হাসান জেলার বেলুড়ে (Belur) অবস্থিত একই বেষ্টনীর মধ্যে একগুচ্ছ মন্দির (১১১৭ সাল হতে), হালাবিদে (Halabid) অবস্থিত হয়সালেম্ভার (Hoysalemvara) মন্দির (১১৫০), এবং সোমনাথপুরে তিনটি উপাসনালয় সমেত কেশব (Kesava) মন্দির (১২৬৮)। আশ্চর্য হলেও সত্য, বেলুড় এবং কেশব দেড়শত বছরের ব্যবধানে তৈরি হলেও চারুকলা সংরক্ষণ সম্বন্ধে এই এলাকার কারিগরগণ এতটাই সচেতন ছিল যে, অলঙ্করণের ক্ষেত্রে দুটি মন্দিরের ব্যবধান অতি সামান্য।

পরবর্তীকালে চালুক্য মন্দিরগুলোতে তারকা প্ল্যান সাধারণত আর দেখা যায় না। মন্দিরের ভিতরে থাম, থামের উপরাংশ এবং মন্দিরের বহিরাংশ বরাবরই অত্যধিক মাত্রায় ভাস্কর্য দ্বারা অলঙ্কৃত থাকত। জানালার ব্যবহার বলতে গেলে ছিলই না। পরের দিকে চালুক্য স্টাইলে দুটি থামের মাঝে কারুকাজ সম্পন্ন দরজা বা জানালার উপরে স্থাপিত কাঠ বা পাথর দেখা যায়, যাকে ইংরেজিতে মোউল্‌ডেড লিন্টল (moulded lintel) বলা হয়। এর নিচে লতাপাতা, মূর্তি, ইত্যাদির সূক্ষ্ম কারুকাজ সমৃদ্ধ দরজা লক্ষণীয়। এ সময়ে বৃষ্টি এবং রৌদ্র হতে মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য চওড়া কার্নিশ (cornice) ব্যবহার করা হতো।

২৯০ কেশব মন্দির

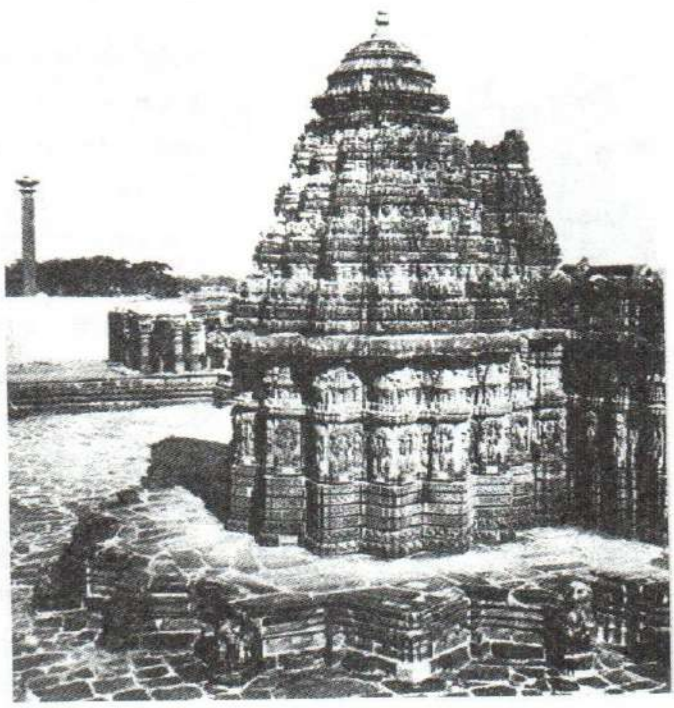

২৯১ সোমেশ্বর মন্দির

দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি ধরওয়ারের (Dharwar) ইট্টাগিতে (Ittagi) অতিমাত্রায় অলঙ্কৃত মহাদেব (Mahadev) মন্দির এবং গাদগে (Gadag) দেয়ালের তাকে হিন্দু দেবতার অসংখ্য মূর্তি সমেত সোমেশ্বর (Somesvara) মন্দির চালুক্যদের শেষের দিকের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত।

উপমহাদেশের বাইরে

শুধু ভারত উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ থেকেও যে এত ধরনের বাহার তা হিন্দু স্থাপত্যের এক গুণগত বৈশিষ্ট্য।

৩৯২ আঙকোর থোম এ মন্দির

তবে উপমহাদেশের গণ্ডী পার হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। বৌদ্ধ ধর্মের পিছু পিছু হিন্দু ধর্ম ঐ সকল দেশে যায়। ভারতীয় বৌদ্ধ স্থাপত্য এককভাবে থাইল্যান্ডে এবং হিন্দু স্থাপত্যের সাথে কাম্পুচিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার জাভায় (Java) প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীলংকা, নেপাল (তার মাধ্যমে চীন), এবং বর্মায় ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্যের ছাপ দেখা যায়।

ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য কতটা প্রভাব বিস্তার করে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আঙকোর ওয়াত (Angkor Wat)। ১২শ শতাব্দীতে কাম্পুচিয়ার খেমার (Khmer) রাজা ছিলেন সূর্যরাম। হিন্দু স্থাপত্যের আকারে আঙকোর ওয়াতে তিনি স্থাপন করলেন বিশ্বের অন্যতম বিশাল ধর্মীয় প্রকল্প। পরিকল্পনা, অলঙ্করণ, বিন্যাস, সর্বত্র হিন্দু স্থাপত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

ইসলামি স্থাপত্য

মুসলমানদের প্রার্থনার ঘর হচ্ছে মসজিদ, ইংরেজিতে মস্ক (mosque); যার অর্থ সিজ্‌দা দেবার স্থান। নামায যে দিকে ফিরে পড়া হয় তাকে কিব্‌লা (q'ibla) বলে। ইসলামি স্থাপত্যে অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মসজিদ-সংলগ্ন মাদ্রাসা বা স্কুল, প্রাসাদ এবং কবরস্থান।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) মদিনাস্থ বাসভবনের দেয়াল-দিয়ে ঘেরা উঠানে প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল। চার-দেয়াল বিশিষ্ট উঠান বা সাহনে (sah'n) কোনো ছাদ ছিল না। কিব্‌লামুখি দেয়াল নির্দিষ্ট করার জন্য মিহ্‌রাব (mihrab) দ্বারা চিহ্নিত ছিল। মসজিদের এই পরিকল্পনা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় অনুকরণ করা হয়। উঠানের কিব্‌লামুখী দেয়ালে পরবর্তীকালে নামাযের ঘর স্থান পায় যার কিব্‌লা প্রান্তে ছিল অর্ধবৃত্তাকার মিহরাব। উঠানে যোগ হয় অজুর ব্যবস্থা। পরে মসজিদ সংলগ্ন উঁচু মিনার হতে আযান বা নামাযের ডাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

২৯৩ নামাজে দাড়ানো, রুকু ও সেজদা

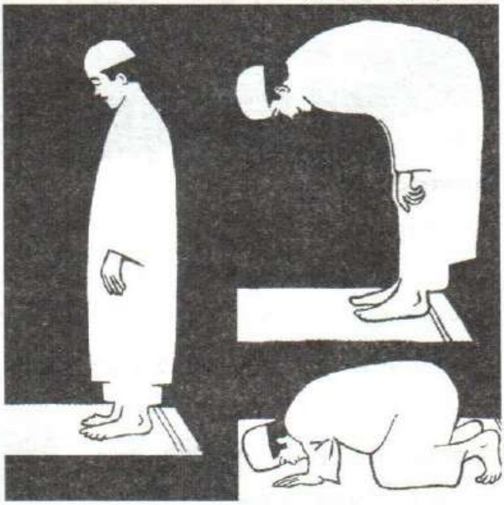

২৯৪ রসুল (সঃ)-এর মসজিদ

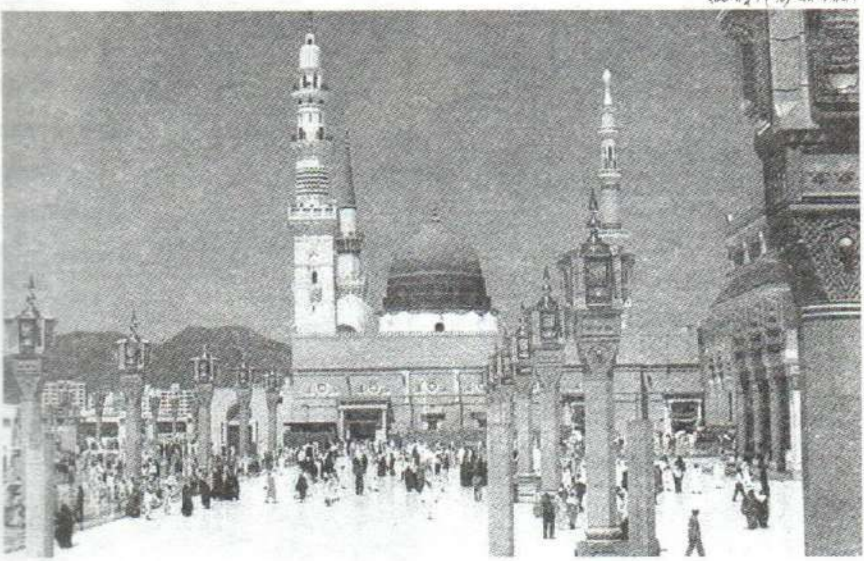

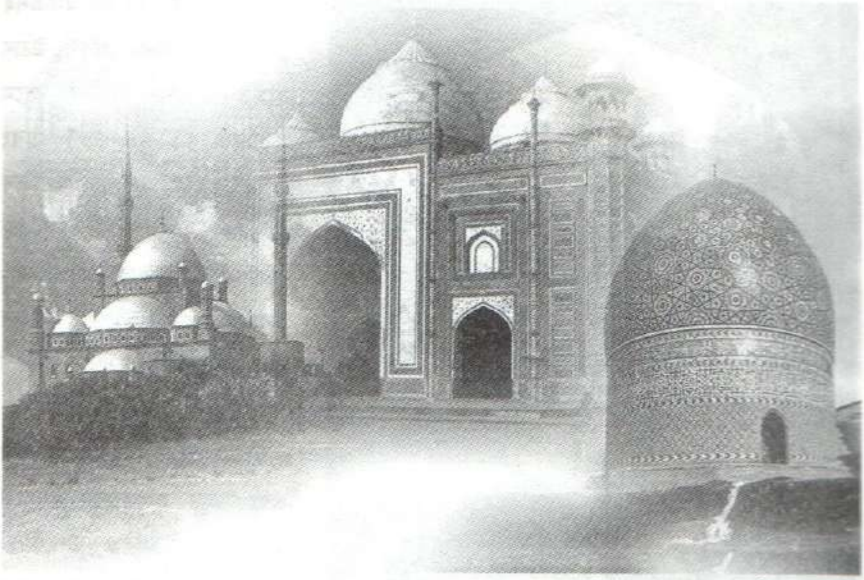

১৯৫ তিন ধরনের মসজিদ

মসজিদ ছিল সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মীয় কাজকর্ম ছাড়াও মাদ্রাসা, আবাস, অফিস ঘর হিসেবে এবং সভা-সমিতির কাজে মসজিদ ব্যবহৃত হত। খুৎবা পাঠ করার জন্য মিহ্‌রাবের পাশে উঁচু স্থান বা মিম্‌বার (mimbar) ব্যতীত অন্য কোনো আসবাবপত্র মসজিদে কখনই ছিল না। তাই শৈল্পিকভাবে প্রতিপালকের প্রতি আনুগত্য, ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য মসজিদের মূল আকার, অভ্যন্তরীণ অলঙ্করণ, প্রাকৃতিক আলো বা কিছুসংখ্যক বাতি এবং মেঝের নকশার উপর নির্ভর করতে হয়।

স্থাপত্যের বিচারে মসজিদের আকার সাধারণত তিন ধরনের।

প্রথমত সারিবদ্ধভাবে কাছাকাছি অবস্থিত থামের উপর ছাদের ভার বহন করে হলঘর নির্মাণ। এমন নামাযের ঘর সমগ্র আরবদেশে দেখা যায়; বিশেষ করে ইসলামের প্রথম পাঁচশত বছরে। উদাহরণস্বরূপ দামেস্কের (Damascus) *প্রধান মসজিদের* (Great Mosque) *নাম বলা যায়।*

দ্বিতীয়ত উঠানের এক প্রান্তে মধ্যবর্তী স্থানে উঁচু খিলানবিশিষ্ট ছাদযুক্ত প্রবেশপথ বা আইওয়ান (iwan) *যার উঠানের দিকটা উন্মুক্ত। এই ধরনটি ইরানে প্রচলিত ছিল। কোনো কোনো নিদর্শনে উঠানের প্রতি প্রান্তে একটি করে আইওয়ান এবং কিব্‌লামুখী আইওয়ান গম্বুজবিশিষ্ট নামায ঘরের প্রবেশপথ রূপে কাজ করত। আইওয়ান-বিশিষ্ট মসজিদসমূহের মধ্যে ইসফাহানের মসজিদ-ই-জামি* (Masjid-i-Jami) ***(১০৭২-১০৯২)*** *সবচেয়ে বিখ্যাত। এখানকার চারটি আইওয়ান খিলানবিশিষ্ট বারান্দা দ্বারা উঠানের চতুষ্পার্শ্বে সংযুক্ত।*

তৃতীয়ত তুরস্কে উদ্ভাবিত প্রধান কেন্দ্রীয় গম্বুজসহ একাধিক গম্বুজ এবং অর্ধগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদসমূহের মধ্যে তুর্কী স্থপতি সিনান ডিজাইনকৃত ইস্তাম্বুলের (Istanbul) *বিশ্ববিখ্যাত সোলাইমানের* (Suliemaniyeh) *মসজিদ* ***(১৫৫০-৫৭)*** *অন্যতম।*

ভারতবর্ষে তিন ধরনের মসজিদই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, উঠান সমেত মসজিদ দিল্লীর জামে মসজিদ (১৬৪৪-৫৮) এবং লাহোরের বাদশাহী মসজিদ (১৬৭৪), গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ ঢাকার সাত গম্বুজ (১৭শ শতাব্দী) এবং আইওয়ান বিশিষ্ট মসজিদ শ্রীনগরের জামে মসজিদ (১৫শ শতাব্দী)।

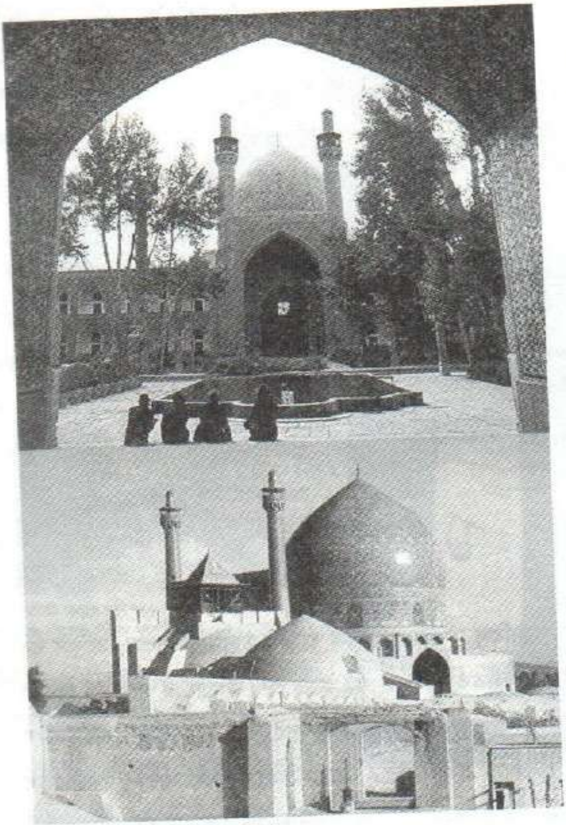

২৯৬ আইওয়ান-বিশিষ্ট ইসফাহানের মসজিদ-ই-শাহ

মসজিদের মিহ্‌রাব, মিম্‌বার এবং সাহ্‌ন একান্তভাবে ইসলামী স্থাপত্যের উদ্ভাবিত উপাদান। মিনার, গম্বুজ এবং খিলান ব্যাপক হারে মসজিদ তথা মুসলিম দেশগুলোর ভবনে ব্যবহৃত হলেও ইসলাম ধর্ম আসার অনেক আগেই এগুলো উপস্থিত ছিল। তবে আজ গম্বুজ, মিনার এবং খিলান ছাড়া মসজিদ একদমই দেখা যায় না। মাইক ব্যবহারের আগে মিনারের শীর্ষে উঠে মুয়াজ্জিন আযান দিত।

২৯৭ ইস্তাম্বুলের সোলাইমানের মসজিদ

জেরুজালেম শহরে (Jerusalem) নির্মিত কুব্বাত আস্-সাখ্‌রাহ্ (Kubbat as-Sakhrah), ইংরেজিতে ডোম্ অব্ দি রক (Dome of the Rock) (৬৮৫-৬৯১ সাল), এবং সংলগ্ন আল-আক্‌সা (Al Aqsa) মসজিদ ইসলাম ধর্মের প্রথম দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন।

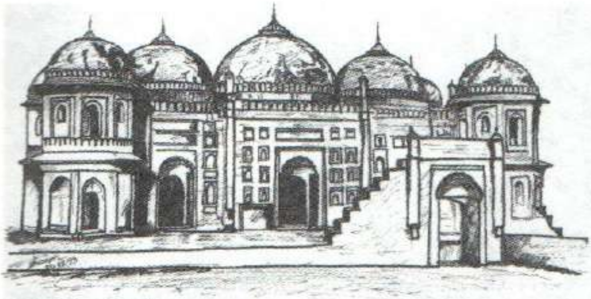

২৯৮ ঢাকার সাত গম্বুজ মসজিদ

কুব্বাত আস্-সাখ্রাহ্ ধর্মীয় বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই স্থান থেকেই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহ্ সুবহানু ওয়াতায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করতে মিরাজের (Miraj) যাত্রা শুরু করেছিলেন। উপরন্তু মক্কার কা'বা (Kaaba) ঘরের আগে এই কুব্বাত আস্-সাখ্রা ছিল কিব্‌লা, অর্থাৎ সেদিকে ফিরে সবাই নামায আদায় করত। এই ভবনে মূলত খ্রিষ্টীয় এবং বাইজ্যানটাইন স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে; যথা আটটি দেয়ালের উপরে গম্বুজাকৃতির ছাদ।

২৯৯ কুব্বাত আস্-সাখরাহ্

৩০০ মক্কার পবিত্র কা'বা শরিফ

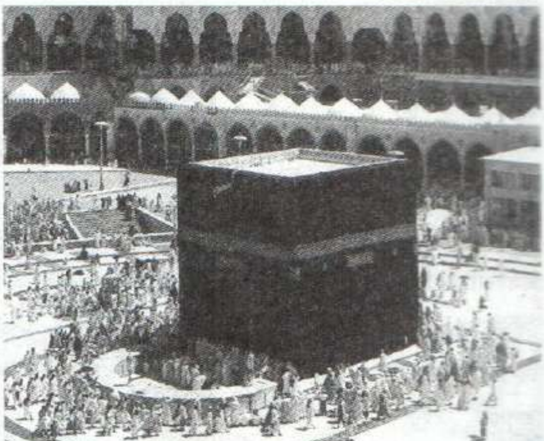

আল-আক্সা মসজিদের অধিক সংযোজন ও সংস্করণের ফলে মূল পরিকল্পনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যদিও মসজিদটি সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকের; তথাপি এখন যে অবস্থায় তা সম্ভবত ৭৬৫ সালের কাজ। এমনকি ১০৩৫ এবং ১৫৬১ সালে এই মসজিদের ব্যাপক মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়।

৭০৬-৭১৫ সালে নির্মিত দামেস্কের (Damascus) প্রধান মসজিদ (Great Mosque) খ্রিষ্টান ব্যাসিলিকা ধারায় নির্মিত। এমনকি এর সমকোণ মিনারের সিরিয়াস্থ (Syria) গীর্জার টাওয়ারের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। মিনারগুলো ইসলামি স্থাপত্যে সর্বপ্রথম মিনার। এখানেও বাইজ্যানটাইনের প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

BANSDOG ... Dhaka

৩০১ আল-আকসা মসজিদ

ইসলাম বিভিন্ন দেশে কায়েম হবার কারণে হরেক রকমের মিহ্‌রাব, মিম্‌বার, মিনার, গম্বুজ ও খিলান বিকশিত হয়। তবে মসজিদের যে মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সিজ্‌দা দেবার স্থান, তার কখনও হেরফের হয়নি।

দামেস্কের প্রধান মস্‌জিদের ন্যায় নির্মিত বাগদাদের উত্তরে সামার্‌রার (Samarra) প্রধান মসজিদও (৮৪৭ সাল) উঠান কেন্দ্রিক। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই মসজিদের (৭৮৭ X ৫২৫ ফুট) আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ৯০ ফুট উঁচু প্যাঁচানো মিনার। একই পরিকল্পনায় তৈরি তিউনিসের (Tunis) কাইরাওয়ান (Kairouan) মসজিদের (৬৭৫ সাল এবং নবম শতাব্দী) মিনারটিও যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। এর উঠানের তীক্ষ্ম খিলান, খোদাইকৃত মার্বেল দিয়ে অলঙ্কৃত মিহ্‌রাব এবং কাঠের মিম্‌বার (৮৬২সাল) বিশ্বনন্দিত।

৩০২ দামেস্কের প্রধান মসজিদ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের ভাগে তুর্কী কু'তুবউদ্দিন আইবেক দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তিনি তৈরি করেন কুব্বাত আল-ইসলাম মসজিদ (১১৯৭) যা ছিল ভারতে প্রথম বড় মসজিদ।

তাঁর শাসনামলকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই মসজিদের পার্শ্ববর্তী স্থানে দুই বছর পর কু'তুবউদ্দিন নির্মাণ করেন কু'তুব মিনার। মিনারের আলোচনায় দিল্লীর কুতুব মিনার (১১৯৯) বিশেষ আসনের দাবিদার। লাল বেলে পাথর দিয়ে তৈরি মিনারের গায়ে নকশা ও আরবি লেখা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সম্ভবত বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ২৪০ ফুট উঁচু কুতুব মিনারই ছিল বিশ্বে সবচেয়ে উঁচু মিনার।

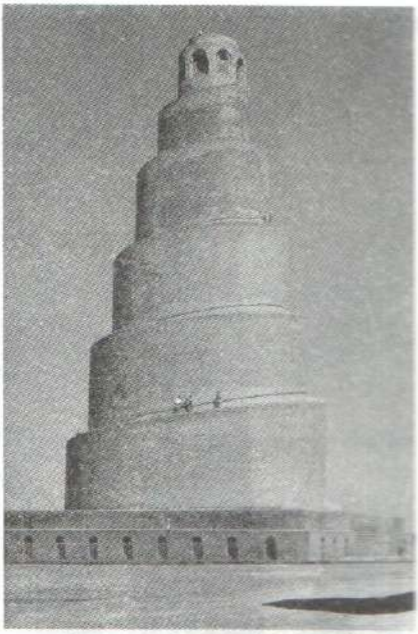

৩০৩ সামাররার মসজিদ ও মিনার

উঠানকেন্দ্রিক মসজিদের অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য উদাহরণ হচ্ছে কায়রোর (Cairo) আল্-আজহার (Al-Azhar) বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ (৯৩৭ সাল) এবং স্পেনের কর্ডোভার (Cordova) প্রধান মসজিদ (৭৮৫ সাল)। জেনে রাখা ভালো যে আল-আজহার কার্যকর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন বিদ্যাপীঠও দশম শতাব্দীতে করডোভা শহর ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল।

৩০৪ তিউনিসের কাইরাওয়ান মসজিদ

৩০৫ তিউনিসের কাইরাওয়ান মসজিদের মিনার

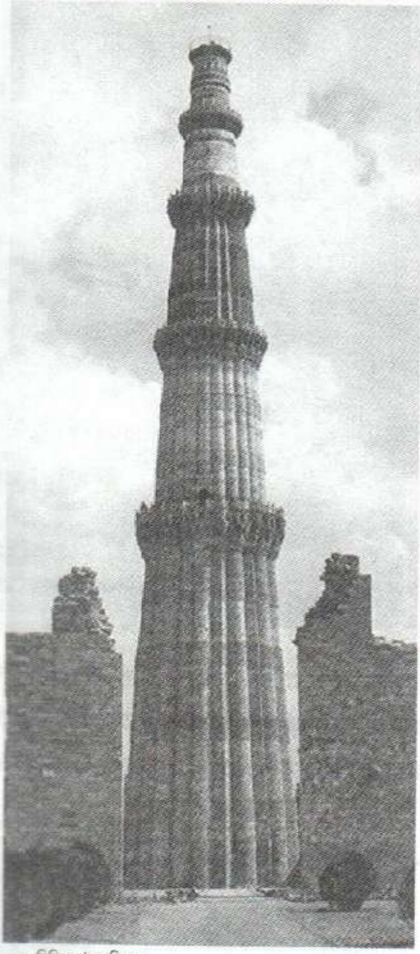

৩০৬ দিল্লির কু'তুব মিনার

৩০৭ কায়রোর আল্-আজহার মসজিদে

৩০৮ কায়রো শহরে ইব্নে টুলুনের প্রধান মসজিদ

সমগ্র মিশরে মুসলিম স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে কায়রো শহরে ইব্নে টুলুনের (Ib'n Tulun) প্রধান মসজিদ (৮৭৬-৭৯ সাল)। তীক্ষ্ম খিলানের উপরে ছাদ, দেয়ালে খোদাই করা অলঙ্করণ, বিশাল উঠানকে ঘিরে খিলান-যুক্ত বারান্দা ইত্যাদির জন্য ইব্নে টুলুনের সৌন্দর্য সর্বকালে ঈর্ষণীয়।

উল্লেখযোগ্য যে কাইরাওয়ান, ইব্নে টুলুন এবং ইসলামি স্থাপত্যে অন্যত্র সুচালো খিলান ব্যবহার হবার প্রায় তিনশত বছর পর ইয়োরোপের গথিক স্থপতিরা এ ধরনের খিলান কাজে লাগান।

আরব ও উত্তর আফ্রিকার মুসলমানরা অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে প্রায় আটশত বছর স্পেনে ইসলামি শাসন বহাল রাখে। অনেকের মতে এই সময়কাল ৭০৯ সাল হতে ১৪৯২ পর্যন্ত। তবে প্রথম তিনশত পঞ্চাশ বছর করডোভার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ১০৯০ সালের পর হতে সমগ্র স্পেন ছোট ছোট রাজত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

স্পেন বিজয়ী মুসলমানদের ইংরেজিতে মু'র (Moor) বলা হয়। স্পেনে মুসলমানদের তথা মু'র স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে

(ক) অশ্বখুরাকৃতির খিলান (horseshoe arch) যা দশম শতকের পর সামান্য কিছুটা সুচালো আকার ধারণ করে,

(খ) মূল খিলানকে ছোট ছোট খিলানে বিভক্তকরণ বা কাস্পড্ আর্চ (cusped arch),

(গ) পরস্পর বিজড়িত খিলান,

(ঘ) একই খিলান নির্মাণে একাধিক সামগ্রী ব্যবহার,

(ঙ) ফোয়ারা ও নান্দনিক কারণে পানির আয়োজন।

৩০৯ মুসলিম স্থাপত্যে বিভিন্ন ধরনের খিলান

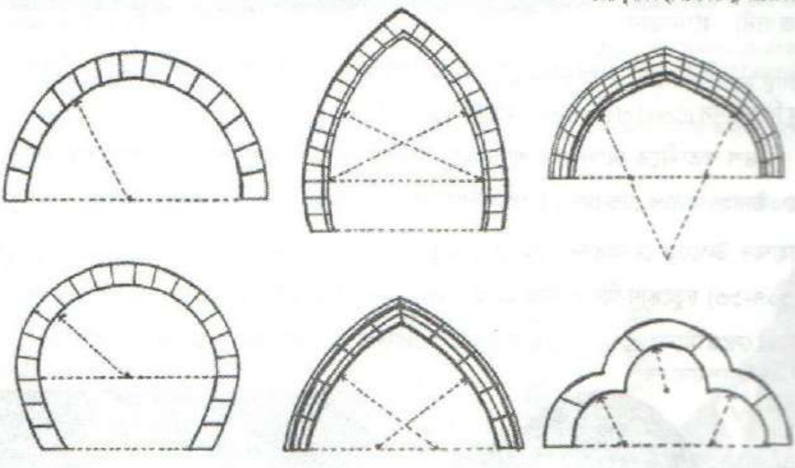

৩১০ কর্ডোভার প্রধান মসজিদ: গম্বুজের তলদেশ

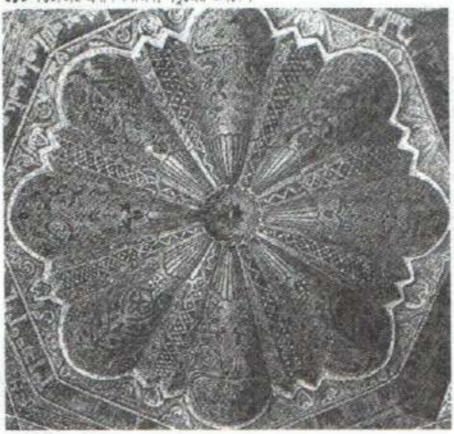

স্পেনের সর্বোৎকৃষ্ট ইসলামি ইমারত নিঃসন্দেহে করডোভার মসজিদ (৭৮৫ সাল)। ১৫শ শতাব্দীতে মসজিদটি খ্রিষ্টীয় গির্জা হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়।

উন্মুক্ত উঠান, অশ্বখুরাকৃতির খিলান, অত্যধিক মাত্রায় অলঙ্করণ ইত্যাদি সম্বলিত মসজিদটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ। করডোভার মসজিদটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো একাধিক খিলানের সাহায্যে মিহ্‌রাবের উপর গম্বুজ নির্মাণ এবং খিলানের

উপর খিলান বসিয়ে ছাদের ভার বহন। মজার ব্যাপার হলো, প্রতিটি খিলান ছয়টি ক্ষুদ্রাকার খিলানের সমন্বয়ে তৈরি।

৩১১ কর্দোভার প্রধান মসজিদ: অভ্যন্তর

স্পেনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি অবদান হচ্ছে স্বাধীন এক ছোট রাজবংশের রাজধানী গ্রানাডার (Granada) আল-হামরা (Al-hamra) প্রাসাদ (১২৩৭-১৪৯২)। তন্মধ্যে ১৩৫৪ সালে তৈরি বিখ্যাত কোর্ট অব্ দি লায়নস (Court of the Lions) অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

১৪শ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের শাসনামলে ইসলামি স্থাপত্যে সরু, লম্বা এবং অভিজাত মিনার দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ তেহরানের উত্তর-পশ্চিম দিকে সুলতানিয়া (Sultaniya) শহরে মোঙ্গল শাসক সুলতান মোহাম্মদ উল্‌যেতু খোদাবান্দা শাহ্ (Sultan Mohammad Oljetu Khudabanda Shah)-এর সমাধির (১৩০৭-১৩) চতুষ্কোণ মিনার এবং একই সময়ের ইসফাহানের জমজ মিনার। তুরস্কের সিভাস (Sivas) শহরের সেপ্তে মিনের (Çifte Minare) মাদ্রাসার প্রবেশদ্বারে উঁচু জমজ মিনার (১২৭১) শোভা পায়।

৩১২ গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদ

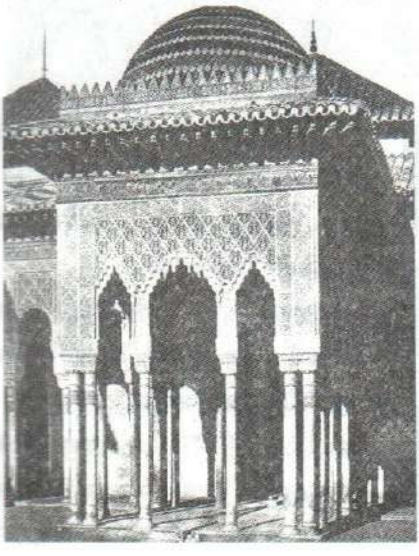

৩১৩ আল-হামরা প্রাসাদের জানালা

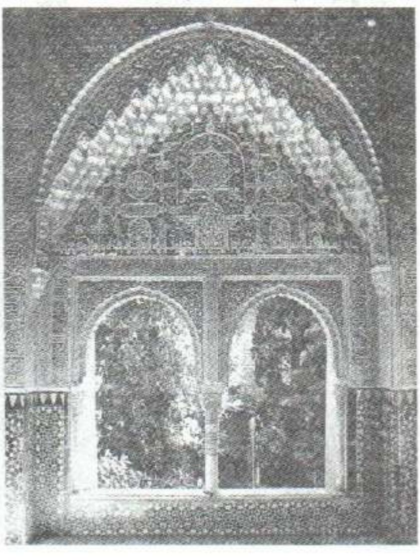

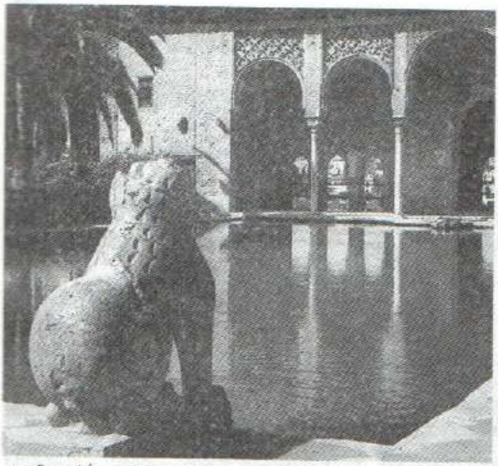

৩১৪ সিংহের উঠান : আল-হামরা প্রাসাদ

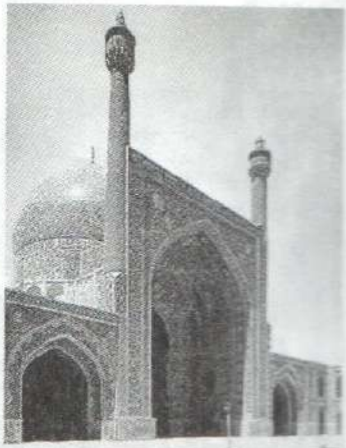

৩১৫ তেহরানে খোদাবান্দা শাহ্-এর সমাধি

ওসমান, ইংরেজিতে অটোমান (Ottoman) (১২৫৯-১৩২৬) কর্তৃক স্থাপিত তুর্কি সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ১৪শ শতাব্দীতে বারসাতে এবং ১৫০০ সালের পর কন্সট্যান্টিনোপলে সমৃদ্ধি লাভ করে। তার আগে থেকেই পারস্যের ও বাইজ্যানটাইনের স্থাপত্য এই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের (Justinian) জন্য গ্রিসদেশীয় স্থপতিরা বাইজ্যানটাইনের গির্জা হায়া সোফিয়া (Hagia Sophia) (৫৩৭ সাল) তৈরি করেন। প্রথম নয় শতাব্দী খ্রিষ্টান গির্জা হিসেবে ব্যবহৃত হবার পর, পরবর্তী পাঁচ শতক সোফিয়া মসজিদ ছিল। আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের নেতা মুস্তফা কেমাল আতাতুর্কের (Mustapha Kemal Ataturk) (১৮৮১-১৯৩৮) আমলে ১৯৩৫ সালে মসজিদটি জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়।

জাস্টিনিয়ানের হায়া সোফিয়া নির্মাণ হবার প্রায় এক হাজার বছর পর কন্সট্যান্টিনোপলে বাইজ্যানটাইনের স্থাপত্য ওসমানি তুর্কিদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। একাধিক গম্বুজ, শীর্ষে উল্টানো চোঙ্গা-বিশিষ্ট উঁচু সরু মিনার ও চকচকে টালি ওসমানি আমলের বৈশিষ্ট্য।

৩১৬ তুরস্কে সেচে মিনের মাদ্রাসার জমজ মিনার

৩১৭ তুরস্কে সেচে মিনের মাদ্রাসা

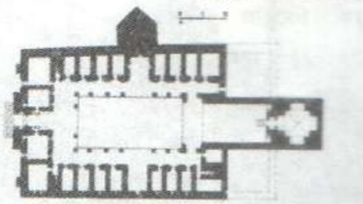

৩১৮ ইস্তাম্বুলে হায়া সোফিয়া

৩১৯ এড্রিয়ানোপলে সুলতান সেলিমিয়ে মসজিদ

সিনান (১৪৮৯-১৫৭৮/৮৮) নামধারী আর এক গ্রিসদেশীয় স্থপতি একাধিক গম্বুজের সমন্বয়ে হায়া সোফিয়ার অনুকরণে প্রধানত কন্সট্যান্টিনোপলে বেশ কয়েকটি মসজিদ ডিজাইন করেন। তন্মধ্যে ইস্তাম্বুলে সোলাইমানিহ্‌র (Suliemaniyeh) মসজিদ (১৫৫০-৫৭) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত। তবে প্রায় সাড়ে তিন শত মসজিদের স্থপতি সিনানের নিজের মতে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কাজ অ্যাড্রিয়ানোপলে (Adrianople) সুলতান সেলিমিয়ে (Sultan Selimiye) মসজিদ (১৫৬৯-৭৫)। সিনানের শিষ্য দ্বারা ডিজাইনকৃত ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমদ মসজিদ (১৬০৯-১৬) অভ্যন্তরে অপরূপ টালি কাজের জন্য দি ব্লু মস্ক (The Blue Mosque) নামে বিশ্ববিখ্যাত।

৩২০ ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমদ মসজিদ; দি ব্লু মস্ক

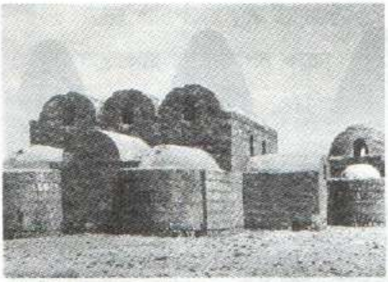

৩২১ প্রাসাদ কাস্‌র আল-আম্‌রা, দামেস্ক

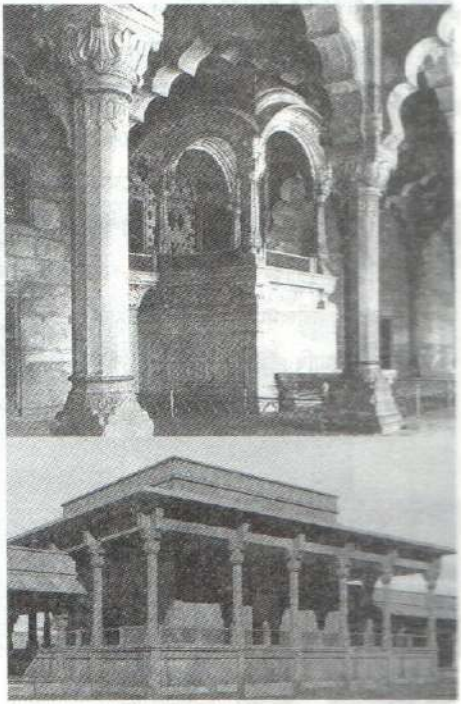

৩২২ আগ্রা কেল্লার দিওয়ান-এ-আম ও দিওয়ান-এ-খাস

ইসলামি স্থাপত্যে বিভিন্ন প্রকার ভবনের মাঝে অন্যতম হচ্ছে প্রাসাদ। মরুভূমিতে নির্মিত প্রাসাদের মধ্যে দামেস্কের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কাস্‌র আল-হেয়ার (Qasr al-Hair) (৭২৮-৯ সাল) সামরিক স্থাপত্যের অগ্রদূত। বিরাট এলাকা জুড়ে তৈরি মোগল প্রাসাদগুলোতে দিওয়ান-এ-আম (সাধারণদের সাথে দেখা করার স্থান) এবং দিওয়ান-এ-খাস (বিশেষ অতিথিদের সাথে সাক্ষাতের স্থান) সুপরিকল্পিত বাগানের মাঝে অবস্থান করত। তবে এখানেও গম্বুজ, খিলান, ইত্যাদি উপাদান ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের সুবাদে দিল্লি কিংবা আগ্রার কেল্লায় ইসলামি স্থাপত্যের প্রাচুর্যের কিছুটা নমুনা পাওয়া যায়। সেদিক থেকে সম্রাট আকবরের ফতেহ্‌পুর সিক্‌রি (Fatehpur Sikri) কম যায় না।

৩২৩ ফতেহ্‌পুর সিক্রীর ফটক

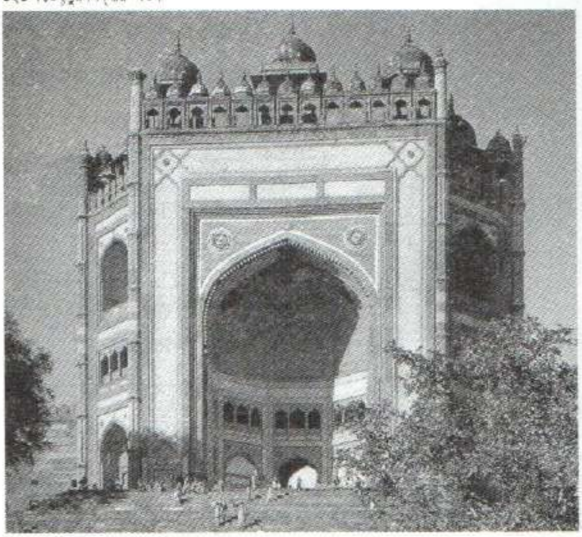

ইসলামি স্থাপত্যে সমাধি

ইসলামের ইতিহাসে সমাধির স্থাপত্য বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যদিও ইসলাম ধর্ম কবরকে অতি সাধারণ রাখার পক্ষে উৎসাহিত করে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে অনেক মুসলমানের কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশালাকার জাঁকজমকপূর্ণ সমাধি। সাধারণত কবরের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ নির্মাণ করা হতো। আগ্রার তাজমহল বিশ্বের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ এরূপ সমাধি। ঢাকায় অবস্থিত তিন নেতার মাজারও এই রীতির সাক্ষ্য বহন করে

৩২৪ তিন নেতার মাজার, ঢাকা

সমরকন্দের (Samarkand) স্থাপত্য

৩২৫ সমরকন্দের গুর-এমির

১৪শ শতাব্দীতে তৈমুরের (Taimur) নেতৃত্বে তুর্কিস্তানের সমরকন্দে গড়ে ওঠে নতুন এক স্থাপত্য রীতি। সমরকন্দের শ্রেষ্ঠ ইমারতের মধ্যে রয়েছে নীল টালির কাজে সমৃদ্ধ গুর-এমির (Gur-Emir) (১৪০০)।

তৈমুর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নাতির সমাধিস্তম্ভ রূপে গুর-এমির নির্মাণ করেন এবং ১৪০৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকেও সেখানে কবর দেয়া হয়। তৈমুর এবং তাঁর বংশধরদের সময়ে বিরাটাকার জায়গায় টালি দিয়ে অলঙ্করণের শিল্প সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছায়।

১৫২৬ সালের পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে মোগল সম্রাট বাবর ভারত উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রকৃত মোগল স্থাপত্য রীতি ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৫৬-১৬০৫) নিজস্ব রূপ ধারণ করে। পারস্যের নির্মাণ শৈলী এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে মোগলরা ভারতীয় স্থাপত্যের রূপ পাল্টে দেয়।

৩২৬ দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি

মূলত পারস্য দেশের ধরনে, বিশেষ করে কাশ্মীরে, সম্রাট বাবর বেশ কয়েকটি বাগান তৈরি করেন। তবে তার একটি নিদর্শনও আজ আর টিকে নেই। বাবর ১৫৩১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাবর দ্বারা স্থাপিত মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর আগে আফগানিস্তানের শের শাহ্ শূর (Sher Shah Sur) সাময়িকভাবে (১৫৩৫-৪০ হতে ১৫৫০-৫৫) দিল্লী শাসন করেন। শের শাহ্ শূরের পনেরো বছর শাসনকালে নির্মিত হয় বিরাটাকার গেট সমৃদ্ধ দিল্লীর পুরানো কিল্লা ও কিলা-ই-কুহ্না (Qila-i-Kuhna) মসজিদ

৩২৭ সাসারামে শের শাহ্ শূরের সমাধি

৩২৮ সাসারামে শের শাহ্ শূরের সমাধি

(১৫৪২) এবং বিহারের শাহাবাদ জেলায় সাসারামে (Sasaram) চারটি সমাধি (১৫৩৫-৪০)। তন্মধ্যে কৃত্রিম লেকের উপরে, গ্র্যানাইটের (granite) বেদীর উপর ধূসর বেলে পাথরের গম্বুজবিশিষ্ট দেড়শত ফুট উঁচু শের শাহ্ শূরের সমাধি (১৫৪০) প্রশংসনীয় স্থাপত্য কাজ।

সম্রাট বাবরের (১৫২৬-৩০) এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে (১৫৩০-৫৬) উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো স্থাপত্য কাজ নেই।

মোগল সাম্রাজ্যের তৃতীয় বাদশাহ্ আকবরের আমলে হুমায়ুনের স্ত্রী কর্তৃক দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি (১৫৬৫-৭০) নির্মিত হয়। হিন্দু স্থাপত্যে ব্যবহৃত ছোট ছোট গম্বুজ ব্যতীত সমরকন্দের মুসলিম স্থপতি দ্বারা ডিজাইনকৃত সম্পূর্ণ সমাধিতে পারস্যের ছাপ বিদ্যমান। আটটি বাহুবিশিষ্ট এই সমাধির অনুসরণে বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম বিশ্বনন্দিত তাজমহলের (১৬৩০-৫৩) নক্শা করা হয়।

৩২৯ পাঁচ মহল, ফতেহ্পুর সিক্রী

আকবরের অনেক কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আগ্রা শহরের তেইশ মাইল দূরে ফতেহ্পুর সিক্রিকে কেন্দ্র করে। উক্ত এলাকায় বসবাসকারী শেখ সেলিম চিশ্তী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে নিঃসন্তান আকবর তিন তিনটি সন্তান লাভ করবেন। তাই আকবরের রাজপুত স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা হলেন তখন আকবর তাঁকে সিক্রি নামক সেই গ্রামে পাঠিয়ে দেন। সেখানেই জন্ম হলো ভবিষ্যৎ বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের। সত্যি সত্যি তিন সন্তানের পিতা হবার পর আকবর সেলিম চিশ্তীর পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে এবং সিক্রীর সেই গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মরুভূমির মাঝে সিক্রীতে গড়ে তুললেন নতুন রাজধানী, নান্দনিক ফতেহ্পুর সিক্রি--- বিজয়ের শহর সিক্রি। তবে সম্ভবত পানির অভাবে আকবরকে কিছু দিনের মধ্যেই রাজধানী আবার আগ্রায় ফেরত নিয়ে যেতে হয়েছিল।

৩৩০ শেখ সেলিম চিশ্তীর কবর, ফতেহ্পুর সিক্রী
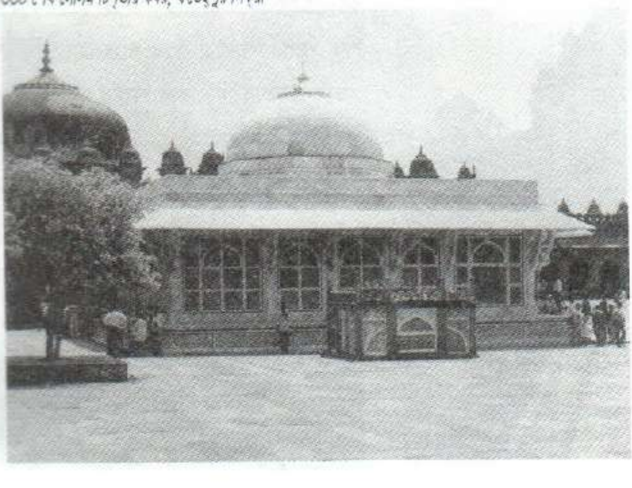

ফতেহ্পুর সিক্রির লাল বেলে পাথরের তৈরি পাঁচ মহল, মসজিদ এবং সাদা মার্বেলের তৈরি সেলিম চিশ্তীর সমাধি পারস্য ও ভারতের স্থাপত্য রীতির প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল। আজও ফতেহ্পুর সিক্রি আকবরি আমলের সৌন্দর্যচর্চার নীরব সাক্ষী হিসেবে জনমানবহীন মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে আছে একাকী, তবে গৌরবে বাঁধা বুক নিয়ে।

৩৩১ সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি

মোগল সাম্রাজ্যের রীতি অনুযায়ী জাহাঙ্গীর ১৬১২-১৩ সালে আগ্রার নিকটে সিকান্দ্রায় (Sikandra) পিতা আকবরের সমাধি তৈরি করেন। মোগল ইতিহাসে আদি স্থাপত্য কাজের মধ্যে অন্যতম এই স্মৃতিসৌধ। জাহাঙ্গীরের আমলে তৈরি লাহোরের মতি মসজিদও মোগল স্থাপত্যে বিশেষ স্থানের দাবিদার।

জাহাঙ্গীরের পুত্র সম্রাট শাহজাহানের শাসন আমলকে (১৬২৮-৫৮) মোগল স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধি হচ্ছে ভারতের আগ্রায় অবস্থিত তাজমহল (১৬৩২-৫৪)। ধব্ধবে সাদা মার্বেলের উপর নানা রঙয়ের পাথরের নিখুঁত কাজ বিশ্বে অদ্বিতীয়।

৩৩২ তাজমহল, আগ্রা

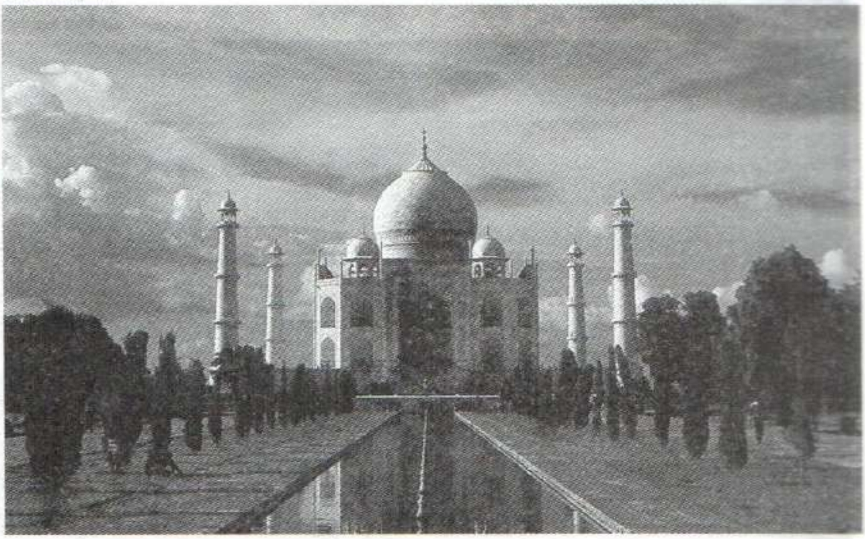

বিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে স্ত্রী মমতাজ মহলের কবর সমাধি রূপে তৈরি করেন সম্রাট শাহজাহান। তাজমহলের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মমতাজ মহলের কবর।

৩৩৩ আগ্রার তাজমহলের পশ্চিম প্রান্তে মসজিদ

পারস্যের স্থপতি ওস্তাদ ঈসা এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে আগত কলাকুশলী ও কারিগর তাজমহলের নির্মাণ কাজ করেন। সমগ্র সমাধিতে পারস্যের প্রভাব প্রকট। বিশাল বাগানের এক প্রান্তে যমুনা নদীর তীরে তাজমহল অবস্থিত, পশ্চিমে রয়েছে লাল বেলে পাথরের মসজিদ এবং পূর্বে ভারসাম্য রক্ষার জন্য একই ডিজাইনে মাদ্রাসা ভবন। ভারসাম্য নষ্ট করেছে শুধুমাত্র মমতাজ মহলের কবরের পাশে সম্রাট শাহজাহানের সমাধি।

শাহজাহান আমলের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কীর্তির মধ্যে রয়েছে দিল্লির জামে মসজিদ (১৬৪৪-৫৮) যা মোগল সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ, আগ্রার মতি মসজিদ (১৬৪৬-৫৩) ও রাজ প্রাসাদ (১৬৩৬), লাহোর কেল্লার শিশ্ মহল এবং আজমীর লেকে অবস্থিত মার্বেলের তৈরি দুটি সুসজ্জিত ভবন বা প্যাভিলিয়ন (pavilion)।

১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমল (১৬৫৮-১৭০৭) হতেই মোগল স্থাপত্যের তুলনামূলক অবনতি ঘটতে শুরু করে। তবে আট-মিনারবিশিষ্ট লাহোরের বাদশাহি মসজিদ (১৬৭৪)

৩৩৪ দিল্লির জামে মসজিদ

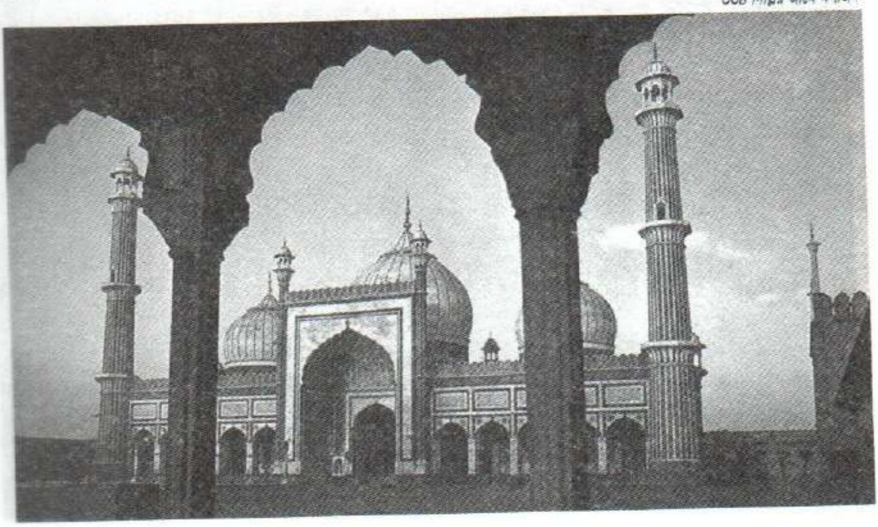

মোগল চেতনাকে আংশিকভাবে হলেও প্রতিফলিত করেছে। এর আগে দিল্লি ফোর্ট চত্বরে আওরঙ্গজেব সাদা মার্বেল দিয়ে নির্মাণ করেন মতি মসজিদ (১৬৬২)।

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। সাংস্কৃতিক ক্ষমতা চলে যায় লক্ষ্ণৌর নবাবদের হাতে। মোগল রাজধানী দিল্লীতে মুসলমানদের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন হচ্ছে লক্ষ্ণৌর প্রথম নবাবের ভ্রাতষ্পুত্র সফদর জং (Safdar Jung)-এর সমাধিস্থল (১৭৫৩)।

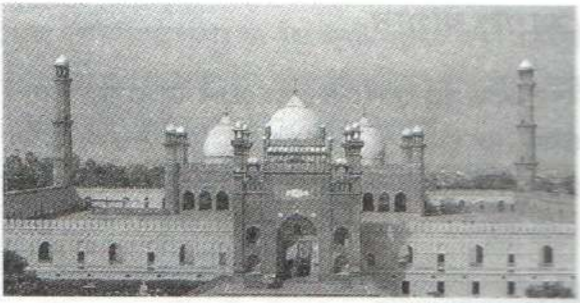

৩৩৫ লাহোরের বাদশাহি মসজিদ

৩৩৬ দিল্লি ফোর্ট

৩৩৭ লাহোর ফোর্টের শিশ মহল

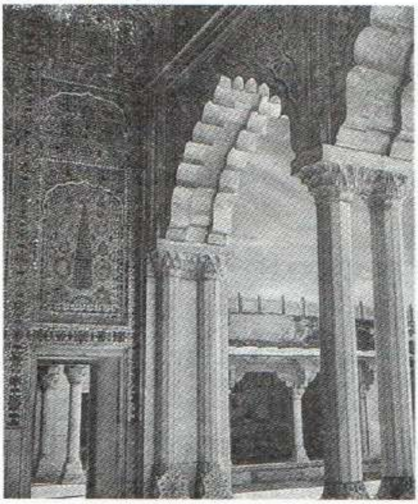

৩৩৮ দিল্লি ফোর্ট চত্বরে মতি মসজিদ

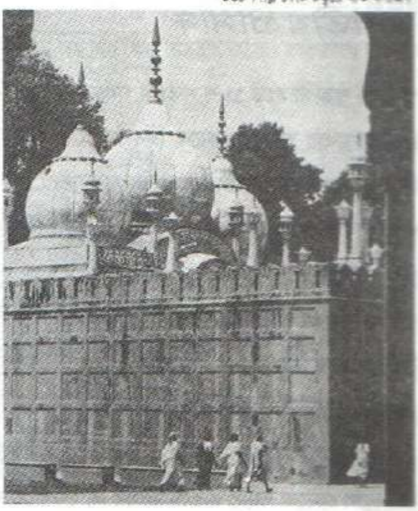

মোগল বাগান

বিশাল এলাকা জুড়ে বাগান তৈরি করতে মোগল সম্রাটরা সমান পারদর্শী ছিলেন। মোগলদের তৈরি সমাধি, প্রাসাদ, কেল্লা ইত্যাদি সর্বত্রই নয়নাভিরাম বাগানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠত। ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে পানিপথের যুদ্ধে জয়ী হয়ে প্রথম মোগল সম্রাট বাবর সেখানে সাজিয়েছিলেন কাবুল বাগ (Kabul Bagh)।

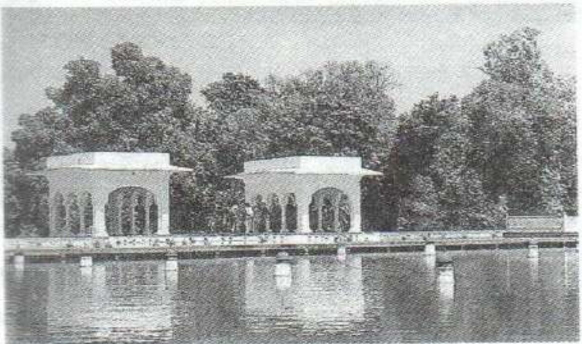
৩৩৯ লাহোরে শালিমার গার্ডেন

মোগল বাগানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক ১৬৪১-৪২ সালে লাহোরে তৈরি শালিমার বাগ বা গার্ডেন (Shalimar Garden)। অন্যান্য মোগল বাগানের মত শালিমারে রয়েছে কতকগুলো ধাপ যার দ্বারা উঁচু স্থান হতে অপেক্ষাকৃত নিচু ধাপগুলোতে চলমান পানি সরবরাহ করা সম্ভব হতো। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিরাট বাগান এলাকায় ফোয়ারা, বিশ্রামাগার, অসংখ্য গাছ, ফুলের সমারোহ শোভা পেতো। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে কাশ্মীরে তৈরি নিশাত বাগিচা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, আকারে এবং নান্দনিক সৌন্দর্যে শালিমারের সাথে তুলনা করা চলে।

ভারতীয় প্রাসাদ

পঞ্চদশ শতাব্দী হতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে কয়েকটি প্রাসাদ নির্মিত হয় তা আজও বর্তমান। এর আগের কোনো নিদর্শন আজ আর টিকে নেই। সাধারণত কোনো রাজা তাঁর শাসনকাল উদ্বোধন করতেন বিশাল এবং নব্য স্থাপত্যের চিন্তাধারায় নির্মিত কোনো প্রাসাদ দিয়ে। তাই পুরনোকে পরিত্যাগ করে রাজধানী স্থানান্তর করাও অস্বাভাবিক ছিল না।

পরিত্যক্ত প্রাসাদ কিংবা শহর সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় হয়ে যেত। তিনশত বছর রাজত্বকালে মৌর্য রাজধানী মগধ সাত আটবার স্থানান্তরিত হয়েছে। সম্রাট আকবরের ফতেহপুর সিক্রি পরিত্যক্ত হওয়া নিয়ে ঘিরে রয়েছে রহস্য। ১৮ শতাব্দীর শুরুতে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে স্থানান্তর হলে আম্বর প্রাসাদ (১৫৯২-১৬৬৮) আর ব্যবহৃত হয়নি।

মোগল শাসনের সময়কালে নির্মিত এই প্রাসাদসমূহে মোগল স্থাপত্যের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। এই ভবনগুলি কোনো ধর্মীয় কারণে নির্মিত না হওয়াতে প্রাসাদের ডিজাইন ধর্মীয় রীতিনীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল

না। প্রায় প্রতিটি প্রাসাদে শোভা পেতো একটি বিশাল দরবার হল এবং একটি আদালত কক্ষ। প্রাসাদের বাকি অংশে ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন কতকগুলো ঘর এবং চলাচলের জন্য আঁকাবাঁকা করিডোর বা বারান্দা। সমস্ত পরিবেশটা ছিল রহস্যময় যা কিনা সেকালের রাজকীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসাদসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঝুলন্ত বারান্দা, প্রাসাদের উদ্যানমুখী উন্মুক্ত গ্যালারি, থামের উপর গম্বুজবিশিষ্ট ছোট ছোট ঘর, খিলানবিশিষ্ট লম্বা বারান্দা, জাফ্‌রির কাজ, মার্বেলের বাহার এবং ভবন থেকে অনেকখানি বাড়তি বাঁকানো কার্নিশ।

৩৪০ জয়পুরের নিকট অম্বর প্রাসাদ

পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ

মোগল স্থাপত্যের অবনতির সাথে সাথে ইসলামি স্থাপত্যের জৌলুসে ভাটা পড়তে আরম্ভ করেছিল। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তি ও যোগাযোগ, সামরিক শক্তির সফলতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে পশ্চিমা দেশসমূহ এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে স্থাপত্যসহ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতসহ অনেক দেশ তারা শত শত বছর ধরে শাসন করে।

৩৪১ বাংলাদেশে ইয়োরোপীয় স্টাইলে ভবন নির্মাণ

আধুনিক স্থাপত্যের যে সকল উপাদান শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত দেশের সামগ্রী ও প্রযুক্তি দ্বারা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে সেগুলো ঐ সব দেশের স্থাপত্যে যোগ হয়েছে। শাসনের প্রথম দিকে পশ্চিমা এবং বিদেশী

স্থাপত্যের উপাদানগুলো, এমনকি পুরো ভবন, শাসিত দেশে সরাসরি বসানো হয়েছে। তবে পরবর্তী কালে তা ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হয়।

ইসলামি স্থাপত্য সর্বদা একটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে এগিয়ে গেছে। ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন সব দেশ বা এলাকায় ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি স্থাপত্যের চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করে। নতুন এলাকার নির্মাণ সামগ্রী, প্রযুক্তি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের সাথে আগত স্থাপত্যের উপাদানগুলো পরিবর্তিত হয়েছে বটে, তবে মূল ইসলামি চিন্তাধারা থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি।

বাংলাদেশে প্রাচীন স্থাপত্য

আজকের বাংলাদেশ কিন্তু সবসময়ে এই নামে পরিচিত ছিল না। অবশ্য প্রাচীন কালে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমিত ছিল না। এর অনেকগুলো ভাগ ছিল। কোনো সময়ে কয়েকটি জনপদ নিয়ে একটি রাজ্য ছিল, আবার এক রাজ্য আরেক রাজ্যের অধীনে চলে যেত। জনপদ এবং রাজ্যের নামও পরিবর্তন হতো।

পৃথিবীর অন্যান্য জনবসতির মতো প্রাচীন বাংলার প্রথম জনপদও একটি নদীর তীরে গড়ে উঠে। সেই নদীর নাম গঙ্গা। কত আগে হতে এখানে মানুষ বাস করছে তা আজ সঠিক করে বলা কঠিন; তবে বর্তমান ভারতের বর্ধমান জেলায় দামোদর নদীর পাশে বীরভানপুরে ছয় হাজার বছর পুরনো জনবসতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর হতে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে অস্ট্রিক (Austric) দ্রাবিড় (Dravidian) শ্রেণীর মানুষ বসবাস করত । এরাই হচেছ বাঙালি জাতির আদিপুরুষ।

প্রাচীনকালে বর্তমান ঢাকা এবং ফরিদপুর নিয়ে যে এলাকা তার নাম ছিল বঙ্গ। কলিকাতা, হাওড়া এবং মেদিনিপুর এলাকা সুখ্য নামে পরিচিত ছিল। এই সুখ্যরই পরবতী নাম হয় দক্ষিণ রাঢ়। পাবনা, বগুড়া এবং রাজশাহী এলাকার নাম প্রথমে ছিল পুন্ড্র এবং বরেন্দ্র। গঙ্গার দক্ষিণ তীরের নাম ছিল অঙ্গ। বর্তমান বিহারকে বলা হতো মগধ। আজকের রাজশাহী, মালদা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের নাম ছিল গৌড়। কুমিল্লা ও নোয়াখালীর নাম ছিল সমতট। ময়মনসিংহ ও সিলেটের পাহাড়ী এলাকা কামরূপ নামে ছিল পরিচিত। খুলনা ও বরিশাল নিয়ে গঠিত ছিল বঙ্গাল, যার থেকে হয়তো বা আজকের বাংলা শব্দের উৎপত্তি। পরবর্তী সময়ে বরিশালকে চন্দ্রদ্বীপ নামে ডাকা হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও সিলেট এলাকার নাম ছিল হরিকেল।

প্রাচীন কাল হতে বাংলার ইতিহাসকে কয়েকটি প্রধান আমলে ভাগ করা যায়। এদের কারোরই সমগ্র বাংলার উপর কর্তৃত্ব ছিল না। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হতে উত্তর ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্যের শক্তিশালী অবাঙালি আর্যরা বাংলায় এসে রাজত্ব কায়েম করে। ইতিহাসে এই শাসনকালকেই বলা হয় মৌর্য সাম্রাজ্য।

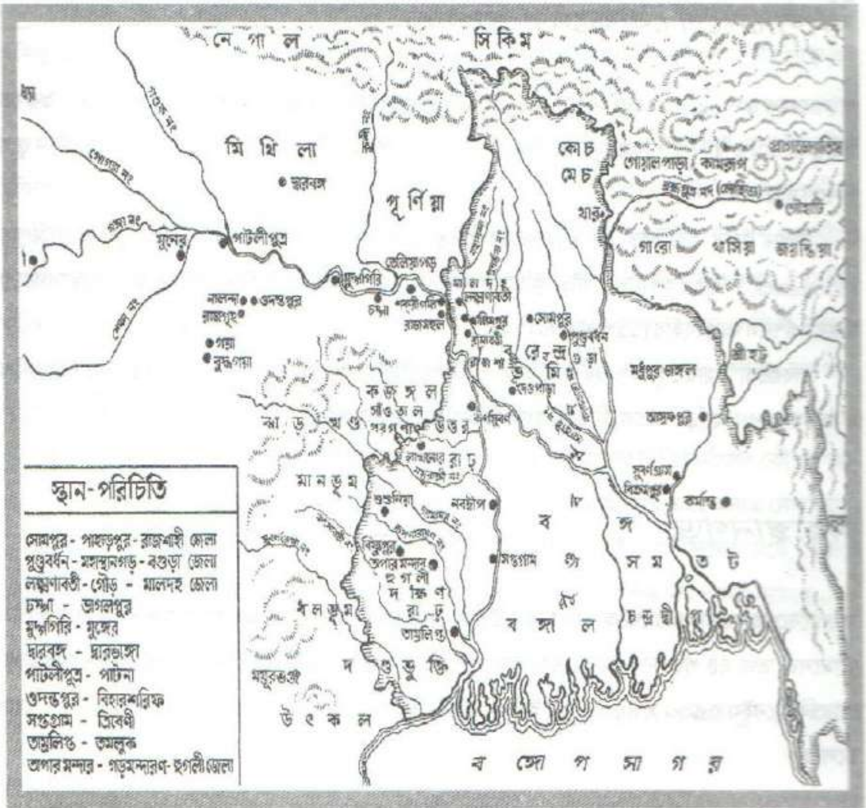

৩৫২ প্রাচীন বাংলার মানচিত্র

খ্রিষ্টীয় ৩২০ হতে ৬৩৭ সালে বর্বর হুনদের আক্রমণ পর্যন্ত বহিরাগত ব্রাহ্মণ্য গুপ্তদের আমল বলে চিহ্নিত। বর্তমান উত্তর ও পশ্চিম বাংলা গুপ্তদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ৬৩৭ হতে ৭৫৬ সাল পর্যন্ত এই একশত বছর কোথাও কারো কর্তৃত্ব ছিল না বিধায় এই সময়কালকে "মাৎসন্যায়" (অর্থাৎ 'জোর যার মুলুক তার') বলা হয়।

অন্যান্য আমলের মধ্যে রয়েছে ৬২৫ হতে ৭০৫ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খড়্গদের রাজত্ব (বঙ্গ ও সমতট এলাকা), ৬৫০ হতে ৭২৫ সাল পর্যন্ত চন্দ্রদের শাসন (বঙ্গ ও মাঝে মাঝে গৌড় এলাকা), ৭৫০ হতে ১১৬২ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের আমল (বর্তমান উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলা ,মগধ ও উড়িষ্যা), পালদের সমসাময়িক সময়ে ৮৮৫ হতে ১০৬০ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য চন্দ্রদের আমল (পূর্ব বাংলা ও গৌড় এলাকা) এবং ১০৯৬ হতে ১২০৪ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সেনদের আমল (রাঢ়, পূর্ব বাংলা, উত্তর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা), যদিও পরাজিত লক্ষণ সেন ১২২৮ সাল পর্যন্ত বাংলার বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন।

খুব প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন বাংলাদেশের বৃষ্টিভেজা আবহাওয়া এবং কম টেকসই নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে যৎসামান্য যা আছে তা নিয়ে বাঙালি গর্ববোধ করতে পারে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের স্থাপত্য

বাংলাদেশে স্তূপ (stupa) এবং বিহার (vihara) --- এই দুই ধরনের বৌদ্ধ নির্মাণ কার্য দেখা যায়। শুরুতে ধর্মীয় মতে মৃত ব্যক্তির পবিত্র স্মৃতির চিহ্ন রাখার স্থান হিসেবে তৈরি হলেও পরবর্তী সময়ের বস্তুবিহীন স্তূপ পাওয়া যায়।

বিহার তৈরি করা হতো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান হিসেবে। যেমন: রাজশাহীর পাহাড়পুরে সোমপুরা (Somapura) বিহার (অষ্টম শতাব্দী), কুমিল্লার শালবন বিহার (অষ্টম শতাব্দী) এবং বগুড়ার মহাস্থানগড়ের উত্তর-পশ্চিমে ভাসু বিহার (১১শ শতাব্দী)।

সবগুলো বিহার থেকে পাথর এবং তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জের (bronze) মূর্তি, পয়সা, পোড়ামাটির কাজ, অলঙ্করণ, হাড়ি-পাতিল, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।

মহাস্থানগড়

বাংলাদেশের বগুড়া শহর থেকে আট মাইল উত্তরে, করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড় অতি প্রাচীন আমলের, তথা ষষ্ঠ শতাব্দীর শহর। তবে অত পুরনো শহরের স্বাক্ষর হিসেবে ইটের কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু নেই। ৫০০০ X ৪৫০০ ফুট ইটের বেষ্টনীর ভিতরে এবং বাইরে শত শত বছর ধরে নির্মাণ কাজ চলেছে।

৩৪৩ মহাস্থানগড়

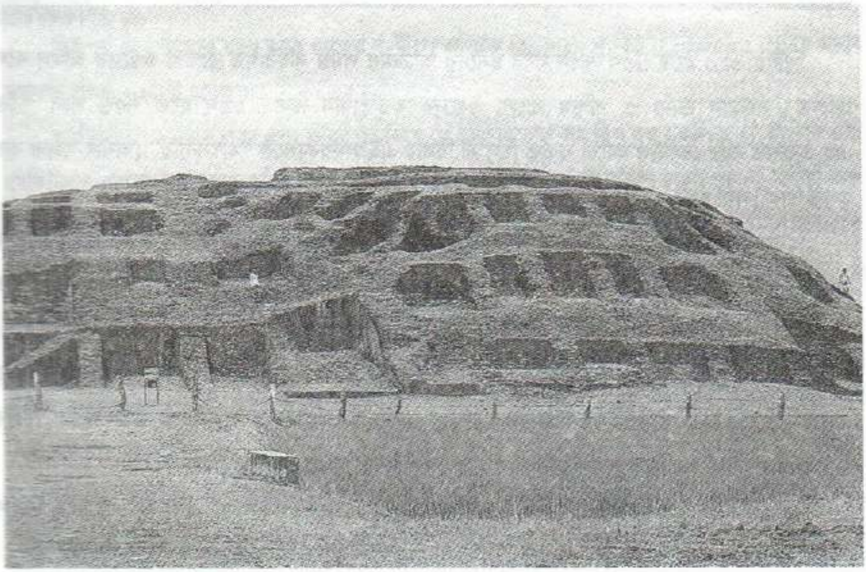

বেষ্টনীর বাইরে উল্লেখযোগ্য নির্মাণ কাজের মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠ এবং অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি দুইটি মন্দির যা সম্মিলিতভাবে গোবিন্দ ভিটা নামে পরিচিত। এছাড়া বেষ্টনীর বাইরে অনেকগুলো ঢিবি খুঁড়ে এই এলাকায় শত শত বছরের পুরনো দালানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

বেষ্টনীর ভিতরে রয়েছে অষ্টম এবং একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত পাথরের থামবিশিষ্ট বৈরাগীর ভিটা মন্দির, খোদাই পাথরের ঢিবিতে বৌদ্ধদের মন্দির, মনকালির ভিটার নীচে ১৫শ কিংবা ১৬শ শতাব্দীতে পাঁচটি মিহ্‌রাববিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, ১৮শ শতাব্দীর মসজিদ, আধুনিক কায়দায় ১৯শ শতাব্দীতে তৈরি রাজা পরশুরামের প্রাসাদ, পরশুরামকে পরাজিত করেছিলেন যে মুসলমান ফকির তাঁর কবর, ইত্যাদি। অধিকাংশ নিমাণকার্য ইট দিয়ে হলেও এই সব পুরনো মন্দির এবং দালানে পাথরের থাম, কড়ি ও দরজার বাজু (jamb), সাজের জন্য অলঙ্কৃত দেয়াল রয়েছে। এছাড়া সেখানে পোড়ামাটির কাজ, সোনার অলঙ্কার, পাথরের ভাস্কর্য, লোহার জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।

মাটি দিয়ে ভরাট করা ইটের তৈরি প্রকোষ্ঠ থাকে থাকে সাজিয়ে দালানের ভিত্তি নির্মাণের কৌশল ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় প্রচলিত ছিল। এই ধরনের পদ্ধতি গোবিন্দ ভিটা মন্দিরে এবং অন্যত্র দেখা যায়। এরকম ১৭২টি প্রকোষ্ঠ ব্যবহৃত হয়েছে মহাস্থানগড়ের দক্ষিণে গোকুলে অবস্থিত লক্ষীন্দরের মেধে, যেখানে সম্ভবত ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধস্তূপের উপর ১২শ শতাব্দীতে শিবের একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

ভাসু বিহার

ভাসু বিহারের বেষ্টনীর দৈর্ঘ্য ৮০০ ফুট এবং প্রস্থ ৭৫০ ফুট। ব্যতিক্রমধর্মী এই বিহারে রয়েছে পৃথক দুটি মঠ। মন্দির এখানে উঠানের মাঝখানে নয়; বরং দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে অবস্থিত। তিন ধাপের মন্দিরটির মাঝখানে রয়েছে মণ্ডপ। ছোট মঠটিতে (১৫২ X ১৬২ ফুট) রয়েছে ২৬টি প্রকোষ্ঠ; বড় মঠটিতে ৩১টি। প্রকোষ্ঠগুলোর সামনের বারান্দা প্রস্থে সাড়ে আট ফুট।

পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার

পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড়। এই বিহারে ১৪ ফুট চওড়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা ৯১৯ X ৯২২ ফুট বেষ্টনীর উঠানের চতুর্দিকে মঠবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য প্রকোষ্ঠ রয়েছে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ১৪ ফুট চৌকা একটি ঘর। প্রকোষ্ঠগুলোর সামনে দিয়ে চলে গেছে নয় ফুট চওড়া বারান্দা, উঠানে ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে বেশ কতকগুলো স্তূপ, মন্দির এবং অন্যান্য ভবন।

প্রধান মন্দিরটি উঠানের মধ্যখানে অবস্থিত। এর সঠিক উচ্চতা বলা মুশকিল। ভাঙা অবস্থায়

তিন ধাপের মন্দিরটি প্রায় ৭০ ফুট উঁচু। সোমপুর বিহারের মন্দিরে বিভিন্ন সময়ের শিলা পাথরের অনেকগুলো মূর্তি পাওয়া গেছে। তবে এখানকার পোড়ামাটির কাজ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেব-দেবীদের প্রায় হাজার তিনেক পোড়ামাটির ফলকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

৩৪৪ পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার

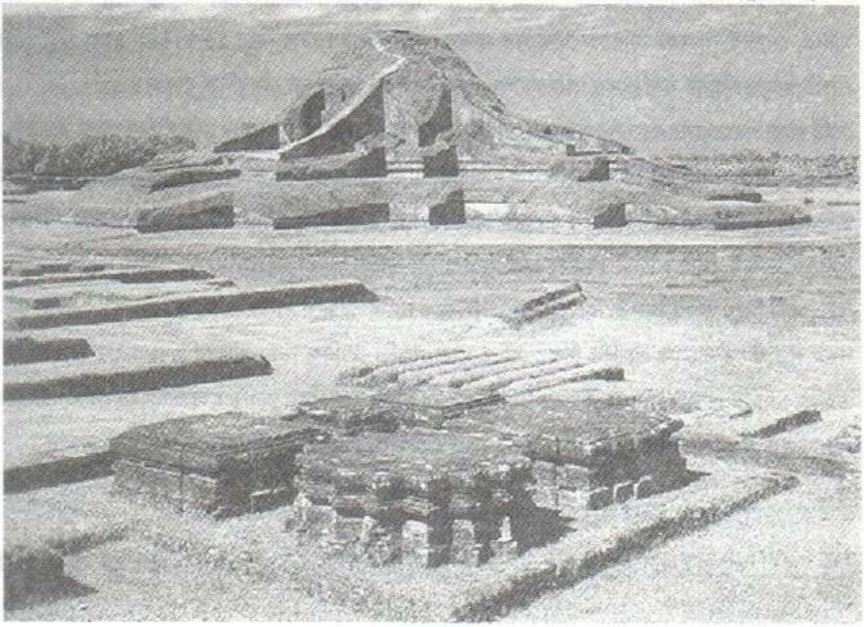

কুমিল্লার শালবন বিহার

কুমিল্লার কাছে ময়নামতি-লালমাই এলাকায় আছে ছোট ছোট পাহাড়। এখানকার মাটি খুঁড়ে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর পঞ্চাশটিরও বেশি বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির, মঠ, ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে অষ্টম শতাব্দীর শালবন বিহার সবচেয়ে বড় এবং সর্বাধিক সমাদৃত।

শালবন বিহার একবারে তৈরি হয়নি। শত শত বছর ধরে পর্যায়ক্রমে এর কাজ হয়েছে। আকারে সোমপুর বিহারের মতো, তবে ছোট। প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য পাঁচ শত পঞ্চাশ ফুট। ইট দিয়ে তৈরি ১৬ ফুট চওড়া দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে ১১৫টি প্রকোষ্ঠ যেগুলির সামনের বারান্দা আট ফুট চওড়া। উঠানের মধ্যখানে রয়েছে একটি মন্দির যা ক্রমশ বড় থেকে ছোট হয়েছে। সর্বশেষ বা ষষ্ঠ নির্মাণ স্তরের অস্তিত্ব এখন আর নেই। ঠিক তার আগের স্তরে মন্দিরটির যে ভিত্তি পাওয়া গেছে তার প্রতিটি বাহু ১৭০ ফুট লম্বা। কতকগুলো সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয় অভ্যর্থনা কক্ষে, তারপর মণ্ডপ এবং তার পিছনে রয়েছে গর্ভগৃহ।

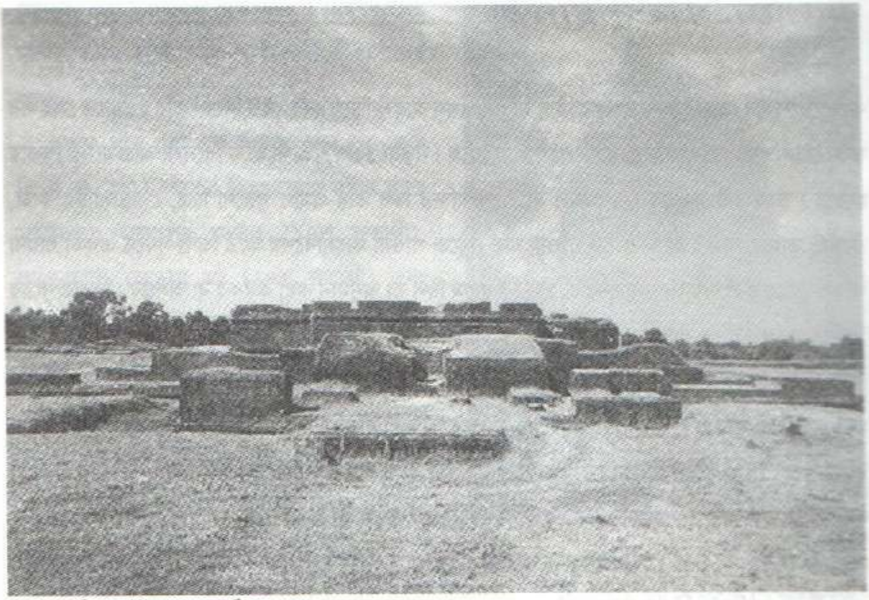

৩৪৫ ময়নামতি-লালমাই এলাকায় শালবন বিহার

কুটিলা মুড়া

ময়নামতি-লালমাই এলাকার কুটিলা মুড়ায় রয়েছে ইটের তৈরি তিনটি স্তূপ। মাঝখানের স্তূপের ভিত্তি একটি চাকার আকারে। গোলাকার ভিত্তির উপর ড্রামের (drum) মতো করে দেয়াল উঠে গেছে। অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ দিয়ে ছাদ তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় পাথরের তৈরি বুদ্ধ এবং অনেকগুলো ধর্মীয় মূর্তি স্তূপগুলোর অভ্যন্তরে পাওয়া গেছে।

৩৪৬ ময়নামতি-লালমাই এলাকায় কুটিলা মুড়া

বাংলাদেশে হিন্দু স্থাপত্য

বাংলাদেশে খুব বেশি পুরনো কালের হিন্দু মন্দির এখন আর দাঁড়িয়ে নেই। ইট দিয়ে তৈরি হওয়াতে সেই সব ভবন রোদ-বৃষ্টি-গাছপালার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। নতুবা ১৩শ শতাব্দী হতে বিদেশী আক্রমণের শিকার হয়েছে। তবে এই অঞ্চলে গুপ্ত আমল হতে যে মন্দির ছিল তার প্রমাণ পুরনো চিত্র, পোড়ামাটির কাজ, ভাস্কর্য, তামার পাত্র ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। খুঁজে পাওয়া ধ্বংসাবশেষ হতে ভিত্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া গেলেও ঐ সব ভবনের চাল বা ছাদ কি রকম ছিল তা অনুমান করা কষ্টকর বা অসম্ভব। দিনাজপুরের বৈগ্রামে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন (৪৭৭-৭৮ সাল) হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

অষ্টম শতাব্দী হতে মুসলমানদের আগমনের পর যে সকল মন্দির নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে মুসলমানদের তৈরি ভবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদের (১৪৫৯) উপরিভাগের মধ্যস্থল অবস্থিত চৌ-চালা ইটের ঘরটির কথা বলা যায়; যা পরবর্তীকালে বাংলার অনেক মন্দিরে, এমনকি ভারতে সুদূর রাজস্থানে মহারাজা মানসিংহের আম্বার প্রাসাদেও (Amber Palace) (১৫৯২-১৬৬৮) অনুকরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুসলমানদের তৈরি খিলান ও ধনুকাকৃতির ছাদও পরবর্তীকালের হিন্দু মন্দিরে শোভা পায়।

হিন্দু স্থাপত্যে বাংলাদেশে মূলত চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যথা:

প্রথমত উত্তর ভারতের উড়িষ্যা প্রাদেশিক রীতির অনুকরণে স্থানীয় স্টাইলে কিছু মন্দির;

দ্বিতীয়ত হিন্দু-বৌদ্ধ মঠ বা বিহার স্থাপত্য;

তৃতীয়ত পাল এবং সেনদের রাজত্বকালের দালানসমূহ;

চতুর্থত এই এলাকার মাটি, বাঁশ, কাঠ, ইত্যাদির সাধারণ ঘর-বাড়ি হতে উদ্ভূত বাংলার নিজস্ব সত্তার স্থাপত্য।

উড়িষ্যা রীতি অনুকরণ

উড়িষ্যা রীতিতে তৈরি মন্দিরগুলো প্রধানত বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বিহারে দেখা যেত। এই মন্দিরগুলো সাধারণত পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হলেও উড়িষ্যার মতো ততটা জাঁকজমকপূর্ণ নয়। গর্ভগৃহ, অর্থাৎ প্রতিমা রাখার কেন্দ্রীয় স্থান, প্রায় সর্বদা সমকোণী হতো। মূল বেদীর উপরে থাকত বাঁকানো উঁচু শিখর, যা রেখা নামেও পরিচিত। মন্দির দোতলা হলে সুস্পষ্ট কার্নিশ দ্বারা শিখর ভাগ করা থাকত। অলঙ্করণ করা হতো ভূমির সমান্তরালে থাক্ থাক্ করে সাজানো একটার উপর আর একটা

খোদাই করা পাথরের সারি দিয়ে। এই ধরনের মন্দির অষ্টম হতে একাদশ শতাব্দীতে পালদের আমলে নির্মিত।

তার পরে প্রায় এক হাজার বছর পর তৈরি শিখর বা রেখা স্টাইলের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফরিদপুরে মথুরাপুর দেউল (১৭শ শতাব্দী), বাগেরহাটে কোদলা মঠ (১৭শ শতাব্দী) এবং ঢাকার টঙ্গিবাড়ীতে সোনারং-এর দুটি মন্দির-- বড় মন্দির (১৮৪৩) ও ছোট মন্দির (১৮৮৬)। ১৭-১৮শ শতাব্দীতে প্রধানত ইট দিয়ে নির্মাণ কাজ করা হতো। সে আমলে শিখরের গায়ে সমান্তরাল ইটের সারির মাঝে পোড়ামাটির প্যানেল দিয়ে অলঙ্করণ করা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

৫৪৭ বাগেরহাটে কোদলা মঠ

দেউল শব্দটি উড়িষ্যা স্থাপত্যে গর্ভগৃহ বোঝাতে ব্যবহার হতো। মথুরাপুর দেউলের শিখরের উচ্চতা সত্তর ফুট, সোনারং-এর বড় মন্দিরেরটা দেড়শত ফুট। সোনারং-এর দুটি মন্দিরই নবরত্ন মন্দির ছিল। বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নবরত্ন মন্দিরের কথা পরে আলোচিত হয়েছে।

সরাসরি মাটি থেকে উঠে আসা শিখর কিংবা অর্ধ-বৃত্তাকার এক ধরনের মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে ইতিহাসবিদরা বিশ্বাস করলেও ভাঙ্গনের কারণে এখন তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

বিহার স্থাপত্য

বিহার স্থাপত্যের নমুনা বগুড়ার মহাস্থানগড়ে রাজশাহীর পাহাড়পুরে এবং কুমিল্লার ময়নামতিতে দেখা যায়। এই সমস্ত মঠের আশেপাশে সমকালীন কিছু মন্দির ঐ বিহারের স্থাপত্যের চরিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিভিন্ন ধর্মের কাহিনী বর্ণনা করে পোড়ামাটির কাজ ঐসব বিহার এবং মন্দিরগুলোতে শোভা পেতো। বৌদ্ধ, হিন্দু এবং জৈনরা ধর্মীয় কাজে মঠ এবং মন্দিরে যাতায়াত করত।

বিহার স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত মন্দিরের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে মহাস্থানগড়ে বিহারের বেষ্টনীর বাইরে গোবিন্দ ভিটার দুইটি মন্দির (বড়টি ৬ষ্ঠ ও ছোটটি ১১শ শতাব্দী) এবং বেষ্টনীর ভিতরে বৈরাগী ভিটার ছোট মন্দির (অষ্টম শতাব্দী) ও বড় মন্দির (১১শ শতাব্দী)। এছাড়া রংপুরে বিরাত মন্দির পাহাড়পুরের সমসাময়িক ও একই রীতিতে নির্মিত। এই সব মন্দিরের কেন্দ্রীয় ঘর বা গর্ভগৃহ উঁচু স্থানে তৈরি করা হতো। গর্ভগৃহের চতুর্দিকে স্তরে স্তরে মাটি ভর্তি ছোট ছোট ঘর বা প্রকোষ্ঠ তৈরি করে মূল মন্দিরকে উঁচু করা হতো। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ হতে মন্দিরের ছাদ সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়।

পাল এবং সেনদের রাজত্বকাল

পাল এবং সেন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান ভারতের মালদার নিকট লখনৌতিতে (সেনদের রাজধানী) কৃষ্ণশিলা দিয়ে তৈরি অতিমাত্রায় অলঙ্কৃত কিছু ভবন দেখা যায়। এই কালো পাথর আনা হয়েছিল নিকটস্থ বিহারের রাজমহল এলাকা থেকে।

পশ্চিম বাংলার বর্ধমান ও চব্বিশ পরগনা এলাকায় অষ্টম হতে একাদশ শতাব্দীর কয়েকটি মন্দির পাল এবং সেন স্থাপত্য রীতির সাক্ষ্য বহন করে। উঁচু গর্ভগৃহের উপর অলঙ্কৃত ধাপে ধাপে তৈরি শিখর, মন্দিরের খাটো ভিত্তি, তিনপাতাবিশিষ্ট খিলান, উঁচু মাত্রার ভাস্কর্য এবং নিখুঁত লোহার কাজ তখনকার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। পালদের আমলে যে শিল্পের যাত্রা শুরু সেনদের সময়ে তা পূর্ণতা লাভ করে।

১১৯৭ সালে মুসলমানদের অধিকারে যাবার পর লখনৌতি ধ্বংস হয়ে যায়। মুসলমানদের নতুন রাজধানী গৌড়ে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয় লখনৌতির প্রাচীন ভবনের পাথর, ইট, অলঙ্করণ ইত্যাদি।

বাংলার নিজস্ব সত্তার স্থাপত্য

বাংলার মাটিতে আদিকাল হতে ব্যবহৃত মাটি, কাঠ, বাঁশ, ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সাধারণ বসতবাড়ির এক বিশেষ রূপ রয়েছে। কুঁড়েঘর নামেই এর ব্যাপক পরিচিতি। আজও বাংলার গ্রামে কুঁড়েঘরেই বেশির ভাগ মানুষ বাস করে। বলা বাহুল্য কুঁড়েঘরে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী ছিল নিতান্তই অস্থায়ী।

৩৪৮ বাংলার কুঁড়েঘর

স্থায়িত্ব লাভের চেষ্টায় যখন ইট এবং মাঝেমধ্যে লালমাটি দিয়ে নির্মাণ কাজ হতে লাগল তখনও নির্মিত ভবন সেই কুঁড়েঘরের স্পষ্ট আকার ধারণ করল। বিশেষ করে বাঁকানো ছাদ এবং কার্নিশের মাধ্যমে বাংলার সাধারণ বাড়ির ছবি ফুটে উঠল।

বিশাল থাম, দেয়ালে পোড়ামাটির কাজ, সমকোণাকৃতির একই প্যানেল পুনঃব্যবহার, বড় খিলানকে একাধিক ছোট খিলানে বিভক্তিকরণ, একাধিক রত্ন বা শিখর ইত্যাদি বাংলার স্থাপত্যের

চতুর্থ বা নিজস্ব ধারার বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার স্থাপত্য রীতি সুদূর আগ্রা, আম্বর প্রাসাদ ইত্যাদি স্থানে অনুকরণ করা হয়েছে। ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলার নিজস্ব ধারার বাহক।

কুঁড়েঘরে যেমনটি বিভিন্ন ধরনের চালা বা ছাদ দেখা যায়, ঠিক তেমনি স্থায়ী সামগ্রী দিয়ে তৈরি মন্দিরের উপর শোভা পেলো হরেক রকমের চালা। চালা বা চালের সংখ্যা অনুযায়ী মন্দিরকে নামকরণ করা হলো এক-বাংলা বা দো-চালা, চৌ-চালা, আট-চালা ইত্যাদি।

৩৪৯ পাথরে বাংলার কুঁড়েঘরের অনুকরণ

রংপুরের রুদ্রনগরে ১৬০১ সালে নির্মিত এক-বাংলা মন্দির আজও বর্তমান। পাবনায় কপিলেশ্বর মন্দির (১৬৩৫) ও মাগুরায় সাতরজতপুর মন্দির (১৬৯৩) চৌ-চালার দৃষ্টান্ত। যশোরের শিব মন্দিরটি (১৬৯৬) আট-চালার, তবে তার উপরে আবার শিখর আছে।

পরে এই বাঁকানো ছাদের উপর এক ধরনের অতিমাত্রায় অলঙ্কৃত শিখর স্থান পেল। শিখরের সংখ্যা অনুযায়ী মন্দিরের নামকরণ করা হতো। যথাঃ পাঁচ শিখরের মন্দিরকে পাঁচ-রত্ন, নয় শিখরের মন্দিরকে নবরত্ন বলা হতো ইত্যাদি।

৩৫০ ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির

৩৫১ রাজশাহীর পুঠিয়ার গোবিন্দ মন্দির

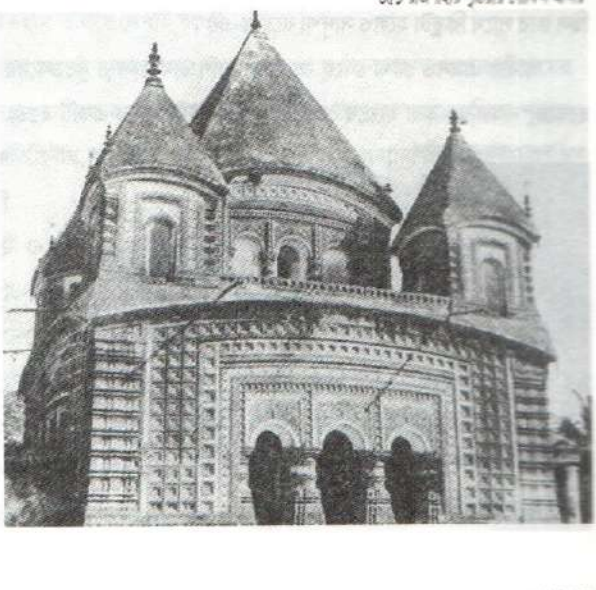

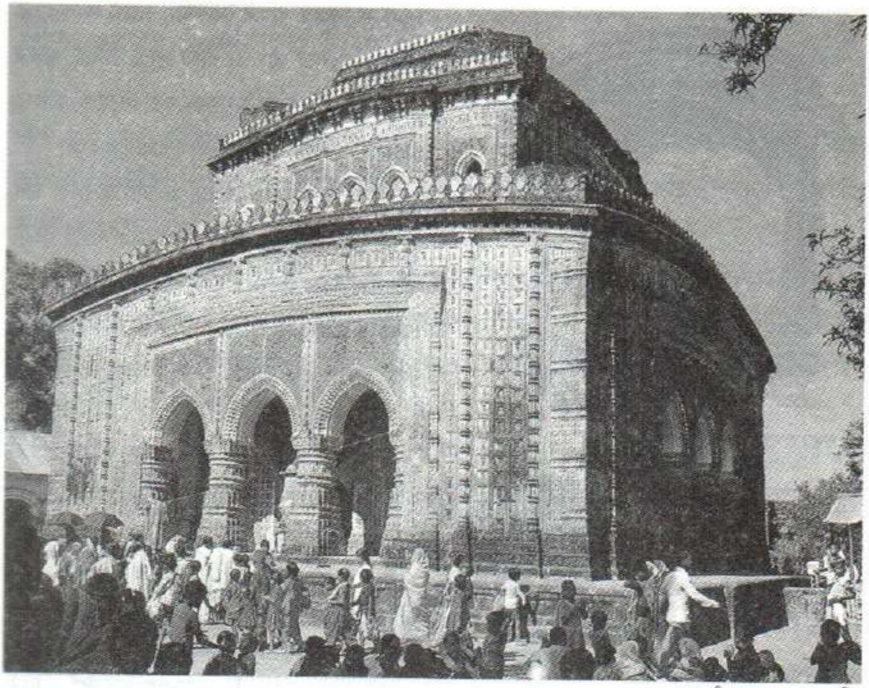

৩৫২ দিনাজপুরের কান্তনগর মন্দির

রাজশাহীর পুঠিয়ায় দুই তলাবিশিষ্ট গোবিন্দ মন্দির (১৮২৩-৯৫) পাঁচ-রত্ন, দিনাজপুরের কান্তনগর মন্দির (১৭৫২) নবরত্ন এবং কুমিল্লার জগন্নাথপুরের মন্দির (১৮-১৯শ শতাব্দী) সতের-রত্ন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চালুক্য মন্দিরগুলোতে প্রধান চোঙ্গার চারপাশে একাধিক ছোট চোঙ্গার যে ব্যবহার প্রচলিত ছিল তার সাথে কিছুটা হলেও সাদৃশ্য রয়েছে এর।

আবার এমনও দেখা গেছে যে, লাগালাগি এক জোড়া কুঁড়েঘরের আকারে ইট দিয়ে মন্দির নির্মিত হয়েছে; নামকরণ করা হয়েছে জোড়-বাংলা। দুইটি ঘরের একটি হতো গর্ভগৃহ এবং অন্যটি মণ্ডপ। ১৮শ শতাব্দীতে নির্মিত একটিমাত্র ভিত্তির উপরে অবস্থিত পাবনার জোড়-বাংলা মন্দিরে খিলানাকৃতির তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে।

৩৫৩ পাবনার জোড়-বাংলা মন্দির

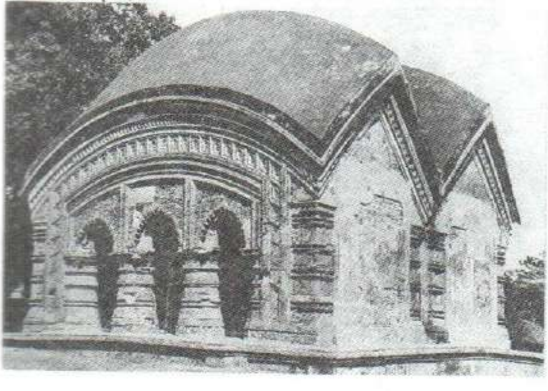

ব্যতিক্রমধর্মী মন্দির তো আছেই; যেমন মাদারিপুরের খালিয়ায় রাজারাম মন্দির (১৮শ শতাব্দী)। দুই তলা এই মন্দিরের মধ্যখানে রয়েছে এক-বাংলা বা

দো-চালা ঘর যার দুই পাশে রয়েছে একটি করে চৌ-চালা ঘর। যশোরে চাচরার শিব মন্দিরের (১৬৯৬) কথা আগেই বলা হয়েছে। এটি আট-চালার, তবে তার উপরে আবার শিখর রয়েছে।

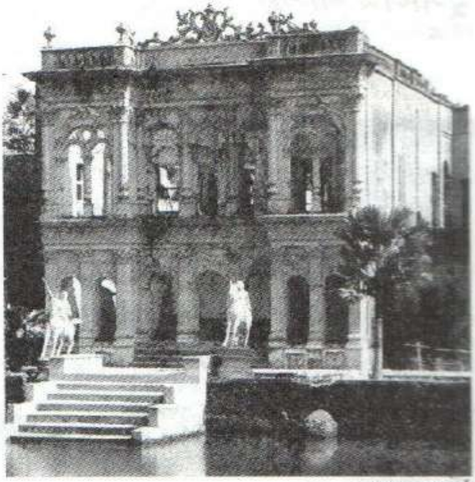

৩৫৪ ঢাকার সোনারগাঁ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের হিন্দু স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে ঢাকার অদূরে সোনারগাঁয়ে পানাম নগর। সেখানে ১৯শ শতাব্দীতে একটি সরু রাস্তার দুই পাশে অবস্থাপন্ন হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাদের বাসস্থান নির্মাণ করেছিল। ইটের তৈরি ভবনগুলো ছিল অতিমাত্রায় অলঙ্কৃত। ভারত বিভাগের পর (১৯৪৭) অনেক হিন্দু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করলে ক্রমশ পানাম নগর ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের অনেক ভবনেরই ভাগ্যে পানামের পরিণতি ঘটেছে।

বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য

বাঙালি মুসলমানদের জন্য তৈরি স্থাপত্যের নিদর্শনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা উভয় বাংলায় দেখা যায়। এর কারণ নির্ণয় করার জন্য এ দেশের ইতিহাস তলিয়ে দেখাই যথেষ্ট।

অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে আরব দেশের মুসলমানেরা সমুদ্রপথ দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সমুদ্রকূলে ব্যবসা ও বসবাস শুরু করে। বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলার প্রাচুর্যের কথা কালক্রমে ছড়িয়ে পড়লে তুর্কি, আরব, পারসি, মধ্য এশীয়, আবিসিনীয়, আফগান, মোগল এবং বৃটিশ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতি বাংলাদেশে আসে।

১৮শ শতাব্দীতে বৃটিশ ব্যবসায়ী ও শাসকদের আগমনের আগে গ্রিসদেশীয়, পর্তুগীজ (Portuguese), ওলন্দাজ (Dutch), ফরাসি এবং ডেনমার্কবাসীরা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এদেশে স্থাপিত তাদের কারখানায় উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে আসে। তবে বৃটিশদের মতো এত অধিক কাল ধরে (১৭৫৭-১৯৪৭) কোনো বিদেশী বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করেনি।

বিদেশী হলেও মোগলদের কথা আলাদা। তারা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। পক্ষান্তরে বৃটিশ এবং অন্য ইয়োরোপীয়রা বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র ব্যবসার উৎস ও তাদের পণ্য-দ্রব্যাদির বাজার হিসেবে গণ্য করেছে।

মুসলিম শাসন

১২০৪ সালে বাংলার হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে তুর্কী মুসলমান সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খালজি উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম করেন।

দিল্লীর সুলতান কুর্তুবউদ্দিন আইবাকের সেনাপতি বখতিয়ার উদ্দিন খালজীর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দিন দ্বারা সূচিত তুর্কী রাজত্বকাল দিল্লীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ১২২৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তবে দূরত্ব এবং ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত কারণে বাংলা প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় আধিপত্য বিস্তার করতে দিল্লীর সর্বদা বেগ পেতে হয়। এরই সুযোগে প্রাদেশিক প্রশাসকগণ দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন রাজ্য কায়েম করতে সদা সচেষ্ট থাকতেন।

গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খালজী ছিলেন শেষ তুর্কী এবং দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত প্রথম সুলতান। দিল্লী তাতে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। দিল্লীর সুলতান ইল্‌তুত্‌মিশের পুত্র যুবরাজ নাসিরউদ্দিন সুলতান বাংলা আক্রমণ করেন। ইওয়াজ খালজীকে পরাজিত করে নাসিরউদ্দিন সুলতান পুনরায় দিল্লীর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

মামলুক বা ক্রীতদাসদের রাজত্ব

শুরু হয় মামলুক সুলতানদের বা ক্রীতদাসদের রাজত্বকাল। কারণ পরবর্তী ষাট বছর দিল্লীর অধীনে যে পনের জন সুলতান বাংলা শাসন করে তার মধ্যে দশ জনই ছিল দিল্লীর রাজ দরবারের ক্রীতদাস। শেষ মামলুক সুলতান, মুঘিসউদ্দিন তুখরাল দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে দিল্লীর সুলতান বলবনের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে তা কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য স্থাপিত হয়। বলবনের শাসন বাংলায় ১৩২৮ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল।

মামলুক আমলে ইট এবং ইট ও পাথরের কাজ দেখা যায়। মূলত পশ্চিম বাংলার হুগলী, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামে পোড়ামাটির অলঙ্করণসহ, তবে কোণার উঁচু থাম ব্যতীত, মসজিদ নির্মিত হয়।

দিল্লীর কর্তৃত্বের অবসানের পর একাধিক স্বঘোষিত শাসকের অধীনে বাংলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন এলাকায় ভাগ হয়ে যায়। রাজ্য দখল নিয়ে অনেক রক্তক্ষরণের পর সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করেন।

সুলতানি আমল

৩৫৫ পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ

পরবর্তী দুই শত বছরের বেশি সময় সুলতানি আমল নামে খ্যাত। ১৩৪২ হতে ১৪৮৬ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী বংশ, ১৪৯৩ হতে ১৫০৪ পর্যন্ত আরবদের হোসেন শাহী বংশ এবং ১৫৬৪ হতে ১৫৭৫ পর্যন্ত আফগান কার্‌রানীদের বংশ বাংলা শাসন করেছে। ঐ সময়কালে মাঝে-মধ্যে অন্যদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। যেমন ১৪১৪ হতে ১৪৪২ পর্যন্ত হিন্দু রাজা গণেশ ও তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্র এবং ১৪৮৬ হতে ১৪৯৩ পর্যন্ত বারবাক শাহ'র নেতৃত্বে আবিসিনীয় হাব্‌সী খোজারা (মূলত ইলিয়াস শাহী সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস) এই এলাকায় রাজত্ব করেছে।

মোগল শাসন

১৫৭৫ সালে মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খান শেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কার্‌রানীকে পরাজিত করে বাংলাদেশে মোগল কর্তৃত্বের সূচনা করেন। তবে বিদ্রোহী বারো ভূঁইয়াদের বশে আনতে মোগলদের সময় লেগেছিল আরো প্রায় চল্লিশ বছর। পরবর্তী প্রায় দেড়শত বছর বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে মোগল শাসন কায়েম ছিল।

বৃটিশ শাসন

মোগলদের পতনের পর ১৭১৭ সালে শেষ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজস্ব কর্মচারী মুরশিদ কুলি খান বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করে। এর চল্লিশ বছরের মাথায় ১৭৫৭ সালে নওয়াব সিরাজুদ্দৌল্লাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (British East India Company) পরবর্তী দুইশত বছরের জন্য বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। বাংলার মাটিতে বিদেশীরা মূলত স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে তাদের নিজ দেশীয় রীতিতে প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। তন্মধ্যে মোগলরা এবং বৃটিশরা এই দেশের স্থাপত্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে।

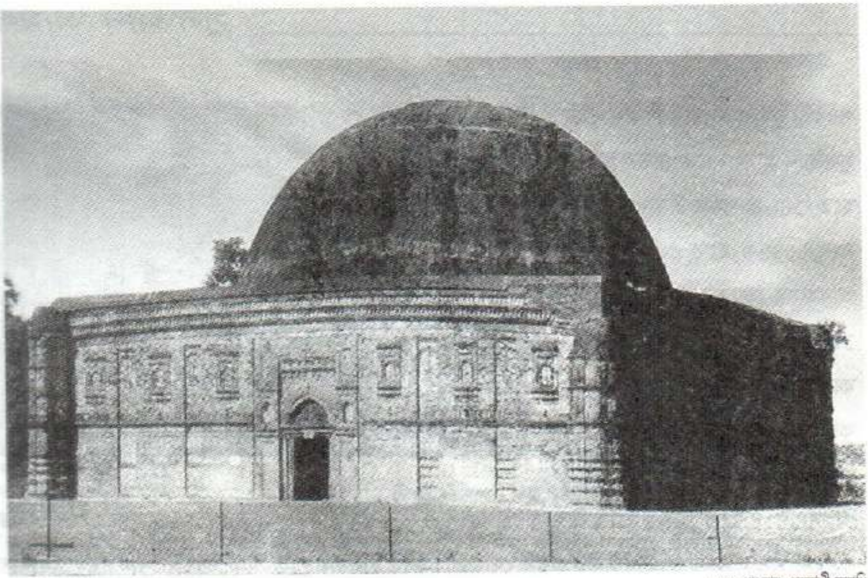

৩৫৬ পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি

বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য

মোগল স্থাপত্যের রীতিনীতি বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পকে প্রভাবিত করার আগে নির্মাণে এবং অলঙ্করণে আঞ্চলিক একটা ছাপ লক্ষণীয়। দেশজ কারিগরি দক্ষতা এবং ইসলামি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক নতুন স্থাপত্য মাত্রা।

মাটির ইটের ব্যবহার, সুচালো খিলান, ধনুকাকৃতির ছাদ ও গম্বুজ, একাধিক বৃত্তাংশে খিলানকে বিভক্তকরণ, অর্ধবৃত্তকার গম্বুজ, বাঁকানো ছাদ এবং কার্নিশ, ভবনের কোণে ছোট গম্বুজবিশিষ্ট নলাকৃতির বা অষ্টভুজ অংশ, পোড়ামাটির এবং কৃষ্ণশিলার অলঙ্করণ, এবং কুঁড়েঘরের আকৃতিতে দালান নির্মাণ বাংলার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল।

বাংলাদেশে পাথরের অভাব থাকার দরুন ইট ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। ফলে সর্বত্র খিলান দ্বারা ছাদের ভার বহণ করা হয়। মাঝে মধ্যে সুদূর বিহার হতে কৃষ্ণশিলা পাথর আমাদানি করা হতো। ইটের আগে মাটি, বাঁশ, কাঠ, পাতা, ইত্যাদি দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হতো। গ্রামাঞ্চলে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে ইট, কংক্রিট, লোহা ইত্যাদির পাশাপাশি আজও সনাতন সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে।

প্রাক-মোগল আমলের মুসলমানদের অধিকাংশ স্থাপত্যের নিদর্শন পশ্চিম বাংলার (ভারত) মালদা জেলায় অবস্থিত। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে, বিশেষ করে রাজশাহী ও খুলনা জেলায় এবং ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

মামলুক আমলের স্থাপত্য

মামলুক আমলে নির্মিত দালান-কোঠার অস্তিত্ব এখন নেই বললেই চলে।

সুলতানি আমলে স্থাপত্য

ভারতের মালদহ শহরের দশ মাইল উত্তরে পাণ্ডুয়া এবং প্রায় একই দূরত্বে দক্ষিণে গৌড়। ইতিহাস বিজড়িত এই এলাকা। অতীতের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহাসিক হিন্দু ও মুসলমানদের অসংখ্য কীর্তিস্তম্ভ ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে সবুজ ছায়াঘনগ্রামীণ নিস্তব্ধ পরিবেশে। হিন্দু নিদর্শনগুলি এখন নেই বললেই চলে।

ইলিয়াস শাহী আমলের শুরুর দিকের স্থাপত্যের রীতি পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে (১৩৬৪-৭৪) দেখা যায়। সাম্রাজ্যের পরবর্তী সময় স্থাপত্যের বিচারে বাংলার চূড়ান্ত পর্যায় বলে বিবেচিত। ততদিনে ইট-পাথরের ভবনগুলো স্থানীয় আবহাওয়ার উপযুক্ত করে তৈরি করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা নির্মাতারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিহাসবিদগণ উদাহরণস্বরূপ গৌড়ে সুলতান বারবক শাহ্ কর্তৃক তৈরি দাখিল দরজার (১৪৫৯-৭৪) কথা উল্লেখ করেন।

সুলতানি আমলে পাণ্ডুয়ায় নির্মিত আদিনা মসজিদ কালো পাথরের এক অপূর্ব সৃষ্টি হিসেবে আজও বর্তমান। হজরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি (রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র সুলতান জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ্-এর কবর) বাংলা স্থাপত্যে বিশেষ স্থানের দাবিদার। প্রধানত ইট দ্বারা নির্মিত কৃষ্ণশিলা, চক্‌চকে রঙীন টালি এবং পোড়ামাটি দিয়ে অলঙ্কৃত, বাঁকানো কার্নিশ সমৃদ্ধ ১৪১২-১৫ সালে তৈরি একলাখী সমাধি বাংলার দেশজ স্থাপত্য রীতির পরিচয় বহনকারী অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। তবে একথা সত্য, প্রাক-মোগল বাংলার স্থাপত্যকে ইট নির্ভরশীল পারস্য রীতি বেশ খানিকটা প্রভাবিত করেছে।

৩৫৭ সোনারগাঁয়ে গোয়ালদি মসজিদ

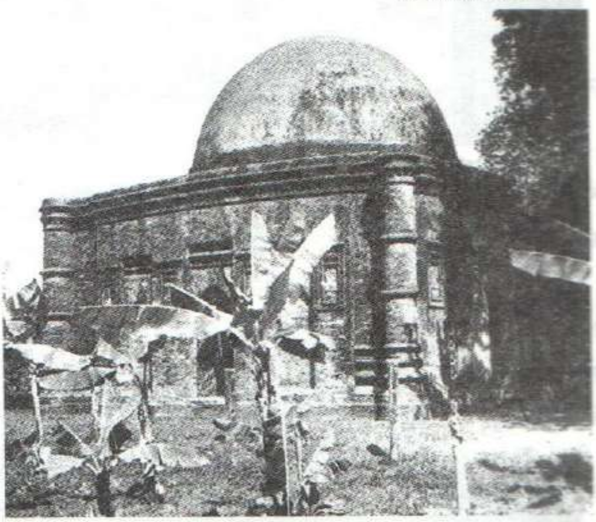

পাণ্ডুয়ায় অন্যান্য

কীর্তির মধ্যে অন্যতম হলো কুতুবশাহী মসজিদ (১৫২৮); মসজিদ, পুকুর, চিল্লাখানা ও শতাধিক কবর সমেত ছোট দরগাহ্ ; হামাম ঘর, দীঘি ও মিনার সমেত প্রাসাদ চত্বর যদিও বা এখন আর রাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব নেই; ইত্যাদি।

গৌড়ের প্রধান নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে সুলতান নসরৎশাহের তৈরি বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারী (১৫২৬), হাতি বাঁধা থাম (বারদুয়ারীর ধ্বংসাবশেষ থেকে তুলে আনা), সুলতান ফিরোজশাহ কর্তৃক নির্মিত ফিরোজ মিনার নামে প্রসিদ্ধ গৌড় স্তম্ভ (১৪৮৬), সুলতান নসরৎশাহের তৈরি কদম রসুল ও ফাতে খাঁর সমাধি (১৫৩১), সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা কর্তৃক নির্মিত লুকোচুরি দরওয়াজা (১৬৫৫), সুলতান ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত তাঁতীপাড়া মসজিদ (১৪৮০), লোটন মসজিদ ও চামাকাটি মসজিদ (১৪৭৫)।

বাংলার সদা বৃষ্টিভেজা আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ঢাকার রামপালে (বিক্রমপুর) বাবা আদমের মসজিদ (১৪৮৩) ও সোনারগাঁয়ে গোয়ালদি মসজিদ (১৫১৯) এবং রাজশাহীর ফিরোজপুরে খনিয়া দিঘি বা রাজবিবির মসজিদ (১৫শ শতাব্দী) বৃষ্টিকে আটকাবার জন্য চতুর্দিকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। বৃষ্টির কারণে প্রায় মসজিদে পূর্ব দিকে বারান্দা দেয়া হয়। মূল মসজিদ যখন বন্ধ রাখা হয় তখন এই বারান্দায় মুসল্লিরা নামায আদায় করেন। প্রায় প্রতিটি মসজিদে এই বারান্দায় শিশুদের কোর্‌আন শিক্ষা দেওয়া হয়।

৩৫৮ বিনাত বিবির মসজিদ

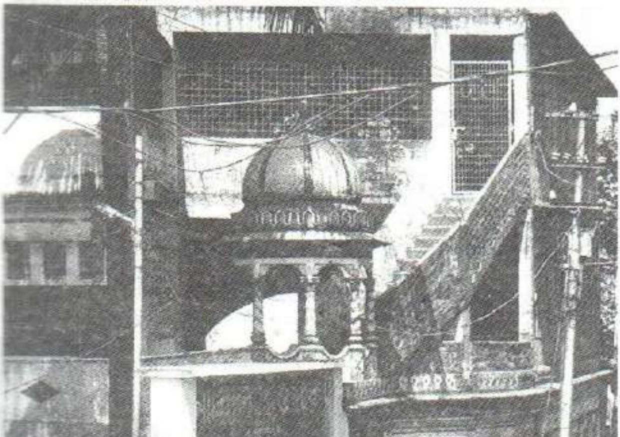

৩৫৯ বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ

অলঙ্করণের ক্ষেত্রে প্রাক-মোগল আমলে পোড়ামাটির কাজ, ইট এবং পাথর কেটে কাজ, রঙিন টালির ব্যবহার, আরবি চারুলিপি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সুলতানি আমলের ইমারতসমূহের মধ্যে নারিন্দায় বর্তমানে ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন মুসলিম নিদর্শন বিনাত বিবির মসজিদ (১৪৫৭), বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৫৯), রাজশাহীর গৌড়ে ছোট সোনা মসজিদ (১৫১৯), চারঘাটে বাঘা মসজিদ (১৫২৩) এবং মণ্ডায় কুসুম্বা মসজিদ (১৪৭৯), ও তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০), ঢাকার সোনারগাঁয়ে গোয়ালদি মসজিদ (১৫৫৮) অন্যতম।

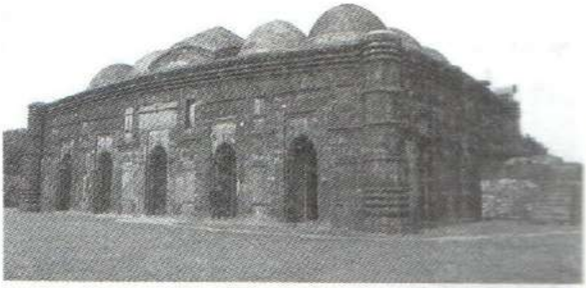

৩৬০ রাজশাহীর গৌড়ে ছোট সোনা মসজিদ

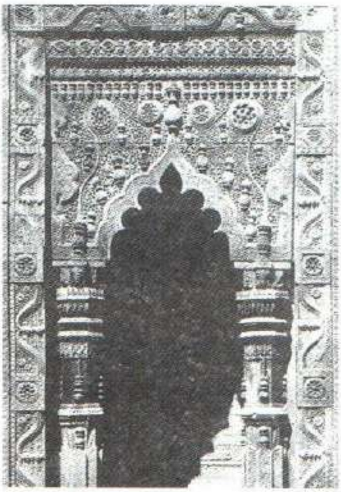

৩৬১ মণ্ডায় কুসুম্বা মসজিদের মেহরাব

মসজিদ একক কিংবা একাধিক গম্বুজবিশিষ্ট হতো। অভ্যন্তরে পাথরের থাম, মিহ্‌রাবে পোড়ামাটির কিংবা কালো পাথরের উচ্ছ্বসিত অলঙ্করণ, দেয়ালে ফুল ও পাতার কাজ, চার-চালা গম্বুজ ইত্যাদি সুলতানি আমলের মসজিদগুলোর স্থাপত্যর বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো মসজিদে (যেমন ছোট সোনা মসজিদ ও আদিনা মসজিদ) পাথরের থামের উপর উঁচু স্থানে মহিলাদের জন্য বিশেষ আসন দেখতে পাওয়া যায়।

সুলতানি এবং মোগল স্থাপত্যের সংমিশ্রণ

সুলতানি আমলের পতনের পর এবং মোগল আমলের সূচনায় যে সকল ভবন তৈরি হয় সেগুলোতে সুলতানি এবং মোগল উভয় রীতিনীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। সে সময়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে বগুড়ায় খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২) এবং টাংগাইলে আতিয়া মসজিদ (১৬০৯)।

সাধারণত মসজিদের চতুর্ভুজাকৃতির প্ল্যান, ইটের ব্যবহার, অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ, বাঁকানো কার্নিশ, পোড়ামাটির ফুল এবং অন্যান্য কাজের পাশাপাশি দেয়ালে আস্তর দ্বারা প্যানেল সৃষ্টি ইত্যাদি ঐ সময়ের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। বাংলার বাঁকানো ছাদ এবং কার্নিশ মোগল রাজত্বের সুবাদে দিল্লী, আগ্রা,লাহোর ইত্যাদি স্থানে পৌছে গেছে।

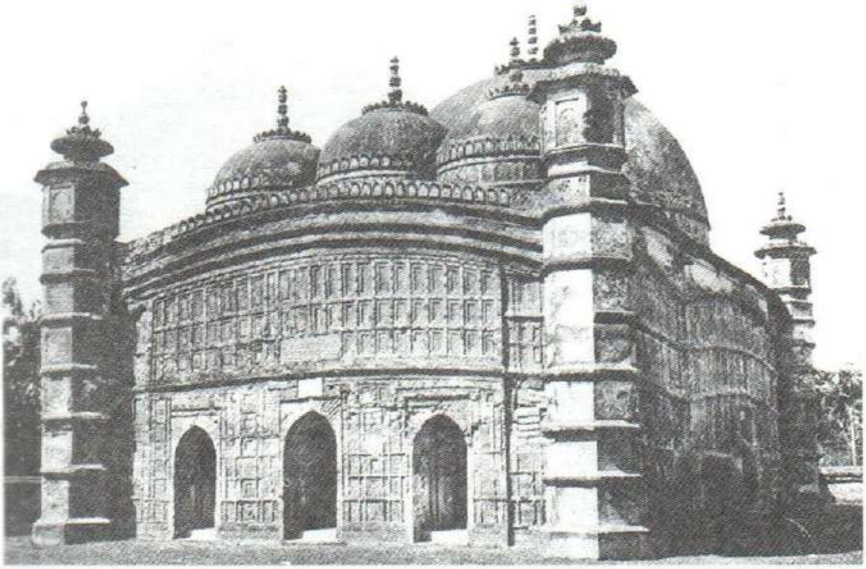

৩৬২ টাংগাইলে আতিয়া মসজিদ

বাংলার মোগল স্থাপত্য

১৬১০ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সমগ্র মোগল বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকার নাম রাখা হয় জাহাঙ্গীরনগর। ১৭১৭ সাল পর্যন্ত, একশত বছরের বেশি সময়, মোগলদের অধীনে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকা সমৃদ্ধশালী এবং জাঁকজমকপূর্ণ নগরীর রূপ ধারণ করে।

মোগল আমলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। যেমন মসজিদ, কেল্লা, প্রাসাদ, সেতু, সমাধি, সরাইখানা ইত্যাদি। মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল বিশিষ্টতম কেন্দ্রীয় গম্বুজ, সারিবদ্ধ একাধিক প্রবেশদ্বারের অন্তর্ভুক্ত উঁচু এবং খানিকটা বের হয়ে আসা প্রধান ফটক, পূর্ববর্তী দুই কেন্দ্রবিশিষ্ট খিলানের পরিবর্তে চার কেন্দ্রবিশিষ্ট খিলান, মূল খিলানকে একাধিক ছোট খিলানে বিভক্তকরণ, পোড়ামাটির কাজ পরিত্যাগ করে আস্তরের প্যানেলের প্রচলন, বাঁকানো কার্নিশ ও

৩৬৩ বড় কাটরা, ঢাকা

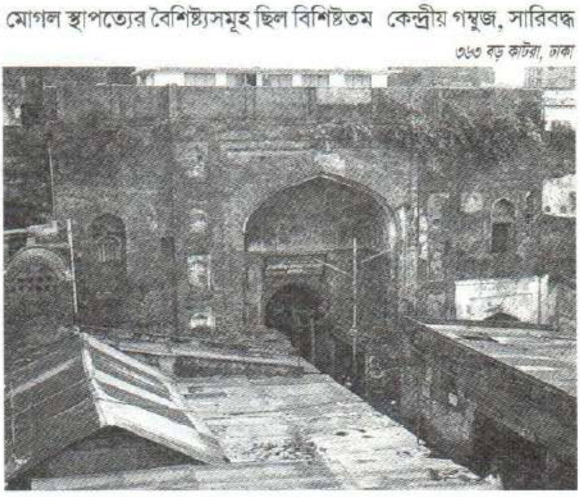

ছাদের পরিবর্তে সমতল ছাদ এবং সোজা কার্নিশ, মসজিদের কোণে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকার গম্বুজবিশিষ্ট উঁচু মিনার ইত্যাদি।

৩৬৪ লালবাগ কেল্লা

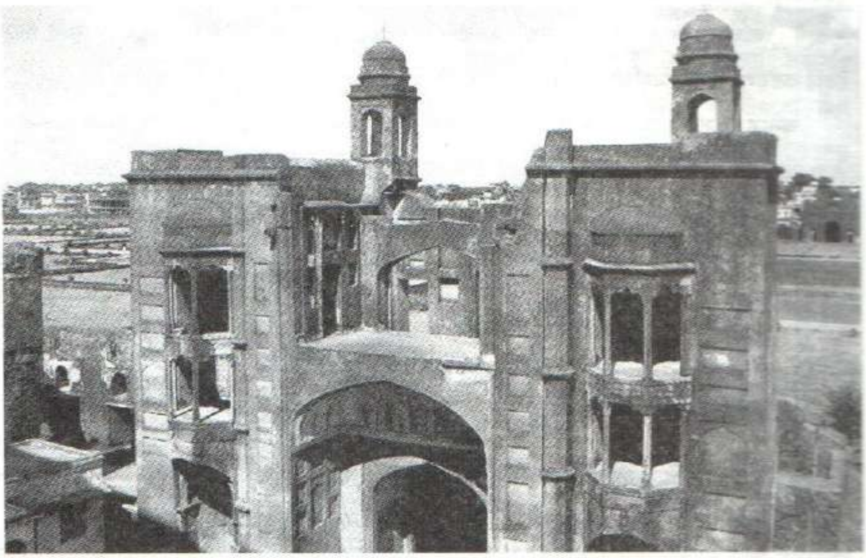

আস্তরের প্যানেলে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার এবং ফুলের নক্‌শা দেখা যায়। যদিও বা যুগল গম্বুজ (একটার উপরে আরেকটা, মধ্যখানে ফাঁকা) মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, তথাপি বাংলার মোগল স্থাপত্যে তেমনটি দেখা যায় না। মোগল স্থাপত্যের আরেকটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মসজিদের নিচে কতকগুলো ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ বা কামরা; যেমনটি দেখা যায় ঢাকার লালবাগে খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদে (১৭০৬)। সাধারণত এই ঘরগুলোকে তাহ্‌খানা বলা হতো।

মোগল আমলে অধিকাংশ নির্মাণ কার্যকলাপ ঢাকা এবং তার আশেপাশে সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লেখযোগ্য মোগল স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মীর আবুল কাশিমের তৈরি ধানমণ্ডির ঈদগাঁ (১৬৪০) এবং চকবাজারে বড় কাটরা (১৬৪৪), নওয়াব শায়েস্তা খানের নির্মিত ছোট কাটরা (১৬৬৩), সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র

৩৬৫ ঢাকার লালবাগে খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ

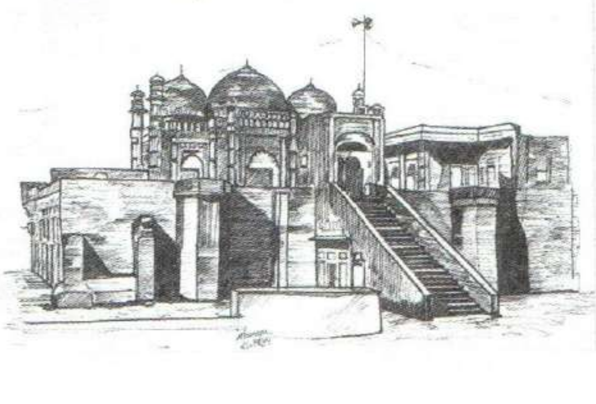

বাংলার গভর্নর (Governor) মোহাম্মদ আজম কর্তৃক সূচিত এবং শায়েস্তা খান দ্বারা সমাপ্ত লালবাগে আওরঙ্গবাদ বা লালবাগ কেল্লা (১৬৭৮), সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণে হাজি খাজা শাহবাজের মসজিদ (১৬৭৯), কাওরান বাজারে মালিক আম্বরের মসজিদ (১৬৮০), মোহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদ (১৭শ শতাব্দী), লালবাগে খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ (১৭০৬), বেগম বাজারে নওয়াব মুরশীদ কুলি খানের তৈরি করতলব খানের মসজিদ (১৭০০-৪) ইত্যাদি।

অন্যত্র যে সকল মোগল স্থাপত্যের নমুনা দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে গৌড়ে শাহ্ সুজার বিশ্রামাগার এবং তাঁর পীর শাহ নেয়ামতুল্লাহ্‌র মসজিদ ও মাজার শরীফ, চট্টগ্রামে নওয়াব শায়েস্তা খানের তৈরি জামে মসজিদ (১৬৬৬), ইত্যাদি। এখানে ১৬৭৭ সালে নির্মিত ঢাকার তেজগাঁও-এ অবস্থিত হোলি রোজারি (Holy Rosary) গির্জার কথা উল্লেখযোগ্য কারণ এতে বাংলার বাঁকা ছাদ, পশ্চিমা পেডিমেন্ট, মোগল থাম ও গম্বুজের এক বিস্ময়কর রচনা তৈরি হয়েছে।

মোগলদের কেল্লা

মোগল ঢাকাকে নদীপথে মগ এবং পর্তুগিজদের আক্রমণ হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এর আশেপাশে বেশ কয়েকটি কেল্লা নির্মাণ করা হয়। সময়ের সাথে এমনি অনেকগুলো কেল্লা হারিয়ে গেলেও আজও কিছু সংখ্যক বর্তমান। তন্মধ্যে গভর্নর (Governor) মীর জুমলার তৈরি মুন্সীগঞ্জে ইদ্রাকপুর কেল্লা (১৬৬০), নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জ কেল্লা (১৭শ শতাব্দী) এবং সোনাকান্দা (বন্দর) কেল্লা (১৭শ শতাব্দী) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষণীয় যে, প্রাচীন কালের অধিকাংশ নিদর্শন ধর্মীয় ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন মুসলমানদের মসজিদ, হিন্দুদের মন্দির, ইত্যাদি। ধর্ম ঐতিহাসিকভাবে মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। তাই মসজিদ, মন্দির, ইত্যাদি নির্মাণে যে কোনো এলাকার মানবগোষ্ঠী তাদের ধনসম্পদ, কারিগরি দক্ষতা, সময়, ইত্যাদি যথাসম্ভব মাত্রায় উজাড় করে দিতে সদা আগ্রহী। সবচেয়ে টেকসই, প্রয়োজনে সর্বাধিক মূল্যবান নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করা হতো ধর্মীয় দালানকোঠা। তাই মাটি, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সাধারণ ঘরবাড়ি সময়ের সাথে বিলীন হয়ে গেলেও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শত শত বছরের পুরনো মসজিদ, মন্দির।

বাংলাদেশের স্থাপত্যে বৃটিশ প্রভাব

১৭৫৭ সালে ইংরেজরা যখন বাংলা দখল করে সেই সময়ে খোদ বিলেতে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) সবে শুরু হয়েছে। তবে ইংরেজদের উদ্যোগে বাংলাদেশে যে সকল দালান তখন নির্মিত হয়েছে তাতে ঐ বৈপ্লবিক ধারার লেশ মাত্র দেখা যায়নি। কারণ মেশিনের সেই বিপ্লব

বিলেত তথা ইয়োরোপে সীমাবদ্ধ ছিল। উপরন্তু লোহা, কাচ, এবং সদ্য আবিষ্কৃত নতুন সব নির্মাণ সামগ্রী বাংলাদেশে পাওয়া যেত না।

৩৬৬ হোলি রোজারি গীর্জা, ঢাকা

রাজত্বের প্রথম প্রায় একশত বছর ইংরেজরা ইয়োরোপীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো সরাসরি আমদানি করে; শুধু নির্মাণ সামগ্রীগুলো ছিল বাংলাদেশের। ইংরেজদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিলেতি ভবনের উপাদানগুলো স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে যতটুকু নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল সেটাই ছিল তখনকার বাংলাদেশে বৃটিশদের স্থাপত্য। এইভাবে ইয়োরোপীয়দের মাধ্যমে গ্রীসদেশীয়, রোমান, রেনেসাঁ, বারোখ, নিওক্লাসিক্যাল, ইত্যাদি স্টাইলের বৈশিষ্ট্যগুলো ভারত, তথা বাংলাদেশে, আসতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে (টি,এস,সি নামে বহুল পরিচিত) গ্রিস দেশীয়দের স্মৃতিসৌধ (১৮০০-১৮৪৩)।

মূল ভবন উপরিভাগ থেকে খানিকটা বের হয়ে আসা প্রধান প্রবেশপথে ত্রিভুজাকৃতির ছাদ বা পেডিমেন্ট (pediment), ক্লাসিক্যাল থাম, দালান থেকে থাম পৃথককরণ,

৩৬৭ গ্রিসদেশীয়দের স্মারক ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণ

৩৬৮ ঢাকায় আর্মেনিয়াবাসীদের গির্জা

ভবনের কোণে ধাপে ধাপে দেয়াল ছোট-বড় করা, গোল করে সাজানো কতকগুলো থামের উপর গম্বুজ, অর্ধবৃত্তাকার খিলান, বাড়তি ছাদ ধরে রাখার জন্য দেয়াল থেকে ঠেস (bracketted eave), পাথরের তৈরি অলঙ্কৃত রেইলিং (railing) বা ব্যালুস্ট্রেইড (balustrade), ছাদযুক্ত টানা বারান্দা ইত্যাদি বাংলাদেশের স্থাপত্যে ইংরেজদের অবদান।

৩৬৯ মিটফোর্ড হাসপাতাল

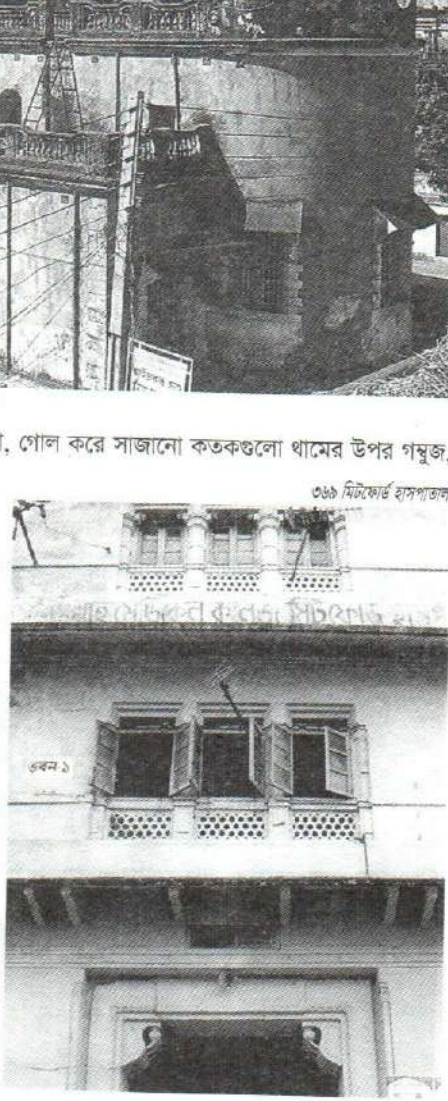

তবে ক্রমশ ইংরেজদের তৈরি ভবনগুলোতে মোগল স্থাপত্যের প্রভাব পড়তে শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি ভবনগুলোতে মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো শোভা পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হতে নির্মিত ভবনগুলোতে স্থানীয় কারিগরগণ মোগল এবং ইয়োরোপীয় উভয় রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়।

একথা সত্য ইংরেজি আমলের আগে বাংলাদেশে এত বড় ভবনের প্রয়োজন ছিল না। নীল, রেশম, ইত্যাদি ব্যবসায় জড়িত ওলন্দাজ, ফরাসি এবং ইংরেজরা ১৯শ শতাব্দীতে কারখানা হিসেবে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো কুঠি নির্মাণ করে। সেকালের গ্রামীণ পরিবেশে বিদেশী কায়দায় তৈরি কুঠিগুলো বাণিজ্য এবং নিরাপত্তার জন্য কেল্লা হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। ১৯শ শতাব্দীর শুরুতে ওলন্দাজদের তৈরি রাজশাহীর বড় কুঠি এবং শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজদের তৈরি যশোরের মোল্লাহাট কুঠি এই ধরনের ভবনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মোল্লাহাট কুঠির অঙ্গনে পুকুর, বাগান, স্কুল, হাসপাতাল, ভৃত্যদের বিশ্রামাগার ইত্যাদি ছিল বৃটিশদের ভবন।

১৮৫৪ সালে তৈরি মিটফোর্ড (Mitford) হাসপাতাল (বর্তমানে স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) কতকটা বিলেতি ১৯শ শতাব্দীর নিওক্লাসিসিজ্ম (neo-classicism) স্টাইলে নির্মিত। শতাব্দীর শেষের দিকে ইয়োরোপীয় বিভিন্ন রীতির অনুকরণে, তথা এক্লেক্টিক (eclectic) ধারায়, এবং কিছু ভারতীয় উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত ঢাকার আহ্সান মন্জিল (১৮৭২) ইংরেজি আমলে নির্মিত ভবনগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ঐতিহ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে ভবনটি পুনর্বিন্যাস করে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মহতী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯২ সালে পুনর্বিন্যাস কাজে লিপ্ত বাংলাদেশের স্থপতিগণ, শাহ আলম জহিরউদ্দিন, আমির হোসেন এবং আলি ইমাম

৩৭০ ঢাকার আহ্সান মন্জিল

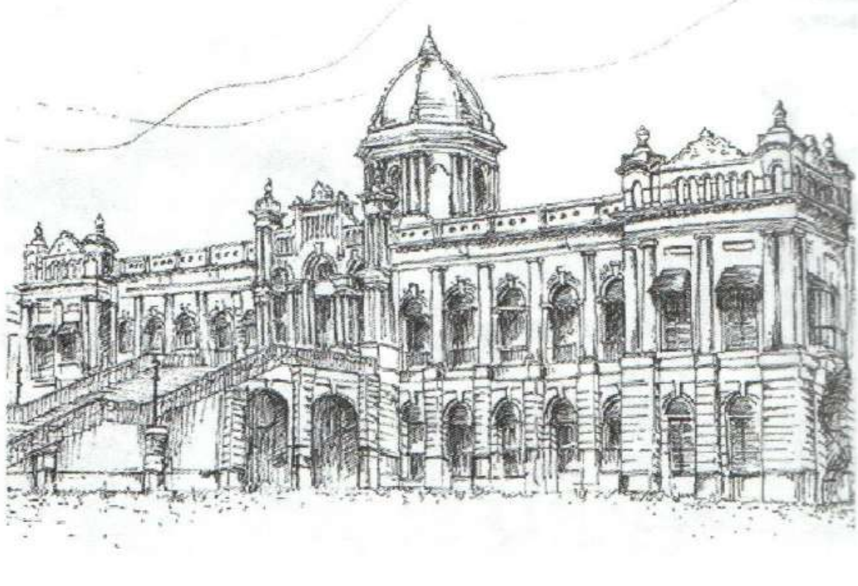

৩৭১ কার্জন হল, ঢাকা

ARCASIA (Architectural Regional Council of Asia) পুরস্কার লাভ করেন।

১৯০৫ সালে ঢাকাকে বৃটিশ ভারতের অধীনে পূর্ব বাংলা (বর্তমানে বাংলাদেশ) এবং আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয়। তখন ঢাকায় রাতারাতি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবন তৈরি হয়। এগুলির মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টাউন হল (Town Hall) হিসেবে নির্মিত কার্জন হল (Curzon Hall) (১৯০৪) ও নর্থব্রুক (North Brooke) হল বা লালকুঠি (১৯০৫), ফজলুল হক হল (১৯০৫), পূর্ব বাংলা এবং আসাম প্রদেশের সচিবালয় (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) (১৯০৫) এবং পুরানো হাই কোর্ট ভবন হিসেবে পরিচিত সেকালের গভর্নর হাউস (Governor House) (১৯০৫)।

পরবর্তী কালে নির্মিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল (১৯২৯), বৃটিশ আমলের আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ততদিনে মোগল স্থাপত্যের রীতিনীতি অধিক প্রাধান্য পাচ্ছিল।

৩৭২ নর্থ ব্রুক হল, ঢাকা

৩৭৩ ফজলুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিককালের মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের কাজ হচ্ছে বিশ্ববরেণ্য আমেরিকান স্থপতি লুই আই. কা'ন (Louis I. Kahn) ডিজাইনকৃত ঢাকার শেরে বাংলা নগরে জাতীয় সংসদ ভবন (১৯৬৪-৮১)।

৩৭৪ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

অন্যান্য ভালো কাজের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্থাপত্যের পথিকৃৎ মাজহারুল ইসলামের (১৯২৩-) ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট (Institute of Fine Arts) (১৯৫৫), কনস্ট্যান্টাইন ডক্সিআডিস (Constantine Doxiadis) এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র বা টি.এস.সি. (TSC) ভবন (১৯৬৪), পল রুডলফ (Paul Rudolph) (১৯১৮-)-এর ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবন ও ছাত্রাবাস (১৯৬৫), ড্যানিয়েল ডানহ্যাম (Daniel Dunham) এবং রবার্ট বুইর (Robert Bouighy) কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন (১৯৬১-৬৩) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হল তিতুমির, শের-এ-বাংলা এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী হল (১৯৬৩-৬৭)।

৩৭৫ পুরানো হাই কোর্ট ভবন, ঢাকা

৩৭৬ স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৭৭ ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবন

এই সকল কাজের মাধ্যমে পশ্চিমা আধুনিকতার ধারা সরাসরি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নিদর্শনগুলো যে বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং কৃষ্টির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে কংক্রিটের থাম ও বীম এবং বিরাট মাপের কাচ ব্যবহার, দুই থামের মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃদ্ধি, কংক্রিটের সুবিধা গ্রহণ করে বিচিত্র ছাদ ও কার্নিশের প্রয়োগ, ইত্যাদি এদেশের স্থাপত্যকে দিয়েছে নতুন

৩৭৮ ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট

৩৭৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি. বা ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র

দিক নির্দেশনা।

বাঙালির মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে, রোদ এবং বৃষ্টি রোধ করে, বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা করে এবং অধিকতর দেশীয় নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে, কার্যকর আধুনিক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেবে যে স্থাপত্য সেটাই হবে বাংলাদেশের স্থাপত্য, বাঙালির স্থাপত্য।

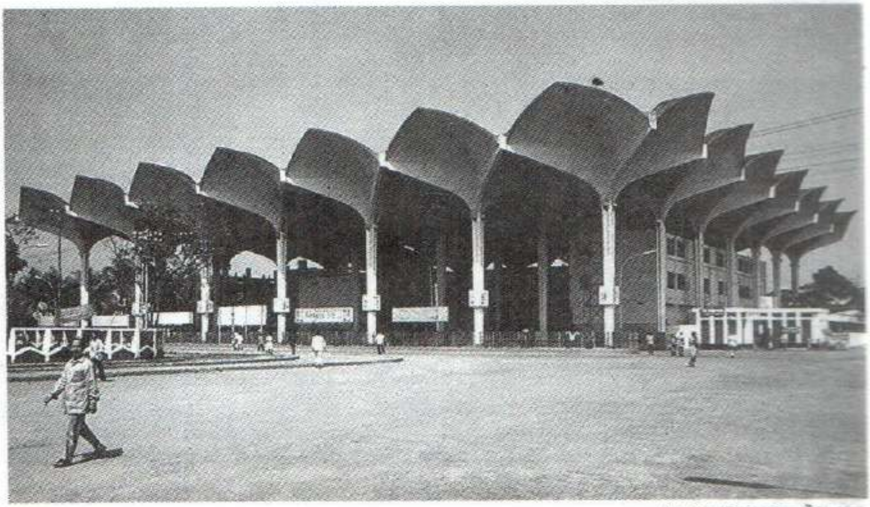

৩৮০ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা

নতুন স্থাপত্যের শুরু

সভ্যতার শুরু থেকে স্থাপত্য অনেক বদলে গেছে; আবার স্থাপত্যের সূচনার পর পৃথিবী সেই আগের মতো নেই। তবে স্থাপত্যের রূপ প্রথম থেকে আজ অবধি বলতে গেলে একই উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যোগ হয়েছে শুধু বিংশ শতাব্দীর স্থপতির দর্শন; যার কারণে সমাজ, সামগ্রী, প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে স্থির থাকা সত্ত্বেও বিগত একশত বছরে বিভিন্ন স্থাপত্য রুচির আবির্ভাব ঘটেছে। নির্মাণ কার্যের উদ্দেশ্য কি, কাদের জন্য এই আয়োজন, কোথায়, কোন দেশে, কোন ভৌগোলিক এলাকার জন্য স্থপতির স্বপ্ন, কিসব সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ হবে, কোন প্রযুক্তি প্রয়োগ হবে, ব্যবহারকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা কি ইত্যাদি সব নির্ধারণ করে স্থাপত্য কীর্তির চূড়ান্ত আকার, রূপ ও সফলতা।

ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে মানুষের চাহিদা ছিল সর্বদা পরিবর্তনশীল। বর্তমানে যে ধরনের ভবন প্রয়োজন তা অনেক অর্থে বিগত দশক, শতক থেকে ভিন্ন। এখন প্রয়োজন বাড়তি জনসংখ্যার জন্য গৃহায়ন, নব প্রযুক্তি বিকাশের জন্য উপযুক্ত ইমারত, উন্নত গবেষণাগার ইত্যাদি। বহুকাল থেকে নির্মিত

৩৮১ এপেক্স ফুটওয়্যার ফ্যাক্টরি, গাজিপুর, স্থপতি নিজামউদ্দিন আহমেদ (১৯৯২)

হয়ে আসা ধর্মীয় স্থান, আবাসিক ভবন, অফিস-আদালত, দোকান-পাট, হাসপাতাল, কল-কারখানা, স্টেডিয়াম, সিনেমা হল ইত্যাদি হতে হবে যুগোপযোগী।

উন্নত যোগাযোগ এবং শিল্পায়নের আশীর্বাদে এখন পৃথিবীর যে কোনো স্থানে সব ধরনের নির্মাণ সামগ্রী পাওয়া সম্ভব; অবশ্য তা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে ব্যয়বহুল। আজ নির্মাতার হাতের কাছে রয়েছে অনেক বেশি সামগ্রী। বিদেশী প্রযুক্তি স্বদেশে স্থাপিত কারখানার সুবাদে এখন সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

হাতে তৈরি সামগ্রী এখন নেই বললেই চলে। অতি উন্নত দেশে তো বটেই, ভারত-বাংলাদেশেও, কাঠের কাজ ব্যতীত ভবনের বৃহদাংশের কাজ এবং ব্যবহৃত সামগ্রী বর্তমানে মেশিনের সাহায্যে তৈরি হচ্ছে। এর ফলে বস্তুর গুণগত মান এখন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অধিকাংশ সামগ্রী যেহেতু শিল্প-কারখানায় প্রস্তুত তাই নির্মাণ কাজ এখন আগের মত সম্পূর্ণভাবে কারিগরের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল নয়; ব্যবস্থাপনা বর্তমানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে আশাব্যঞ্জক এটাই যে শিল্পায়নের এতকাল পর স্থপতিরা আজ আবার অলঙ্করণের প্রতি, তথা ইতিহাসের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করছে।

বর্তমানে বাণিজ্যিক দিকটা স্বাভাবিকভাবেই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ভবিষ্যতের চাহিদা ধারণা করে এক প্রকারের ব্যবসায়ীরা একটার পর একটা যে সব দালান নির্মাণ করছেন তা নিতান্তই কুৎসিৎ এবং তা শুধু মাত্র নান্দনিক অর্থে নয় কারণ যেখানে আর্থিক লাভটাই মুখ্য, মানুষের কল্যাণ সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

৩৮২ বাবরুল আবাস, সিলেট, স্থপতি নিজামউদ্দিন আহমেদ (১৯৯৮)

স্থাপত্যের ভবিষ্যৎ আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়াই শ্রেয়। সামনে কি আসছিল তা অতীতে যেমন বলা যায়নি; এখনও তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। যখন মনে হয় স্থাপত্যে আর অভিনব কিছুই করার নেই, নতুন কোনো সামগ্রী এসে অসম্ভব সাধন করবে এমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ, প্রযুক্তি কোথাও আসার পর যেন দাঁড়িয়ে গেছে, মানুষ তো চলতি স্থাপত্য রীতিকে মেনেই নিয়েছে --- ঠিক তখনই পৃথিবীর কোথা থেকে যেন হঠাৎ করেই নতুন উদ্ভাবনার খবর মেলে। পুরনো সামগ্রী দিয়ে নতুন প্রযুক্তি বা পুরনো প্রযুক্তির কল্পনাতীত প্রয়োগ, নতুন কোনো সামগ্রী, নতুবা সব পুরনো কিছু দিয়ে নতুন কোনো উপহার।

স্থাপত্যের মজা ওখানেই। মনে হতে পারে থেমে আছে; আসলে চলমান।

গ্রন্থতালিকা

বাংলা

১. জাকারিয়া, এ কে এম., বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি, ২য় খন্ড, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

২. মামুন, মুনতাসির., ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩

৩. মোমেন, আবুল., বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

৪. রয়, অনুরুদ্ধ., চট্টপাধ্যায়, রচনাবলি., (সম্পাদকবৃন্দ), মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৯২

ইংরেজি

1. AHMED, Nazimuddin., Buildings of the British Raj in Bangladesh, University Press Ltd., Dhaka, 1986
2. AHMED, Nazimuddin; Discover the Monuments of Bangladesh, The University Press Ltd., Dhaka, 1984
3. BAGENAL, P., and MEADES, J.; The Illustrated Atlas of the World's Great Buildings; Salamander Book Ltd, London, 1980
4. BAIRD, George; Alvar Aalto, Thames and Hudson, London, 1971
5. BAMBOROUGH, Philip; Treasures of Islam, Blandford Press, Poole, Dorset, 1976
6. Bangla Academy, English-Bengali Dictionary, Zillur Rahman Siddiqui (Ed), Bangla Academy, Dhaka, 1993
7. Bangla Academy, Bengali-English Dictionary, Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman & Jahangir Tareque (Eds), Bangla Academy, Dhaka, 1994
8. BELL, Mrs. Arthur; Architecture, T.C & E.C Jack Ltd, London, 1919
9. BENEVOLI, Leonardo; The Architecture of the Renaissance, Vol.I & II, Routledge & Kegan Paul, London, 1978
10. BERTRAM, Anthony., Design, Penguin Books Ltd.,, Middlesex, 1939
11. BESSET, Maurice; Le Corbusier, Editions d'Art Albert Skira S.A, Geneva, 1987
12. BLUNT, Wilfrid; Splendours of Islam, Purnell Book Services Limited, Abingdon, Oxon, 1976

13. BROWN, Percy., Indian Architecture (Hindu and Bhudhists Period), D.B. Taraporevala Sons & Co Pvt Ltd., Bombay, 1975

14. BROWN, Percy., Indian Architecture (Islamic Period), D.B. Taraporevala Sons & Co Pvt Ltd., Bombay, 1975

15. CHRISTIAN, Roy., Factories, Forges and Foundries, Routledge & Kegan Paul, London, 1974

16. COPPLESTONE, Trewin; World Architecture, The Hamlyn Publishing Group Ltd., Middlesex, 1963

17. CROIX, Horst de la; TANSEY, Richard G.; Art Through the Ages (7th Ed), Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, 1980

18. DANI, A H; Muslim Architecture in Bengal, 1961

19. DANZ, E.; Architecture of the Sun, Thames & Hudson Ltd, London, 1967

20. DARTON, Mike (Ed), The Illustrated Book of Architects and Architecture, New Burlington Books, London, 1990

21. DASGUPTA, Birendramohan (Ed.), Samsad Bengali-English Dictionary, 2nd ed., 9th imp., Sahitya Samsad, Calcutta, 1988

22. Dictionary of Twentieth-Century Art, Phaidon Press Limited, London, 1973

23. DUBEY, Abhay Kumar; World-Famous Unsolved Mysteries; Pustak Mahal, Delhi, 8th Revised Ed., 1992

24. FAULKNER, R., ZIEGFELD, E., Art Today, Holt, Rinehart & Winston, New York, 5th Ed., 1969

25. FLEMING, J., HONOUR, H., PEVSNER, N.; The Penguin Dictionary of Architecture; Penguin Books, London, 1980

26. FLEMING, William., Arts and Ideas, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1963

27. GLOAG, John; Architecture, Cassell & Company Ltd., London, 1963

28. GOMBRICH, E H., The Story of Art, Phaidon, London, 11th Ed., 1966

29. GORDON, Barclay F.; Olympic Architecture, John Wiley & Sons, London, 1983

30. GROPIUS, Walter; The New Architecture and The Bauhaus, Faber and Faber, London, 1935

31. HASAN, Syed Mahmudul, Muslim Monuments of Bangladesh, 2nd Ed., Islamic Foundation, Dhaka, 1980

32. HASAN, Syed Mahmudul; Glimpses of Muslim Art and Architecture, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1983

33. HORSLEY, E.M., Hutchinson Factfinder, Guild Publishing, London, 1986

34. HOWARTH, Eva., Crash Course in Architecture, Headline Books, London, 1990

35. JACOBS, D.; Architecture, Newsweek Books, New York, 1974

36. KHAN, K. M. Raisuddin; Bangladesh: Itihash Porikrama; 4th Ed., Khan Brothers and Co., Dhaka, 1993

37. HALL, John W., (General Ed.), KIRK, John G., (Ed.); History of the World, *Earliest Times to the Renaissance*, Gallery Books, New York, 1988

38. HALL, John W., (General Ed.), KIRK, John G., (Ed.); History of the World, *The Renaissance to World War I*, Gallery Books, New York, 1988

39. HALL, John W., (General Ed.), KIRK, John G., (Ed.); History of the World, *World War I to The Present Day*, Gallery Books, New York, 1988

40. LAMPUGNANI, V M (General Ed.); Encyclopaedia of 20th Century Architecture, Harry N Abrams Inc., New York, 1988

41. MACDONALD, W.L.; Early Christian & Byzantyne Architecture, George Brazillar, New York, 1962

42. MICHELL, George (Ed.); Architecture of the Islamic World, Thames and Hudson Ltd, London, 1984

43. MURRAY, Peter & Linda., A Dictionary of Art and Artists, Penguin Books, Middlesex, 3rd Ed, 1972

44. MYERS, B. S. (Ed.); Encyclopedia of Painting, 4th rev. ed., Crown Publishers, Inc., New York, 1979

45. NATH; Immortal Taj Mahal, D B Taraporevala Sons & Co., Bombay, 1972

46. New Webster's Dictionary of the English Language, Delair Publishing Co., USA, 1981

47. PAWLEY, Martin; Frank Lloyd Wright, Thames and Hudson, London, 1970

48. PAWLEY, Martin; Mies van der Rohe, Thames and Hudson, London, 1970

49. PEEL, L., POWELL, P., GARRETT, A., An Introduction to 20th Century Architecture, Chartwell Books, New Jersey, 1989

50. PENOYRE, J., RYAN, M., The Observer's Book of Architecture, Frederick Warne, London, 3rd Ed., 1981

51. POLLARD, Michael., Cities of the World, MacMillan Education, London, 1987

52. POTTER, Tessa., The Crowded Cities, MacMillan Education, London, 1987

53. RAEBURN, Michael; An Outline of World Architecture; Octopus Books Limited, 59 Grosvenor Street, London W 1, 1973

54. RICE, David Talbot; Islamic Art; Thames and Hudson, London, 1979

55. RICHARDS, J M et al ; Hassan Fathy, Concept Media Pte Ltd., Singapore, 1985

56. RICHARDS, J.M., An Introduction to Modern Architecture, Penguin Books, Middlesex, 1962

57. Roydon Encyclopedia, The, New Revised Edition, Roydon Publishing Co. Ltd., London, 1985

58. RUSSEL, Frank (Ed.), Art Nouveau Architecture, Bibliophile Books, London, 1983

59. SARWAR, Ghulam., Islam: Beliefs and Teachings, The Muslim Educational Trust, London, 3rd Ed. 1984

60. SCOTT, John S., A Dictionary of Building, Revised Ed., Penguin, Middlesex, 2nd Ed., 1974

61. SHARP, Dennis; A Visual History of 20th Century Architecture, New York Graphic Society Ltd., Greenwich, Connecticut, 1972

62. SHEPPARD, Charles., Skyscrapers, Bracken Books, London, 1996

63. SPADE, Rupert; Eero Saarinen, Thames and Hudson, London, 1971

64. SPADE, Rupert; Paul Rudolph, Thames and Hudson, London, 1971

65. Steck-Vaughn Social Studies, Our World Today, Steck-Vaughn Co., Austin, Texas, 1983

66. VOLWAHSEN, Andreas; Living Indian Architecture, Oxford & IBH Publishing, Calcutta, 1969

67. WARE, Dora and BEATTY, Betty; A Short Dictionary of Architecture; George Allen and Unwin Ltd., London, 1961

68. ZAHIRUDDIN, S.A., IMAMUDDIN, A.H., KHAN, M.M., Contemporary Architecture Bangladesh, Institute of Architects Bangaldesh, Dhaka, 1990

69. ZIMMER, Heinrich,; The Art of Indian Asia, Princeton University Press, 1983

BANSDOC Library
Accession No. 18374

BANSDOC Library
Dhaka